জুতোয় রক্তের দাগ

সমরেশ মজুমদার

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬১ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯ ।

হিথরো এয়ারপোর্টে প্লেনটা থামতেই মেজর সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন প্লেন থেকে নামার সিঁড়ি দরজায় লাগেনি। ওপরে লাগেজ-বক্স থেকে নিজের অল-পারপাস ব্যাগটা টেনে নামিয়ে দু'পা এগোতেই তাঁর সঙ্গে বেজায় ধাক্কা লাগল সামনের প্যাসেজের পাশের সিটে বসা একজন মহিলার। তিনি জড়ানো ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠলেন, "চোখের মাথা খেয়েছেন! একজন ভদ্রমহিলাকে ব্যাগ দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছেন? এত তাড়া কিসের, অ্যাঁ?"

"চোখের মাথা আপনি খেয়েছেন না আমি খেয়েছি? চোখ দেখাচ্ছেন আমাকে, চোখ?" মেজর চোখ বন্ধ করে সমানে গলা চড়ালেন।

ওপাশ থেকে একজন সৌম্য চেহারার আমেরিকান বলে উঠল, "লুক জেন্টলম্যান, ইউ মাস্ট নট বিহেভ লাইক দিস উইথ আ লেডি!"

মেজর তাঁর দিকে এমন চোখে তাকালেন যেন ভস্ম করে দেবেন। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। এইসময় মহিলা বলে উঠলেন, "এইসব উজবুকদের জন্যে কোথাও যাওয়াই মুশকিল।"

"কী, আমি উজবুক? তা হলে...।" এইবার প্রথম মেজর ভদ্রমহিলার দিকে ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে তাকালেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গলা থেকে একটা সরু স্বর ছিটকে উঠল, "আরে, ডোরা, ডোরা গ্রান্ট! আমাদের সেই মিষ্টি মেয়েটার এই চেহারা হয়েছে?"

আচমকা ভদ্রমহিলার গলায় বিস্ময় মেশানো উচ্ছ্বাস ছিটকে উঠল, "ওঃ মেজর! ইট'স ইউ!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি। আমি ছাড়া কোন্ উজবুক কের্নেডি এয়ারপোর্ট থেকে হিথরো পর্যন্ত এক প্লেনে এসেও তোমাকে না-দেখে থাকবে। এত মুটিয়েছ না, ইশ্ ইশ্। কী ছিলে, কী হলে!" মেজর দু'হাতে ভদ্রমহিলার হাত ধরে নাচাতে লাগলেন।

যাত্রীরা প্যাসেজে সারবন্দী দাঁড়িয়ে। এখন অনেকেই দৃশ্যটা দেখে হাসছেন, শুধু সেই সৌম্য ভদ্রলোক ছাড়া। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল।

ডোরা গ্রান্টের বয়স অন্তত পঞ্চাশ। বিশাল বপু। কিন্তু সাজগোজের বাহার আছে খুব। সিট ছেড়ে উঠে মেজরের পেটে এক আঙুলের খোঁচা মারলেন তিনি, "চোখের মাথা তা হলে খেয়েছে কে! বলো, বলো এবার?"

মেজর হোহো করে হাসলেন। তাঁর ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল এই প্লেনে যেন আর-কোনও যাত্রী নেই। এইসব এয়ারপোর্টের বিল্ডিং-এ সরাসরি ঢোকার জন্যে টানেল থাকে, যার একটা মুখ প্লেনের দরজায় লাগালে আর মাটিতে পা ফেলতে হয় না। কোনও কারণে সেটা না পাওয়া যাওয়ায় এই পুরনো ব্যবস্থা। নীচে নামতেই বেশ ঠাণ্ডা লাগল অর্জুনের। আমেরিকায় এই ক'দিন সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। লন্ডনে নেমে মনে হত বেশ স্যাঁতসেঁতে ভাব। মেজব মহিলাকে হাত ধরে থামালেন। "লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু দিস ইয়াংম্যান।"

অর্জুন মুখ তুলে তাকাতেই তিনি হেসে ইংরেজিতে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এ হচ্ছে অর্জুন। ট্যালেন্টেড প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আমেরিকায় জোন্‌স অ্যান্ড জোনস-এর লাইটাব এ-ই খুঁজে বের করেছে।"

ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর হাত ধরলেন, "ইজ ইট? তুমি? এত অল্প বয়সে?"

মেজর বললেন, "আর ইনি হচ্ছেন মিসেস ডোরা গ্রান্ট। ফেমাস ম্যাজিশিয়ান। আমাব অনেক দিনের বন্ধু।"

ম্যাজিশিয়ান। অর্জুন অবাক হয়ে গেল। এই ভদ্রমহিলাকে দেখলে তো ম্যাজিশিয়ান বলে মনেই হয় না। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "অবাক হয়ে দেখছ কী! একদম বাজে কথা। কান দিও না। আমি তোমার কথা কাগজে পড়েছি। ওয়েল ডান।"

ওরা কথা বলতে বলতে টার্মিনাল বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ল। কয়েক ধাপ ওপরে ওঠার পর টানা সুড়ঙ্গের মতো চলার রাস্তা। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এয়ারপোর্ট যে এত বড় হয়, তা অর্জুনের জানা ছিল না। কেনেডি এয়ারপোর্টও অনেক বড়, কিন্তু এতটা হাঁটতে হয়নি। বিভিন্ন এয়ারলাইনস্ যাত্রী নিয়ে হরদম নামছে হিথরোতে। যাত্রীদের ব্যস্ততার শেষ নেই। ব্যস্ত মেজরও, দু'বার ধাক্কা মেরে বসলেন এর মধ্যে। প্রথমজন কিছু বলেননি। দ্বিতীয়বারে মিসেস ডোরা গ্রান্টের সঙ্গে কথা বলে পিছিয়ে চলা অর্জুনেব দিকে বাংলায় কথা ছুঁড়ে দিলেন, "এই ব্যাটাদের আমরা দুশো বছর আমাদের দেশে রাজত্ব করতে দিয়েছিলাম, বুঝলে?"

অর্জুন হেসে জবাব দিল, "এরা নয়, এদের পূর্বপুরুষরা।"

"দ্যাটস রাইট।" বলে পেছন ফিরতেই দড়াম করে শব্দ। মেজরের ব্যাগ ঘুরে গিয়ে পাশ কাটিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যাওয়া আধবয়সী একটি

লোকের হাঁটুতে ধাক্কা মারল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি যেন হাওয়ায় সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ড ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করে নড়বড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একটা থাম ধরে নিজেকে সামলালেন। পরমুহূর্তেই তীরের মতো ছুটে এলেন তিনি। যেভাবে হাত উঁচিয়ে এলেন, তাতে অর্জুনের আশঙ্কা হচ্ছিল, হয়ে গেল একটা কিছু। ভদ্রলোক যে অনর্গল গালাগাল দিচ্ছেন, তা মুখের অভিব্যক্তিতে বুঝতে পারছে সে। মেজর কান পেতে যেন বুঝতে চাইছেন, ভদ্রলোক কী বলছেন। কারণ, যে-ভাষায় শব্দগুলো ছোঁড়া হচ্ছে তা অর্জুনের জ্ঞানের বাইরে। তবে মেজর তো দুনিয়াসুদ্ধু ভাষা জানেন। হঠাৎ মেজরের গলায় বাজ ডাকল, "অ্যাই ছুঁচো, বদমাশ, তোর ভাষা আমি বুঝতে পারছি না। তুই কোন দেশের ভূত ? কিন্তু আমি একা খাব কেন ? তুইও খা। পাজি, ছুঁচো, খবরদার হাত চালাবি না।"

লোকটা এবার থমকে গেল। অর্জুন লক্ষ করল, অন্যান্য যাত্রীরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে একবার আড়চোখে তাকিয়ে, কিন্তু কেউ ভিড় বাড়াচ্ছে না। মিসেস গ্রান্ট এবার দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মেজরকে বললেন, "মেজর এটা তোমার দোষ। তুমি সতর্ক হয়ে চললে উনি ধাক্কা খেতেন না।" তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, "সরি।"

ভদ্রলোক আবার উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতেই মিসেস গ্রান্ট তড়িঘড়ি মাথার ওপরে তাকিয়ে সরে এলেন মুখে হাত চাপা দিয়ে। ওরা মুখ তুলে তাকাতেই দেখল, মাথার ওপরে দেওয়ালের গায়ে একটা কুচকুচে কালো সাপ ফণা তুলছে। সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক, সাপটা যাঁর ঠিক মাথার ওপরে, একটা আর্ত চিৎকার করে ছুটলেন সামনে। মেজর মুগ্ধ হয়ে সাপটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "রেয়ার টাইপ অব কোবরা। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে ওদের বাড়ি। কামড়ালে এক সেকেন্ড। কিন্তু এ-ব্যাটা দলছুট হয়ে হিথরো এয়ারপোর্টে এল কী করে ?" এই সময় সেই ভদ্রলোক দু'জন পুলিশ নিয়ে ছুটে এলেন। ওঁদের দৃষ্টি পুলিশের ওপর পড়েছিল। ভদ্রলোক আঙুল তুলে পুলিশদের ওপরের দিকে তাকাতে বলতেই ওরা হোহো করে হেসে উঠল। অর্জুন মাথা তুলে দেখল, একটা কালো তার সেখানে ঝুলছে সামান্য মুখ উঁচিয়ে। অর্জুন খুব অবাক হয়ে মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকাল। তিনি হেসে বললেন, "এভরিথিং অলরাইট ? চলো, আমরা বের হই।"

পুলিশ দু'জন তখন ভদ্রলোককে ঠাট্টা করছে। মেজর তাঁকে বললেন, "সরি। আপনাকে ধাক্কা দিইনি, লেগে গিয়েছিল।" তারপর হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে বিড়বিড় করলেন, "আমি একটা গাধা। নইলে ম্যাজিক দেখে বুঝতে পারি না!"

লন্ডনে ঢুকতে গেলে তখন হিথরো এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট ভিসা কিংবা এনট্রি-পারমিট দেখতে চাইত না। তারা শুধু প্রশ্ন করত, যে ঢুকছে তার থাকা-খাওয়ার মতো পয়সা বা আশ্রয় আছে কি না। সেটা পরিষ্কার হতে ওরা পাশপোর্টের গায়ে ছাপ মেরে লিখে দিত, আগন্তুক ক'দিন ইংল্যান্ডে থাকতে পারে। জোন্‌স অ্যান্ড জোন্‌স কোম্পানির দৌলতে অর্জুনের পকেটে পয়সার অভাব ছিল না। আসলে সেই কারণেই মেজর তাকে বলেছিলেন, "সোজা দেশে ফিরে যাবে কেন হে ? বিমান কোম্পানির কাছে চাইলে তো তুমি লন্ডনে স্টপ ওভার পেতে পারো। একই ভাড়ায় ক'দিন ও-দেশটাও দেখে যাও। আমাকেও তো ব্ল্যাকপুলে যেতে হচ্ছে।"

বেড়ানোর নামে কার না জিভে জল আসে ! লাইটার-রহস্য ভেদ করতে আমেরিকায় এসে অবশ্য অর্জুন হাঁপিয়ে পড়েছিল এর মধ্যে। দেশেব জন্যে মন খারাপ করছিল খুব। তবু ব্রিটিশদের দেশ দেখার লোভটার জন্যে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "ব্ল্যাকপুলটা কোথায় ?"

"ইংল্যান্ডের একটা সমুদ্রের ধারে। লেক ডিস্ট্রিক্ট জানো ?"

"আমি ইংল্যান্ডের কিছুই জানি না।"

"জানা উচিত। গোয়েন্দাদের সব ইনফরমেশন রাখা দরকার।"

"আমি গোয়েন্দা নই। সত্যসন্ধানী।" অর্জুন প্রতিবাদ করেছিল।

"অ। ব্ল্যাকপুলে আমাব পুরনো বন্ধু জেমস মার্শাল একটা দারুণ এক্সপেরিমেন্ট করছে সমুদ্রের জলে। ঘুরেই যাও না হে।" মেজর বলেছিলেন।

হিথরো এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখল, বেজায় ভিড়। সবাই যে-যার আত্মীয়দের নিতে এসেছে। এয়ারপোর্টের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় অর্জুন লক্ষ করেছে, সর্দারনিরা লম্বা ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দিচ্ছেন এয়ারপোর্ট। সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরা মহিলা কাজ করছেন ! আর বাইরে এসে যাদের দেখল, তাদের অর্ধেকেই ভারতীয়। শুধু ভারতীয়দেরই আত্মীয়-বন্ধু এ-দেশে বেশি আসে নাকি !

লন্ডনের আকাশে এখন মেঘ। অবশ্য হিথরো এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়ালে লন্ডন সম্পর্কে কোনও আঁচ করা যায় না। এখন ভর-সকাল। কিন্তু চারধারে এমন আলো, যেন দিনটা রাতের তারে ঝুলছে। অর্জুন দেখল, মিসেস গ্রান্ট এবং মেজর খুব তর্ক করছেন। বিষয়টা সে বোঝার চেষ্টা করল না। তার চোখ যাত্রী, গাড়ি এবং রাস্তার ওপর ঘুরছিল। হঠাৎ মেজর তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। "যাওয়ার সময় আমাদের লন্ডনে থাকা হচ্ছে না হে। এই ভদ্রমহিলা বায়না করছেন আমাদের ওঁর ওখানে দু'দিন থাকতেই হবে। ব্রিটিশ হলে হুট করে বলত না। তা তুমি কী বলো, থাকবে ? আমার মনে হয়, থাকাই উচিত। কারণ ওঁর বাড়ি থেকে

ব্ল্যাকপুল মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ।" বলতে বলতে মেজর অর্জুনের মতামত না জেনেই হাত তুলে মিসেস গ্রান্টকে সম্মতি জানালেন।

কেউ যদি এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশে, কিংবা স্বদেশেরই অন্য কোথাও যায় তো তার গাড়ি স্বচ্ছন্দে এয়ারপোর্টের পার্কিং লটে পার্ক করে যেতে পারে। মাসখানেক পরে এলেও দেখা যাবে, গাড়িটিতে কেউ হাত দেয়নি। তার জন্যে পয়সা দিতে হয় বটে, কিন্তু ভয় থাকে না এক ফোঁটা! মিসেস গ্রান্টের গাড়িতে বসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা এয়ারপোর্ট-এলাকাব বাইরে চলে এল। লন্ডন শহরের ধারকাছ দিয়ে ওরা যাচ্ছে না। কিন্তু নিপাট রাস্তা, ঢেউ-খেলানো পরিষ্কার সবুজ মাঠ, আর রাস্তার ওপর জায়গার নাম লিখে দিক-নির্দেশ করা, সব মিলিয়ে চমৎকার লাগছিল। ঘেরা মাঠের মধ্যে যে গোরুগুলো চরছে, তাদের চেহারা দেখে আমাদের দেশের গোরুর জন্যে কষ্ট হল। অর্জুন দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছিল পাহাড়ের জন্যে। কিন্তু কোথাও পাহাড়ের চিহ্ন নেই। অথচ ঠাণ্ডা তো বেশ। কথাটা বলতেই হেহে করে হাসলেন মেজর, "মনে করো তুমি পাহাড়ের চুড়োয় বসে আছ, তা হলে সামনে পাহাড় দেখবে কী করে?" এইবার অমল সোমের জন্যে অর্জুনের মন-খারাপ হয়ে গেল। উনি থাকলে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন নিশ্চয়ই, পাহাড় না-থাকা সত্ত্বেও কেন এত ঠাণ্ডা লাগে সারা বছর। অমলদা কি সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন? আমেরিকায় পৌঁছবার পরও তিনটে চিঠি লিখেছে অমলদাকে জলপাইগুড়ির ঠিকানায়। একটি চিঠিরও জবাব আসেনি।

মিসেস গ্রান্ট গাড়ি চালাচ্ছেন খুব সহজ ভঙ্গিতে। ভদ্রমহিলা যে চমৎকার ম্যাজিক জানেন, তা বোঝা গেল। কিন্তু উনি যদি ব্রিটিশ না হন, তা হলে ব্রিটেনে ওঁর বাড়ি-গাড়ি কেমন করে থাকবে? তারপরেই ওর মনে পড়ল, ভাবতীয়রা যদি এদেশে থাকতে পারে, তা হলে উনি কেন পারবেন না। এবাব মিসেস গ্রান্ট বললেন, "তোমরা কী নিয়ে কথা বলছিলে?"

মেজর হাসলেন, "অর্জুন বলছে, এদেশে পাহাড় আছে কি না?"

"আছে। দেখবে? আচ্ছা, এই বাঁকটা পেরিয়ে আমরা পাহাড়ের পাশে থামব।" ভদ্রমহিলা হাসলেন ওর দিকে একবার তাকিয়ে। এঁর কথাবার্তা স্পষ্ট বুঝতে পারে অর্জুন। আমেরিকানদের মতো অত জড়ানো নয়। কিন্তু বাঁকটা তো দেখা যাচ্ছে; অথচ পাহাড়ের চিহ্ন দিগন্তে নেই। সে দেখল, বোর্ডে ল্যাঙ্কাশায়ার লেখা। এই নামগুলো সে জানে। ইয়র্কশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার, ডার্বিশায়ার। যেন ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা। ব্রিটিশরা ওদের সমস্ত সাহিত্য দিয়ে দুশো বছরে ভারতীয়দের এ-সব চিনে নিতে বাধ্য করেছে।

বাঁক ঘুরতেই অর্জুনকে মিসেস গ্রান্ট বললেন, "ওই দ্যাখো পাহাড়।"

অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। সত্যি একটা বিশাল পাহাড় সামনে এগিয়ে আসছে। এত উঁচু এবং তুষারে ভরা যে, অর্জুন নড়তে পারছিল না বিস্ময়ে। কিন্তু গাড়িটা থামামাত্র পাহাড়টা মিলিয়ে গিয়ে একটা বড়সড় ঢিপি হয়ে গেল। ঢিপিটা পুরনো ভাঙা কিংবা বাতিল গাড়ির। অন্তত শ'তিনেক গাড়ি রাস্তার পাশে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ম্যাজিকের কল্যাণে এটাকেই সে পাহাড় বলে ভুল করেছিল। অর্জুন সভয়ে মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকাল। জাদুকরী গ্রান্ট যদি ম্যানড্রেকের মতো ভালমানুষ হন, তা হলে খুব ভাল হয়।

গাড়িটা থেমেছিল। মিসেস গ্রান্ট পেট্রল নেবেন। পেট্রল পাম্পটা খুব সুন্দর। হলদে রংটা চোখে বেশ লাগে। তার পাশেই একটা ডিপার্টমেন্টাল শপ। আর কিছু নেই আশেপাশে। দিগন্তবিস্তৃত শুধু মাঠ আর মাঠ। একটা গাড়ি পার্ক করা আছে ডিপার্টমেন্টাল শপের সামনে। অর্জুন গাড়িগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল বারংবার। মেজর নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাতিল গাড়ি, বুঝলে? এগুলো এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলবে। আমি একটু দোকানটা ঘুরে আসি। বসে-বসে হাতে-পায়ে জং ধরে গেল হে।"

অর্জুন নেমে দাঁড়াল। শিরশিরে ঠাণ্ডা আছে। মিসেস গ্রান্ট এগিয়ে এলেন। "তুমি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ? আসলে মজা করার লোভটা প্রায়ই পেয়ে বসে আমাকে।"

অর্জুন দ্রুত মাথা নাড়ল। "না, না, কিছু মনে করিনি।"

"গুড। তুমি কি প্রথম আসছ ইংল্যান্ডে?"

"হ্যাঁ।"

"সো নাইস। লেট'স্ গো ফর কফি!"

অর্জুন মাথা নাড়তেই ভদ্রমহিলা এগোলেন পেট্রল পাম্পের পাশের দোকানের দিকে। ভিতরে ঢুকে বেশ অবাক হয়ে গেল সে। আমেরিকাতে সে এরকম দোকান দেখেছে, যেখানে যাবতীয় জিনিসপত্র সুন্দর থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হয় ক্রেতাদের জন্যে। তাঁরা পছন্দমতো জিনিস নিয়ে বেরোবার সময় কাউন্টারে দাম মিটিয়ে দিয়ে যায়। আলু থেকে পারফিউম, সবই পাওয়া যায় ওখানে। কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এত বড় দোকান, খদ্দের কোথায়? চট করে মেজরকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিভিন্ন গলিতে রাখা। তারই একটায় মেজর খুঁটিয়ে একজোড়া জুতো দেখছিলেন। মিসেস গ্রান্ট জিজ্ঞেস করলেন, "এই সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টারে তুমি কী করছ মেজর?"

"লুক," মেজর জুতোটা দেখালেন, "এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বটে, কিন্তু মোটেই বেশি ব্যবহৃত হয়নি। এই জুতো দু'বছর হল তৈরি হয় না। কিন্তু অভিযানের পক্ষে এর চেয়ে ভাল কিছু নেই। অনেকদিন থেকে খুঁজছিলাম

আমি। যেবার তুন্দ্রা অঞ্চলে গিয়েছিলাম, তখন একজনকে পরতে দেখেছিলাম। আমি এই জুতোজোড়া নেব।" মেজর জুতোজোড়া হাতে ঝুলোলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "অন্যের পরা জুতো আপনি পরবেন?"

মেজর বললেন, "জুতোটা খুব দরকারি। জীবাণুমুক্ত করে নিলেই হবে।"

"এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস বিক্রি হয়?"

"হ্যাঁ। এই দিকটায়। যাদের কম পয়সা, তারা কেনে। এই আমার মতো।" বলে নিজে থেকেই হোহো করে হেসে উঠলেন মেজর। হঠাৎ মিসেস গ্রান্টের মুখ ভারী হয়ে গেল, "শোনো মেজর, আমি যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকব, ততক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলবে। তুমি যে জোক করলে, আমি তা বুঝতেই পারলাম না।"

মেজর হাত তুলে বললেন, "তথাস্তু।"

কফি খেয়ে গাড়িতে ফিরতেই আর-একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। মেজর আসনে বসলেন। মিসেস গ্রান্ট পেট্রলের দাম দিতে ভেতরে গেলেন। অর্জুনের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, শো-কেসে একটা গগল্‌স্ দেখে এসেছে, সেটা এই ফাঁকে চটপট কিনে আনার। সে মেজরকে এক মিনিট দাঁড়াতে বলে ডিপার্টমেন্টাল শপে আবার ঢুকে পড়ল। নতুন-আসা গাড়ির লোক দুটোও তখন তার পাশ দিয়ে ঢুকছে। অর্জুন ঝুঁকে পড়ে গগলসের লকেটে লেখা দাম পড়তে গিয়ে শুনল একটা লোক বলছে, "ইট মাস্ট বি ইন দি সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টার। ফাইন্ড ইট, আই অ্যাম হিয়ার। জুতোটা চিনতে ভুল কোরো না।"

অর্জুন মুখ তুলে তাকাল। সেই লোক দুটো, যারা এইমাত্র ঢুকল। দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "এক লক্ষ জুতোর মধ্যে থাকলেও জ্যাকের জুতো খুঁজে বের করতে পারব।"

দুটো লোকের চোখেই গগল্‌স্। দ্বিতীয়জন উধাও হয়েছে। প্রথমজন তার চামড়ার জ্যাকেটে হাত গলিয়ে শিস দিচ্ছে। এদের ভঙ্গি মোটেই ভাল লাগল না অর্জুনের। সে একটু সময় নিতেই দ্বিতীয় লোকটা প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে ফিরে এল, "ইটস নট দেয়ার।"

"নিশ্চয়ই ওখানে আছে। মারা যাবার আগে লোকটা মিথ্যে বলবে না।" প্রথম লোকটা ছুটল।

অর্জুন আর দাঁড়াল না। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এরা কোন্ জুতোর খোঁজ করছে? খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে গাড়িতে উঠে বসল। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু কিনলে?"

সে ঘাড় নেড়ে 'না' বলল। কিন্তু সেইসঙ্গে চোখের কোণে দেখতে পেল দোকানের দরজায় ওরা এখনও এসে পৌঁছয়নি। কাউন্টারে যদি

খোঁজ নিত এবং এই জুতোই যদি সেই জুতো হত, তা হলে যে-লোকটা জিনিস দেখে দাম নিচ্ছে, সে বলে দিত কতক্ষণ আগে বিক্রি হয়েছে। মিসেস গ্রান্টের গাড়ি তখন আবার হাইওয়েতে পড়েছে। সামনের সারিতে পা-রাখার জায়গায় জুতোজোড়া রাখলে অসুবিধে হবে বলে মেজর জুতোজোড়া পেছনের পা-রাখার জায়গায় রেখেছেন। জুতোজোড়া অর্জুন দেখতে পাচ্ছিল। মোটা, ভারী, এবং গোড়ালি থেকে অনেকটা উঁচুতে উঠে আসা জুতো। বানিয়েছে কায়দা করে, আর সেই কায়দাটা চোখে পড়ে। কালিম্পং-এ এরকম জুতো পরতে অনেককে দেখেছে সে। কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড জুতো কেউ পরছে ভাবা যায়? মেজর মানুষটি অদ্ভুত। অবশ্য এই জুতোজোড়ার তেমন কোনও ইতিহাস না-ও থাকতে পারে।

এখন গাড়ি চলছে হাইওয়ে দিয়ে। রাস্তা মোটেই নির্জন নয়। পাশাপাশি তিনটে ট্র্যাকে তিনরকম গতিতে একমুখী গাড়িগুলো ছুটছে। ও-পাশের তিনটে ট্র্যাকে বিপরীতমুখী গাড়িগুলো যাচ্ছে। রাস্তার খানিকটা দূরে দূরে বিভিন্ন রকমের নির্দেশিকা টাঙানো। এমনকী, কোথায় পেট্রল পাম্প, স্ন্যাকস্‌, কিংবা মোটেল পাওয়া যাবে, তাও। কিন্তু একটা জিনিস দেখে সে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। হাইওয়ের দু'পাশে কোনও বসতবাড়ি বা জনবসতি নেই। শুধু মাঠ কিংবা খামার। যেদিকে তাকাও, শুধু চোখের আরাম।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর মিসেস গ্রান্ট হাইওয়ে ছেড়ে ডান দিকের রাস্তা ধরলেন। অর্জুন দেখল বোর্ডে তীর এঁকে লেখা আছে 'বোল্টন'। অর্থাৎ এই বোল্টনে মিসেস গ্রান্ট যদি থাকেন, তা হলে যাত্রার সমাপ্তি হয়ে এল। ক্রমশ বাড়িঘর চোখে পড়তে লাগল। ছিমছাম, সুন্দর। বেশির ভাগ একতলা বাগানওয়ালা বাড়ি। দোতলাগুলো বাংলো প্যাটার্নের। ফুটপাথে লোকজন বেশি নেই। মনে হচ্ছে শহরটা ছিমছাম, অল্প মানুষের। দোকান, বার, ক্লাব চোখে পড়ছিল। হঠাৎ অর্জুন মুখ ফিরিয়ে উদ্ভাসিত হল। একটা দোকানের সামনে লেখা আছে, 'মা, অ্যান ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ'। এত দূরে এসে কোনও ভারতীয় দোকান করে বসে আছে!

মিসেস গ্রান্টের বাড়িটা চমৎকার। শহরের ও-প্রান্তে নির্জন রাস্তার গায়ে ওঁর গেট। তারপর তিনটে টেনিসকোর্টের মতো লন পেরিয়ে বাড়ির গাড়িবারান্দা। নীচে নেমে দাঁড়িয়ে মিসেস গ্রান্ট সামান্য ঝুঁকে হাসলেন, "ওয়েলকাম টু মাই লিটল নেস্ট।"

ততক্ষণে ভেতরের দরজা খুলে একটি নিগ্রো প্রৌঢ় বেরিয়ে এল। "গুড আফটারনুন, মিসেস গ্রান্ট।"

"গুড আফটারনুন, চার্লি। এঁরা আমার বন্ধু। মেজরকে তো তুমি এর আগে দেখেছ। আমি এঁদের অনুরোধ করেছি কয়েকটা দিন এখানে

কাটিয়ে যেতে।" মিসেস গ্রান্ট হাসলেন।

"খুব ভাল করেছেন। আপনারা ভেতরে গিয়ে বসুন, আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছি।"

অগত্যা খালি হাতে ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল। এইসময় চার্লি চিৎকার করে উঠল, "ইটস্ নট ডান, সেকেন্ড হ্যান্ড দোকান থেকে জুতো কেনা মোটেই উচিত নয়।"

মিসেস গ্রান্ট মাথা নাড়লেন, "চার্লিটা সবসময় আমাদের ওপর শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আসুন।"

পাশাপাশি দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে ওদের দু'জনকে। এত আরামের ঘরে অর্জুন কখনও থাকেনি। এমনকী, আমেরিকাতেও নয়। দুধের সরের মতো বিছানা। গালচে থেকে আসবাবপত্রে পুরনো ঐতিহ্য চমৎকার মেজাজি করে তোলে। কাচেব জানলার এপাশে কাজ-করা পর্দা। আজ অনেক গল্প হয়েছে। সন্ধের পর ডিনার খেয়ে যে-যার ঘরে শুতে চলে গেছেন ওঁরা। কিন্তু এখন রাত ন'টাই বাজেনি। অর্জুনের ঘুম পাচ্ছিল না। সে তার ঘরের গোল-সোফায় আরাম করে বসে ছিল। জলপাইগুড়ির একটা বেকার ছেলে ইংল্যান্ডের এরকম বনেদি বাড়িতে একা ঘরে একা বসে পা নাচাবে, তা কি কেউ ভেবেছিল? সে ঝুঁকে সামনের বাক্সটার গায়ে উঁচিয়ে-থাকা বোতাম টিপতেই ঝপ কবে সেটা খুলে এক ডজন বড় চুরুট বেরিয়ে এল, পাশে দেশলাইয়ের পাতা। অর্জুন মাঝে-মাঝে সিগাবেট খায়, কিন্তু চুরুটের অভিজ্ঞতা ছিল না। এ-ঘরে যখন রাখা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই সে ব্যবহার করতে পাবে। আরাম করে ধরিয়ে সে মৃদু ধোঁয়া ছাডতেই বুঝতে পারল, পুরোটা খাওয়া অসম্ভব। চুরুট হাতে সে উঠে জানলার পাশে দাঁড়াল। এই ঘরে হাওয়া ঢুকছে না, তবু ঠাণ্ডা বেশ। বাইরের জ্যোৎস্নালোকিত বাগানটায় নিশ্চয়ই হাড়-কাঁপানো ব্যাপার চলছে। ফুলের গাছের পাশাপাশি কয়েকটা এ-দেশী লম্বাটে গাছ ছায়া ফেলছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। অর্জুন বাগানের সেই মায়াময় দৃশ্য দেখছিল চুরুট খেতে-খেতে। আচমকা বাড়িটা কেঁপে উঠল একটা চিৎকারে। ডাকাত পড়লে কিংবা ভূত দেখলে এরকম চিৎকার বেরোয় গলা থেকে।

চিৎকারটা আসছে মেজরের ঘর থেকে। নিজের দরজা খুলে অর্জুন মেজরের দরজার দিকে যাওয়ার সময় দেখল, চার্লি এবং একজন মহিলা-কাজের-লোক ছুটে আসছে বিপরীত দিক থেকে। মিসেস গ্রান্টের গলা পাওয়া গেল, "কী হয়েছে চার্লি?"

চিৎকারটা তখন থেমেছে, কিন্তু গোঙানি বন্ধ হয়নি। অর্জুন বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল, "মেজর, মেজর! আপনার কী হয়েছে? মেজর!

দরজা খুলুন।"

চার্লি বলল, "ইট মাস্ট বি আ গোস্ট।"

"গোস্ট ?" মিসেস গ্রান্ট এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে।

"ইয়েস মিসেস গ্রান্ট। গোস্ট অব দোজ শুজ।" ভয়ার্ত স্বরে বলল চার্লি।

এখন গোঙানিটা থেমেছে। এবং তার কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললেন মেজর। খুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ! সবাই এখানে কেন ? কিছু হয়েছে নাকি বাড়িতে ?"

মিসেস গ্রান্ট উদ্বিগ্ন হয়ে এগিয়ে এলেন। "কী হয়েছে আপনার মেজর।"

"আমার ? নাথিং ! কিস্যু হয়নি। আমি আরাম করে ঘুমোচ্ছিলাম।" মেজর হাসলেন।

উত্তর শুনে মিসেস গ্রান্ট অর্জুনের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কোনও কিছুর স্বপ্ন দেখছিলেন মেজর ?"

"স্বপ্ন ? ওঃ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে।" তারপরেই লাফিয়ে উঠলেন বিশাল শরীর নিয়ে, "ইউরেকা !" কিন্তু শরীরটা এসে পড়ল জুতোজোড়ার ওপরে। দরজার পাশে ও-দুটোকে রেখে গিয়েছিল চার্লি। আর ব্যালান্স হারিয়ে কার্পেটের ওপর চিত হয়ে পড়লেন মেজর। মিসেস গ্রান্ট জিজ্ঞেস করলেন, "আর ইউ অলরাইট মেজর ?"

"অ্যাবসলিউটলি।" মেজর শুয়ে-শুয়েই একবার কাতর-চোখে জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে উঠে বসলেন। গায়ে লাগা কল্পিত ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "পেয়ে গেছি। ক্যান্সারের ওষুধ পেয়ে গেছি।"

অর্জুন চমকে উঠল, "ক্যান্সারের ওষুধ ?"

বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়লেন মেজর, "আমি স্বপ্ন দেখলাম ব্ল্যাকপুলে সমুদ্রের মধ্যে মার্শালের সঙ্গে ঝিনুক নিয়ে অভিযান করতে গিয়ে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁকে পড়লাম। মার্শালের একজন কর্মচারীর গলায় ক্যান্সার ছিল। সে ওই উড়ুক্কু মাছ সেদ্ধ করে খেতেই গলার ব্যথা কমে গেল। আর তখনই হাঙরটা আমাদের আক্রমণ করল। তার মানে উড়ুক্কু মাছের তেলই ক্যান্সারের ওষুধ।"

মিসেস গ্রান্ট বললেন, "আপনি স্বপ্নে হাঙর দেখে চিৎকার করেছিলেন।"

মেজর বললেন, "আমি ? নেভার ! আমি কালই ব্ল্যাকপুলে যাচ্ছি।"

হঠাৎ চার্লি মেঝেতে বসে পড়ে বুকে মাথায় ক্রস আঁকতে লাগল। "ও মিসেস গ্রান্ট। ইট্‌স দ্যাট গোস্ট অব দোজ শুজ। ওই জুতোয় নিশ্চয়ই ভূত আছে। সেই ভূত মিস্টার মেজরকে ভয় দেখিয়েছে। সে-ই একটু আগে মিস্টার মেজরকে মাটিতে ফেলে দিল। যার জুতো, সে নিশ্চয়ই

মারা গিয়েছে। তার ভূত জুতোর মধ্যে বসে আছে।"

মেজর থতমত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখজোড়া জুতোর ওপরে। তিনি চার্লির দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, "কী, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে ? নো, নেভার। তুমি জানো, আমি হরেক মুল্লুকে এক্সপিডিশানে গিয়েছি ! একটা ভূত ভয় দেখাবে, আর আমি ভয় পেয়ে যাব ? তবে তোমরা যখন বলছ, তখন জুতোটা ঘরের বাইরে রাখা যেতে পারে।"

কেউ কিছু বলার আগেই অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জুতোটা দরজার বাইরে একপাশে রেখে দিল। এবার মিসেস গ্রান্ট বললেন, "ওয়েল ! লেট'স গো ব্যাক টু আওয়ার রেসপেক্টিভ বেডস্।"

সবাই চলে গেলে অর্জুন মেজরের ঘরে ঢুকল। এসব ব্যাপার মেজরের মাথায় মোটেই নেই। তিনি তখন টেলিফোন নিয়ে বসে। "ইয়েস ! মেজর, টেল হিম আই ওয়ান্ট হিম রাইট নাউ।" মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন, "ব্যাটা মুক্তো খুঁজছে ! তার চেয়ে যে কয়েক লক্ষ গুণ দামি কাজ..." বলেই চিৎকার করে উঠলেন, "ও, মার্শাল, ইউ লিটল ডেভিল, আমি এখন বোস্টনে। কী বলছ, দারুণ কাজ হচ্ছে ? ছাই হচ্ছে। উড়ুক্কু মাছ কেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ওই উড়ুক্কু মাছ চাই। আমি কালই রওনা হচ্ছি।"

অর্জুন বলল, "জিজ্ঞেস করুন তো ওর কোনও কর্মচারীর গলায় ক্যান্সার আছে কি না ?"

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বিরক্ত হয়ে অর্জুনের দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন মেজর, "কী ? কারও ক্যান্সার নেই ? সে কী ? আহা, এমনও তো হতে পারে, তোমার কাছে চেপে গিয়েছে চাকরি হারাবার ভয়ে। আমি কালই তোমার কর্মচারীদের ডাক্তার নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাব। তুমি কিছু বুঝতে পারছ না ? হেহে। সবই যদি বুঝবে, তা হলে তুমি মার্শাল আর আমি মেজর হব কেন ? ঠিক হ্যায়, কাল দেখা হবে।"

রিসিভার রেখেও মেজরের উত্তেজনা কমল না। চোখ বন্ধ করে হাসলেন, "মার্শালটা সত্যি পণ্ডিত। আচ্ছা, পণ্ডিতরা মাঝে-মাঝেই এরকম হাঁদা হয় কেন, বলো তো ? কিস্যু বুঝতে পারে না।"

মেজরকে শুভরাত্রি জানিয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। আবার বাড়িটা শব্দহীন হয়ে গেছে। প্যাসেজের আলোগুলোকে এখন বিবর্ণ বলে মনে হচ্ছে। চার্লি যেভাবে ভূতের কথা বলল, তারপর আজ রাত্রে কেউ সম্ভবত নিজের ঘরের বাইরে পা দেবে না। অর্জুন খানিকটা দূর চলে এসে আবার থমকে দাঁড়াল। ওই জুতোয় যদি ভূত থাকে চার্লির কথামতো, তা হলে এই তো সুযোগ। আজ অবধি সে কখনও ভূত দ্যাখেনি। চটপট ফিরে গিয়ে বাঁ হাতে ফিতে ধরে জুতোজোড়া ঝুলিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল। ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় চুরুট রেখে গিয়েছিল

ছাইদানিতে, ফিরে এসে আবার ধরাল ওটাকে। মেজর যে স্বপ্ন দেখে অমন কাণ্ড করবেন কে জানত ! মুশকিল হল স্বপ্নটাকে সত্যি ভাবতে ওঁর ভাল লাগছে।

অর্জুনের মনে হল পৃথিবীটা আরও নিশ্চুপ হয়ে গেছে। এইবার শুয়ে পড়া উচিত। মিসেস গ্রান্ট সত্যি ভাল মহিলা। ম্যাজিক দেখাতেন আগে পেশাদারি ভাবে। এখন আর বাইরের লোকের সামনে দেখাতে চান না। এরকম মানুষের সঙ্গে কার না থাকতে ভাল লাগে। কিন্তু তিনিও কি জুতোর ভূতটাকে বিশ্বাস করলেন ! অর্জুন জুতোর দিকে তাকাল। আচ্ছা, সে ঘরে ঢুকে ও-দুটো রাখার সময় গায়ে-গায়ে রেখেছিল, না অতটা ছেড়ে রেখেছিল ? অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। সে চুরুটটাকে রেখে উঠে জুতোজোড়ার কাছে এসে একটাকে তুলে ধরল। দেখতে যেমন মনে হয়, ততটা ভারী নয় মোটেই। কোথাও সামান্য নোংরা লেগে নেই। কিন্তু তারপরেই একটা জায়গা দেখে তার চোখ ছোট হয়ে এল। সে পলকে দ্বিতীয় জুতোটা তুলে নিল। ডানদিকেরটায় বাঁ দিকে আর বাঁ দিকেরটায় ডান দিকে কালচে দাগ যেন সেঁটে আছে। জুতোটা পালিশ হয়নি অনেক দিন। ফলে জুতোর ব্রাউন রঙের সঙ্গে এই কালচে রংটা মিশে গিয়েও থেকে গেছে। ও-দুটোকে টেবিলের ওপর রেখে সে নিজের স্যুটকেস খুলল। তারপর যে ম্যাগনিফায়িং কাচ সে টাইম স্কোয়ারের ফুটপাথ থেকে কিনেছিল, সেটা বের করে কালচে রংটার ওপর ধরল। হ্যাঁ, কোনও তরল পদার্থ জুতোয় পড়ে শুকিয়ে সেঁটে গেছে। অর্জুন সোজা হয়ে বসল। একমাত্র রক্তই শুকিয়ে গেলে কালচে হয়ে যায়। কিন্তু এটা রক্তের দাগ কি না, তা পরীক্ষা না করালে বোঝা যাবে না।

কিন্তু অর্জুনের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। আচ্ছা, ঠিক এই জুতোজোড়ার জন্য ডিপার্টমেন্টাল শপে কি লোক দুটো ঢুকেছিল ? দাগটা, অর্থাৎ তরল পদার্থ পড়েছে ঠিক ওপর থেকে সরাসরি একই জায়গায়। ফলে জুতোর দু'পাটির মাঝখানে রং লেগেছে। এই তরল পদার্থ যদি রক্ত হয়, তা হলে নিশ্চয়ই জুতোর মালিককে খুন করা হয়েছে, কিংবা তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু লোকটি যদি খুন হয়েই থাকেন, তবে তাঁর জুতো সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টারে যাবে কী করে, অথবা সেই জুতোর খোঁজে লোক দুটো সেখানে পৌঁছবে কেন ? হঠাৎ অমল সোমের একটা উপদেশ মনে পড়ল অর্জুনের। কোনও প্রমাণ ছাড়া শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া মূর্খতার সামিল। এটা যদি রক্ত না হয়, তা হলে কোনও মানুষ খুন হননি। রক্ত হলেও মানুষটি খুন হয়েছেন তা বলা যাবে না। অনেক কারণেই রক্তপাত হতে পারে। যার জুতো, তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করায় সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টারে দিয়ে যেতে পারেন। এবং ওই লোক দুটোর আসার সঙ্গে এই জুতোর কোনও সম্পর্ক না-ও

থাকতে পারে। এই পর্যন্ত ভাবার পর অর্জুনের মাথাটা হাল্কা হয়ে গেল।

সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আঃ, কী আরাম। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই আবার জুতোর কথা মনে হল। অনেক চেষ্টা করেও সে জুতোটাকে ভুলতে পারছে না। অর্জুন উঠে বসল। চার্লির কথা সত্যি নাকি? সে যে এত ভাবছে, তা কি ওই জুতোর ভূতের জন্যে? আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়! ডিপার্টমেন্টাল শপে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা যায়, এই জুতোজোড়া তাঁরা কোত্থেকে কিনেছেন। মালিকের নাম পেলে ব্যাপারটার সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে টেলিফোনের দিকে এগোতে গিয়ে তার খেয়াল হল, ডাইরেক্টরি দেখে নাম্বার বের করেও কোনও লাভ হবে না। এত রাত্রে নিশ্চয়ই কোনও দোকান খোলা থাকবে না।

অথচ ঘুম আসছে না। অর্জুন আবার টেবিলে গিয়ে বসল। অভিযানের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি এই জুতো। সাধারণ মানুষ কখনও পথে পরে বের হবে না। সে কাচটা আবার তুলে নিল। তরল পদার্থটা পড়ে গড়িয়ে গেছে। ফলে জুতোয় দাগ বেশি লাগেনি। চট করে নজর করাও মুশকিল। কিন্তু শুকনো দাগ বলছে, ওটা ওপর থেকে পড়েছে। অর্জুন ম্যাগনিফাইং কাচটা এবার জুতোর অন্য অংশে নিয়ে গেল। খুব বেশি দিন ব্যবহৃত হয়নি এগুলো। ডান পায়ের গোড়ালির তলা সামান্যও খয়ে যায়নি। বাঁ-পাটিটা সে তুলে ধরল। কাচের ভেতর দিয়ে জুতোটার শরীর অনেকগুণ বড় দেখাচ্ছিল। গোড়ালির হিলের কাছে কাচটা পৌঁছবার পর সে সামান্য চমকে গেল। খালি চোখে যেটাকে চামড়ার জোড়ের দাগ বলে মনে হচ্ছিল, সেটাকে যেন অন্যরকম লাগছে কাচের মধ্যে দিয়ে। সে ডান-পাটির গোড়ালির জোড়টা দেখল। একদম অটুট। কিন্তু বাঁ-পাটির জোড়টা যেন বেশিদিন লাগেনি। কারণ জোড়ের গায়ে দুটো ছোট্ট দাগ আছে। সম্ভবত কিছু দিয়ে ওখানে চাপ দেওয়া হয়েছিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ সে জোড়টা দেখল। ঠিক সমানভাবে বসেনি, যেমনটি ডান পায়ে বসে গেছে। সে একটা আলপিন তুলে নিয়ে জোড়টায় চাপ দিল। কিন্তু তাতে আলপিনটাই বেঁকে গেল। একটা শক্ত কিছু চাই। অর্জুন উঠে ঘরের চারপাশে দেখতে দেখতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে চলে এল। অনেক খোঁজাখুজির পর একটা চুলের কাঁটা খুঁজে পেল। কালো কাঁটাটা পড়ে ছিল ড্রয়ারের এক কোণে।

কাঁটাটা নিয়ে অর্জুন ফিরে এল টেবিলে। তারপর ওর দুটো মুখ সামান্য চেপে জোড়ের ভেতর ঢোকাতে চেষ্টা করে বিফল হল। হঠাৎ খেয়াল হতে পাশাপাশি ছোট্ট দাগ দুটোয় চুলের কাঁটার প্রান্ত রেখে সে চাপ দিতে লাগল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ধীরে-ধীরে কাঁটাটা ভেতরে ঢুকতে লাগল। ইঞ্চিখানেক ঢোকার পর আর-একটু চাপ দিতেই স্প্রিং-এর মতো তলাটা

নেমে গেল খানিকটা। হতভম্ব অর্জুন দেখল, জুতোর গোড়ালির ভেতরে একটা বোতামে চাপ পড়তেই এই কাণ্ড ঘটেছে। এবং তখনই সে কাগজটাকে দেখতে পেল।

কাঁপা-কাঁপা হাতে সুন্দর ভাঁজ করা কাগজটাকে বাইরে বের করল সে। একটা সেলোফেন পেপারে ওটাকে এমন করে রাখা আছে, যাতে জলেও নষ্ট না হয়। বের করে ভাঁজ খুলে কাগজটা সামনে ধরল অর্জুন। কালো কালিতে পর পর কয়েকটা শব্দ লেখা রয়েছে। 'বি· পি·। এস· এফ·। শ্যাডো কিস্‌ড্‌ দ্য পপলার। ফোর এল· টু ইউ।'

বারংবার শব্দগুলো, অক্ষরগুলো পড়ল অর্জুন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু এখন এটা দিনের মতো সত্যি যে, এই জুতোর মালিক খুব গোপন কিছু এই কাগজে লিখে রেখেছেন। তিনি চাননি, কাগজটা অন্য কারও হাতে পড়ুক। এবং এখন এটাও স্পষ্ট যে, ওই লোক দুটো জানতে পেরেছিল, জুতোর মধ্যে কোনও খবর পাওয়া যাবে। ওরা নিশ্চয়ই দেরিতে জেনেছে। হতে পারে লোকটা খুন হয়ে যাওয়ার পরে।

অর্জুন রোমাঞ্চিত হল। বি. পি. মানে ব্ল্যাকপুল নয় তো ? মেজর তো আগামীকালই তাকে ব্ল্যাকপুলে নিয়ে যাচ্ছেন।

ইংল্যাণ্ডের একটি সমুদ্রতীরের শহরের নাম ব্ল্যাকপুল। সেখানে মেজরের পুরনো বন্ধু মার্শাল গবেষণা করছেন। সমুদ্রের জলে ঝিনুক এবং মুক্তো নিয়ে নানান পরীক্ষা। মেজর এসেছেন এবার বন্ধুর সঙ্গে যোগ দিতে। দেশে ফেবার পথে আমেরিকা থেকে উড়ে অর্জুন নেমেছে লণ্ডনে ক'দিনের স্টপওভার নিয়ে। আবার কখনও ইংল্যাণ্ডে আসা হবে কি না সন্দেহ ; বাড়তি ভাড়া যখন লাগছে না, তখন এত-নাম-জানা দেশটাকে কে দেখতে না চায় !

জুতোর মধ্যে থেকে কাগজটাকে আবিষ্কার করার পর অর্জুন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। লোক দুটো ডিপার্টমেণ্টাল শপে যে এইজন্যেই এসেছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই। অনেক রাত ধরে চেষ্টা করেও সে কাগজের লেখাটার গোপন অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু বুঝতে পারছে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু এই লেখাতে ধরা আছে। তা না হলে কেউ জুতোর মধ্যে অমন কায়দা করে লুকিয়ে রাখে ! শেষ পর্যন্ত সে জুতোটাকে আবার ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়েছিল।

সকালে ঘুম ভাঙল মেজরের ডাকে। দরজা খুলে সে দেখল, মেজর সেজেগুজে তৈরি। ঘরে ঢুকে মেজর বললেন, "ইয়াং ম্যান, এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছ ! আমার মর্নিং ওয়াক শেষ হয়ে গেছে কখন। তৈরি হয়ে নাও, আমরা ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব।"

চেয়ারে বসে পা ছড়িয়ে মেজর সঙ্গে-আনা সকালের কাগজ খুলে বসলেন। অর্জুন অপ্রস্তুত অবস্থায় তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে এল। সে

বুঝতে পারছিল না, মেজরকে কাগজটার কথা বলবে কি না! কারণ, কয়েকদিন বাদেই সে চলে যাবে জলপাইগুড়িতে। এই রহস্যটায় সে কোনও ভূমিকা নিতে পারছে না যখন, তখন বলতে কোনও অসুবিধা নেই। অমল সোম বলেন, 'গোপন তথ্য কাউকে জানালে সে আগবাড়িয়ে নিজের মতামত চাপিয়ে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।' তবে সে যখন তদন্ত করতে যাচ্ছেই না, তখন বলাই উচিত। হাজার হোক, জুতোটা মেজর কিনেছেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসামাত্র মেজর বললেন, "ওহে নবীন গোয়েন্দা, তোমার জন্যে একটা জব্বর খবর আছে।"

"আমি গোয়েন্দা নই, সত্যসন্ধানী! খবরটা কী?" অর্জুন হাসল।

"কাল যে ডিপার্টমেন্টাল শপে আমরা জুতো কিনেছিলাম, তার গার্ড খুন হয়েছে। দোকান বন্ধ হয়েছে সাতটায়। খুন হয়ে যায় ন'টায়। ডাকাতরা দোকানে ঢুকেছিল। গার্ড বাধা দিতে গিয়ে মারা পড়ে। বেচারা!" খবরেব কাগজ থেকে মুখ তুলে মেজর জানালেন।

অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। সে কাগজটা নিজের হাতে নিয়ে আবার খববটা পড়ল। বিস্তৃত বিবরণ কিছু নেই। সে দোনোমনা করে জিজ্ঞেস কবল, "আমাদেব কি আজই ব্ল্যাকপুলে যেতে হবে?"

"অফ কোর্স! আমি মার্শালকে টেলিফোনে তাই বলেছি।"

"বেশ। যাওয়াব আগে একবার ওই ডিপার্টমেন্টাল শপে যাবেন?"

"মাথা খাবাপ? সেটা কত পেছনে তা জানো? কী দরকার সেখানে?"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে জুতোটা তুলে নিল, "কাল রাত্রে গার্ডটি খুন হয়েছে আপনার এই জুতোব জন্যে। আপনি যদি আগে না কিনতেন, তা হলে এই খুনটা হত না। আপনার পরে কারও প্রয়োজন হয়েছিল এই জুতো।"

"কী বলছ যা-তা?" মেজরের চোয়াল ঝুলে পড়ল যেন।

"ঠিক বলছি। আপনার কেনার পব দু'জন লোক এসেছিল এটার খোঁজে। তারা জুতোজোড়া না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল। পরে নিশ্চয়ই কেউ তাদের বলেছিল, আবার ভাল করে খুঁজে দেখতে। সেটা করতে গিয়েই মনে হচ্ছে এই কাণ্ড।"

অর্জুনের কথাটা শেষ হওয়ামাত্র মেজর দু'পা এগিয়ে এলেন, "কী আছে জুতোটায়? চার্লি বলছিল, ওটা ভুতুড়ে জুতো। কিন্তু তুমি এসব জানলে কী করে?"

অর্জুন আবার চুলের ক্লিপ দিয়ে জুতোর নীচটা খুলল। মেজর অবাক হয়ে গোপন চেম্বারটা দেখলেন, "মাই গড! কী ছিল ওখানে?"

অর্জুন এবার কাগজটা বের করল। সেটা পড়ে মেজর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এইসব কথার মানে কী?"

"মানেটা বুঝলেই সব সরল হয়ে যাবে। আপাতত বুঝতে পারছি, এই কাগজটার জন্যে একদল মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করছে না। আপনি যে এসব জানেন, তা কাউকে বলবেন না।" অর্জুন জুতোটা আবার ঠিকঠাক করে রাখল।

মেজর বললেন, "মাথা খারাপ! মনে হচ্ছে ওই জুতোটাই ফেলে দেওয়া উচিত।"

"জুতোটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত এটা কারও সামনে বের না করাই ভাল।"

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র চার্লি দরজায় দাঁড়াল। তাকে এক রাত্রেই খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। চার্লি বলল, "গুডমর্নিং! ব্রেকফাস্ট ইজ রেডি!"

অর্জুন বলল, "আমরাও। চলো, যাচ্ছি। মিসেস গ্রান্ট উঠেছেন?"

"মিসেস গ্রান্ট আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।" কথাটা বলেও সে গেল না। সামান্য দ্বিধা কাটিয়ে সে বলল, "মেজর, আপনাকে একটা অনুরোধ করব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" মেজর মাথা নাড়লেন।

"ওই জুতোটা আপনি পরবেন না। কাল সারারাত আমি আমার মৃত আত্মীয়দের স্বপ্নে দেখেছি। ভোর রাতে ওই জুতোর ভূতটা আমার দিকে তেড়ে এসেছিল। ওটাকে আপনি ফেলে দিন," বৃদ্ধ নিগ্রোটি খুব করুণ গলায় বলল।

"তুমি ফেলে দাও চার্লি। আই ডোণ্ট মাইণ্ড। লেটস্ গেট রিড অব ইট!"

মেজর কিছু বলার আগেই জুতোজোড়া চার্লিকে দিয়ে দিলেন। যেভাবে লোকে মরা নেংটি ইঁদুরের লেজ ঝুলিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি করে চার্লি ও'দুটো নিয়ে দ্রুত চলে গেল। অর্জুন বলল, "কাজটা ঠিক হল না। পুলিশকে আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন না।"

"পুলিশ? পুলিশের কাছে কে যাচ্ছে? ওসবে আমি নেই। আমি অভিযাত্রী, আসামি নই। চলো, মন খুলে ব্রেকফাস্ট খাই।" মেজর হাঁটতে লাগলেন। যেন জুতোর ভার কমিয়ে তিনি এখন খুব হাল্‌কা হয়ে গেছেন।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে দেখা হল। এবং যথারীতি কালকের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উঠল। তিনি বললেন, "অর্জুন, তুমি কি ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং বলে মনে করছ? আমি ভাবছিলাম, আমেরিকায় অত বড় কাণ্ড করে এলে, ইংল্যাণ্ডেও যদি কিছু করো, তা হলে মন্দ হয় না।"

অর্জুন বলল, "আমি তো ব্যাপারটার কিছুই জানি না। যেহেতু

দোকানটা গতকাল দেখেছি, তাই আগ্রহ হচ্ছে।”

মেজর মাথা নাড়লেন, “না, না। আজ আমাদের ব্ল্যাকপুলে যেতে হবে।”

মিসেস গ্রাণ্ট বললেন, “তোমাকে না হয় আজই যেতে হবে, কিন্তু অর্জুন যদি দু'দিন বাদে যায়, তা হলে ক্ষতি কী?”

অর্জুন বলল, “কোনও ক্ষতি নেই। মেজরের চলে যাওয়াই ভাল।”

“ভাল কেন?” মেজর চোখ তুললেন।

“বলা যায় না, কী হতে কী হয়ে যায়!”

“কী? আমি কাওয়ার্ড? ডরপুক? কী ভাবো তুমি আমায়? জানো, আমি পিগমিদের তীর উপেক্ষা করে হেঁটে গেছি! আগামী বছর আমি ইয়েতি খুঁজতে হিমালয়ে যাব। বেশ, আমি থেকেই গেলাম। মার্শালকে ফোন করে দিচ্ছি।” মেজর কারও কোনও কথা না শুনে হনহন করে উঠে গেলেন টেলিফোনের দিকে।

মিসেস গ্রাণ্ট হাসলেন, “মেজর সত্যি মাঝে-মাঝে বাচ্চা ছেলে হয়ে যান। সত্যি বলো তো, অর্জুন, তুমি কি ইণ্টারেস্টেড? এই গার্ডটিকে আমি চিনতাম।”

“ইণ্টারেস্টেড। কিন্তু আপনি যদি সাহায্য করেন।”

“আমি? কীভাবে?”

“আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। আপনার ম্যাজিকের সাহায্য যদি পাই, তা হলে এগিয়ে যেতে পারি,” অর্জুন খুব আন্তরিকভাবে বলল।

“আমি জানি না ম্যাজিক তোমার কী কাজে লাগবে। ম্যাজিক মানে তো ভাঁওতা। এই এলাকার পুলিশের বড়কর্তা আমার খুব ফ্যান। এটুকু বলতে পারি, আমি গেলে তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন,” মিসেস গ্রাণ্ট বললেন।

ঘণ্টাখানেক পরে পুলিশের বড়কর্তার সামনে ওরা বসে ছিল। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, “মিসেস গ্রাণ্ট, ব্যাপারটা দুঃখজনক। দ্বিতীয় গার্ডটি আততায়ীদের দেখতে পায়নি, কারণ সে পেছনের দিকে ছিল। কিন্তু ব্যাপারটার সমাধান মনে হচ্ছে আমরাই করতে পারব। কোনও বড় রহস্য নেই এর পেছনে। তা ছাড়া এই ইয়াংম্যান বিদেশী। এদেশে এসব কাজ করতে লাইসেন্সের দরকার হয়।”

এখনও অর্জুনের ঝটপট ইংরেজি বলতে অস্বস্তি হয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল, “ওই লোকগুলোর কী চুরির উদ্দেশ্য ছিল বলে আপনাদের মনে হয়!”

পুলিশকর্তা কাঁধ নাচালেন। “একটা ডিপার্টমেণ্টাল শপে প্রচুর দামি জিনিস থাকে।”

হতাশ হয়ে ওরা বেরিয়ে এল। পুলিশ যদি অনুমতি না দেয়, তা হলে এদেশে অপরাধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া মুশকিল। মিসেস গ্রাণ্ট জিজ্ঞেস করলেন, "এবার কী করতে চাও?"

অর্জুন শেষ চেষ্টা করল, "আমরা একবার ওই দোকানে যেতে পারি?"

দূরত্বটা অনেকখানি। তবু মিসেস গ্রাণ্ট রাজি হলেন। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটল। মেজর বললেন, "মিসেস গ্রাণ্ট, ছেলেবেলায় শার্লক হোমস্ খুব পড়তাম। কিন্তু কিরীটী রায়ের মতো কাউকে লাগত না।"

"হু ইজ হি?" মিসেস গ্রাণ্ট জানতে চাইলেন।

"এ ফেমাস ডিটেকটিভ অব ক্যালকাটা।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "না। এখন সবচেয়ে ফেমাস ফেলুদা।"

"হু ইজ হি?" এবারের প্রশ্ন মেজরের।

অর্জুন বলল, "আপনাকে পড়তে দেব। শুরু করলে ছাড়তে পারবেন না।"

পেট্রল পাম্পটার সামনে গাড়ি রেখে ওরা দোকানে ঢুকল। একজন প্রহরী নিহত হয়েছে, কিন্তু সেই কারণে দোকান বন্ধ হয়নি। দু'জন পুলিশ দোকানের সামনে মোতায়েন হয়েছে, এইমাত্র। ওরা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিসেস গ্রাণ্টকে চিনতে পারলেন। অর্জুন আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, মিসেস গ্রাণ্ট সেইমতো প্রশ্ন করলেন, "গতকাল আমার এই বন্ধু আপনার দোকান থেকে একটি অভিযানে যাওয়ার মতো জুতো কিনেছেন। কিন্তু আমার এই তরুণ বন্ধুটিরও ইচ্ছে হয়েছে ওইরকম জুতো কিনতে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সেণ্টারে গতকাল একটিমাত্র ছিল। আপনি কি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?"

ম্যানেজার বললেন, "অভিযানে যাওয়ার মতো চমৎকার নতুন জুতো আমাদের আছে। তার একটা পছন্দ করলেই তো হয়।"

মিসেস গ্রাণ্ট বললেন, "আমরা ওই একই ধরনের জুতো চাইছি!"

ম্যানেজার হাসলেন, "সাধারণত এই জুতোগুলো কারও অল্প ব্যবহার করা। যাঁর জুতো ছিল, তাঁর কাছে যদি আরও থাকে তবে তা তো এঁর কোনও কাজে লাগছে না। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দু'জনের পায়ের মাপ এক নয়।"

অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করল, "ওই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জুতো কোথায় পান আপনি?"

ম্যানেজার বললেন, "আমাদের সাপ্লাই দেয় এ. কে. জন অ্যাণ্ড কোম্পানি।"

"ওদের অফিসটা কোথায়?" অর্জুন প্রায় হতাশ হয়ে গিয়েছিল।"

"ব্ল্যাকপুলে।"

ওরা তিনজনে যখন গাড়িতে উঠল তখন অর্জুন বলল, "মিসেস গ্রান্ট, এখন রওনা হলে কি আমরা আজই ব্ল্যাকপুলে পৌঁছতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই। হঠাৎ···ও, ওই সাপ্লায়ারদের দোকানে যেতে চাইছ ? কিন্তু এই গার্ডটির খুন হওয়ার সঙ্গে মেজরের কেনা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জুতোর কী সম্পর্ক ?"

"আমার ক্রমশ মনে হচ্ছে, ওরা ওই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জুতোর খোঁজেই এসেছিল। গার্ডটি দেখে ফেলায় খুন করতে বাধ্য হয়। কারণ আমরা জুতোজোড়া কেনার পর দুটো লোককে ওটার সন্ধানে দোকানে ঢুকতে দেখেছিলাম," অর্জুন বলল।

মিসেস গ্রান্ট মাথা নাড়লেন, "কিন্তু চার্লি বলছে, ওটা ভুতুড়ে জুতো।"

মেজর হোহো করে হাসলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আপনার ?"

খুব চাপা গলায় মেজর বললেন, "কেউ আমাদের ফলো করছে। পেছনের ওই গাড়িটাকে লক্ষ করো। কিছুতেই ওভারটেক করছে না।"

অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটাকে দেখল। চওড়া হাইওয়েতে অজস্র গাড়ি ছুটছে। মিসেস গ্রান্ট যে ট্র্যাকে চালাচ্ছেন, তাতে গতি বেশি নেওয়ার কথা নয়। পেছনের গাড়িতে যিনি চালকের আসনে, তাঁকে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মেজর উত্তেজিত হয়ে বললেন, "মিসেস গ্রান্ট, আপনি ট্র্যাকটা চেঞ্জ করুন তো। স্পিড বাড়ান।"

মিসেস গ্রান্ট অনুরোধ রাখলে দেখা গেল গাড়িটা ধীরে-ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত আরও অনেক গাড়ির ভিড়ে সেটা হারিয়ে গেলে মেজর রুমালে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, "কী করে গোয়েন্দারা বুঝতে পারে কে অনুসরণকারী, কে নয়, তা কে জানে !"

মিসেস গ্রান্টকে খুব ভাল লেগে গেছে অর্জুনের। এককালে পেশাদার জাদুকরী ছিলেন। এখনও দেখান। তবে ইচ্ছে হলে। বারবার অর্জুনের কাছে পি. সি. সরকারের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। অর্জুনের খুব লজ্জা করছিল। পি. সি. সরকারের ম্যাজিক সে দ্যাখেনি। আসলে জলপাইগুড়িতে তো কেউ সচরাচর বড় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে না।

মিসেস গ্রান্ট ওদের নিয়ে ব্ল্যাকপুলে যাচ্ছিলেন। ওরা ডিপার্টমেণ্টাল শপ থেকে ওঁর বাড়িতে ফেরার পর লাঞ্চ শেষ করে যখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন অর্জুনের মনে হল, চার্লি যে জুতোটা নিয়ে গেছে, সেটা ফেরত পাওয়া দরকার। চার্লিকে কথাটা বলতেই চার্লি চোখ বড় করল, "নো, নো মিস্টার। জুতোতে ভূত আছে। ওটা আর ফেরত চাইবেন না।

আমি বাড়ির বাইরে গারবেজ-ব্যাগে ফেলে দিয়েছি।"

অর্জুন আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির বাইরে এল। গেটের পাশেই পলিথিনের ব্যাগ রয়েছে। সেখানে আবর্জনা জমিয়ে রাখলে প্রতিদিন গাড়ি এসে নিয়ে যায়। আমেরিকাতেও সে এই দৃশ্য দেখেছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে ব্যাগটার মুখ খুলতেই জুতোজোড়া দেখতে পেল। ভাগ্যিস ! ছোঁ মেরে ও-দুটোকে তুলে নিতেই সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে একজন পুলিশ মাটিতে নেমে চিৎকার করল, "হোয়াট'স দ্যাট ?"

অর্জুন এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, প্রথমে কথা বলতে পারেনি। পুলিশটি কাছে এসে জুতোটা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী আশ্চর্য ! এ দুটো তুমি নিচ্ছ কেন ?"

অর্জুন কোনওমতে বলল, "ভুল করে চলে এসেছিল এখানে।"

লোকটা হোহো করে হেসে গাড়িতে বসা সঙ্গীকে বলল, "শুনেছ হে, জুতো একা-একা চলে আসে। থাকো কোথায় তুমি ?"

অর্জুন মিসেস গ্রাণ্টের বাড়িটা দেখাল। পুলিশটা জুতো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল, "অলমোস্ট নিউ, বাট ইউজড্। হে জন, আই লাইক দিস।"

অর্জুন চটপট বলল, "কিন্তু আপনি জুতোটা নিতে পারেন না। যার জুতো, তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। মানে, তাকে জিজ্ঞেস না করে..."

পুলিশটি বলল, "লুক ! আমার কাছে মিথ্যে কথা বলার একদম চেষ্টা করবে না। এত ভাল পাহাড়ে ওঠার জুতো কেউ ভুল করে গারবেজ-ব্যাগে পাঠায় না।"

অর্জুন বলল, "ওটা শুধু পাহাড়ে ওঠার জুতো নয়। যে-কোনও অভিযানেই পরা চলে।"

"সেটা আমি বুঝব। কিন্তু আমি যদি বলি এটাকে তুমি চুরি করছ ?"

অতএব অর্জুন ওকে নিয়ে ভেতরে এল। মিসেস গ্রাণ্ট সব শুনে কেমন নিস্পৃহ গলায় বললেন, "না না, ওঁর যখন এই লেডিস শ্যু পছন্দ হয়েছে, তখন ওকে দিয়ে দেওয়াই উচিত।"

পুলিশটি হকচকিয়ে বলল, "লেডিস শ্যু ?"

"ওমা, তা হলে আপনি ভাল করে দ্যাখেননি," মিসেস গ্রাণ্ট হাসলেন।

অর্জুন দেখল, অফিসারের চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। বিড়বিড় করে লোকটি বলল, "হোয়াট এ ফুল আই অ্যাম ! মেয়েদের জুতো নিতে যাচ্ছি ! আমি তো বিয়েই করিনি। সরি ! কিন্তু তখন যে দেখলাম...। যাক, মিসেস গ্রাণ্ট, এই ইয়াংম্যানটিকে দেখছি আপনি চেনেন ! বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত ?"

অফিসার চলে যাওয়ামাত্র মেজর বললেন, "লোকটা পাগল নাকি হে

অর্জুন ?”

অর্জুন হাসল, “মিসেস গ্রাণ্ট, আপনার ম্যাজিক শুধু ও দেখল কী করে ?”

কথাটার জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, “এবার বলো তো, জুতোটার বিশেষত্ব কী ?”

অর্জুন তখন গোপন কুঠুরিটা খুলে দেখাল। সেটা দেখামাত্র মিসেস গ্রাণ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি এখন হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন আর মেজর এবার পেছনের আসনে শরীর এলিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। মিসেস গ্রাণ্টের পাশের আসনে বসে অর্জুন মুগ্ধ চোখে দু'পাশে ছুটে যাওয়া ইংল্যাণ্ডের গ্রাম দেখছিল। এত সবুজ যে, চোখ জুড়িয়ে যায়। হঠাৎ মিসেস গ্রাণ্ট বললেন, “ব্ল্যাকপুলের সাপ্লায়ার কি তোমাকে জুতোর মালিকের সন্ধান দিতে পারবে ?”

অর্জুন বলল, “জানি না। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী !”

“তোমরা ওখানে কোথায় থাকবে ?”

“মেজর জানেন।”

“আমি আমার এক বান্ধবীর কাছে উঠব। ওর খুব ইচ্ছে আমি কিছুদিন ব্ল্যাকপুলে থাকি। ঘুমোলে তো মেজব বেশ নাক ডাকান। নাক কেন ডাকে অর্জুন ?”

অর্জুন বলল, “ঠিক জানি না। তবে নিশ্বাসের স্বাভাবিক পথে যদি কিছু বাধা তৈরি হয়, তা হলে ওইরকম শব্দ হয়ে থাকে।”

মিসেস গ্রাণ্ট বললেন, “কেউ যদি নাক ডাকা সারানোর ওষুধ বের করত তা হলে কোটি-কোটি পাউণ্ডের মালিক হয়ে যেত। আমরা এসে গেছি। বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ পাচ্ছ ?”

অর্জুন অবাক হল। কাছে-দূরে কোথাও বালিয়াড়ি নেই। সমুদ্র অত কাছে হবে কী করে ? দু'পাশে ছোট-ছোট সুন্দর কটেজ, ঝকঝকে রাস্তা, যদিও ফুটপাতে মানুষজন নেই বললেই চলে, এরকম এলাকা পার হতেই অর্জুন সমুদ্র দেখতে পেল। কী রকম সমুদ্র ! ঢেউ নেই, গর্জন নেই। শুধু আদিগন্ত প্রায়-সবুজ জল স্থির হয়ে আছে।

গাড়িটা বাঁক নিতেই সে মুগ্ধ হল। সুন্দর বাঁধানো সমুদ্রসৈকতে বিশাল রাস্তাটা ঘোড়ার নালের মতো ঘুরে গেছে। রাস্তার একধারে সারি-সারি সুন্দর দোকান। দোকানগুলো অভিনব। রাস্তার মাঝখানে ট্রাম-লাইন, একটি ট্রাম চলে যাচ্ছে ওপাশে। রাস্তার এদিকে সমুদ্রের গায়ে নানান রকমের রেস্টুরেন্ট। রংবেরঙের সাইনবোর্ডে লোভনীয় খাবারের বিজ্ঞাপন।

অর্জুন বলল, “দারুণ জায়গা তো !”

মেজর মাথা নাড়লেন, “পকেটে টাকা থাকলে এখানে সময় কাটানো

কোনও সমস্যা নয়।”

“টাকা থাকলে কেন?”

“ওই যে দোকানগুলো দেখছ, ওগুলো সব এক-একটা গ্যামব্লিং হাউস। ক্যাসিনো নয়, কিন্তু ঢুকলে লোভ সামলানো যায় না। আমরা আর-একটু এগিয়ে বাঁ দিকে নামব, মিসেস গ্রান্ট।” মেজর তাঁর বিশাল দেহটা নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।

অর্জুন দেখছিল পুরো সমুদ্রের ধারে মেলা বসে গেছে। রংবেরঙের পোশাকে প্রচুর মানুষ এসেছে রোদ পোয়াতে ব্ল্যাকপুলে।

বাঁ দিকের হোটেলটার নাম অ্যাবসন। ওরা গাড়ি থেকে নেমে এলে মিসেস গ্রাণ্ট বললেন, “তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি বান্ধবীব ওখানে পৌঁছে ফোন করব।”

জিনিসপত্র নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার মুখেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। একটা বেঁটেমতো সাহেব তরতর করে নামছিল আর মেজর মাথা নিচু করে উঠছিলেন। ধাক্কাটা একটু বেশিরকমের হওয়ায় লোকটা ছিটকে পড়ল একপাশে আর মেজরের হাত থেকে সুটকেসটা গেল উড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। একনাগাড়ে গালাগাল দিতে দিতে তেড়ে গেলেন লোকটার দিকে। অর্জুন দেখল, লোকটা কিছু বলল না। চুপচাপ উঠে বসে জামাকাপড়ের ময়লা দু'হাতে ঝেড়ে নীচে নেমে রাস্তায মিলিযে গেল। অর্জুন খুব অবাক হল। অন্যায় যদি কারও হয়ে থাকে তবে তা মেজরের। অথচ লোকটা একটাও কথা বলল না কেন? মেজরকে দু-একটা কথাও শোনাল না। সে চটপট বলল, “মেজর, আপনার পকেট ঠিক আছে কি না দেখুন তো!”

“অ্যাঁ? পকেট? পকেট তো পকেটেই আছে।” মেজর ঘাবড়ে গেলেন।

“পকেটে ব্যাগ আছে তো?”

মেজরের এবার চেতনা ফিরল। কিন্তু না, তাঁর সব কিছু ঠিকই আছে। লোকটা মোটেই পকেটমার নয়। হলে অবশ্য অর্জুনের খারাপ লাগলেও একটা লাভ হত। বিলিতি পকেটমার দেখা যেত।

হোটেলের রিসেপশনে খবর পাওয়া গেল, মিস্টার মার্শাল আজই বিশেষ জরুরি তাগিদে সমুদ্রের নীচে নেমেছেন। মেজরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন যে, সন্ধের মধ্যেই এখানে ফিরে এসে মুখোমুখি হবেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “মার্শাল কি এখানেই থাকে?”

রিসেপশনিস্ট বলল, “না। ওঁর নিজস্ব একটা ক্যাম্প আছে শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে। আপনারা আসবেন বলে তিনি এখানে তিনটে ঘর বুক করেছেন।”

মেজর অর্জুনের দিকে ঘুরে বললেন, "করাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করছেন। আমি হোটেলে বসে পা নাচাব, আর তিনি ক্যাম্পে বসে মজা লুটবেন!"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ক্যাম্পে বুঝি খুব মজা?"

মেজরের দাড়িগোঁফ ছাপিয়ে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠল, "এই হোটেলজীবনের চেয়ে হাজার গুণ। সেবার আল্পসে ক্যাম্প খাটিয়েছি। বাইরের টেম্পারেচার মাইনাসে। হুহু করে হাওয়া বইছে। হাওয়া তো নয়, বরফের করাত। স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে পিটপিট করে মাথার ওপরে টেন্টটার দিকে তাকিয়ে সারারাত ভেবেছি, ওটা যেন উড়ে না যায়। সে যে কী আনন্দ, তা যে না থেকেছে, সে বুঝবে না। আফ্রিকায় টেন্ট করে আছি, একটা সিংহের বাচ্চা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আমার বিছানায় ঢুকে পড়ল।" বলতে বলতে সেই দৃশ্যটি কল্পনা করে মেজর হাসিতে ভেঙে পড়লেন। দ্বিতীয়টি অবশ্যই রোমাঞ্চকর, কিন্তু প্রথমটিতে মজা বা আনন্দ কোথায় তা অর্জুনের মাথায় ঢুকল না। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল লিফটের সামনে। দু'জনের পকেটে দুটো ঘরের চাবি। মেজরের হাসির মধ্যেই লিফটটা থামল। কয়েকজন মানুষ গম্ভীর মুখে মেজবের দিকে তাকিয়ে লিফট থেকে বেরিয়ে গেলেন। হঠাৎই মেজবকে আরও ভাল লেগে গেল অর্জুনের। বিদেশে এসে তাঁর মধ্যে কোনও আড়ষ্টতা নেই। সব পরিবেশে যে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারে, তার তো তুলনা নেই।

ইতিমধ্যে বড় হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে অর্জুনের। নিজেব ঘরে ঢুকে তার মনে হল, এটি সে-তুলনায় কিছুই নয়। মোটামুটি ছিমছাম ঘরটা দেখে তার ভাল লাগল, কারণ এটা ঠিক রাস্তার ধারে। মেজর নিজের ঘবে চলে গিয়েছেন। অর্জুন জানলা খুলে তাকাল। রাস্তার ওপাশেই সমুদ্র। সেখানে যতটুকু কাঁপন, তা শুধু বয়ে যাওয়া বাতাসের জন্যেই। সমুদ্র এত শান্ত হয়? সে রাস্তাটা দেখল। ভিড় বাড়ছে। ইংল্যাণ্ডে নিগ্রোদের ক্রীতদাস করে নিয়ে আসা হয়েছিল কি না তা সে জানে না, তবে প্রচুর নিগ্রো চোখে পড়ছে। অবশ্য আমেরিকার মতো মোটেই নয়। এদের দেখলে বোঝাই যায়, ইংল্যাণ্ডে এরা ভিনদেশী। মিসেস গ্রান্টকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য জানা যায়। ওঁর বাড়িতে চার্লিই রয়েছে। হঠাৎ একটি পঞ্জাবি পরিবাবকে দেখতে পেয়ে অর্জুনের বেশ মজা লাগল। সত্যি বলতে কী, এখানে যদি কেউ হিসেব করতে বসে তা হলে অন্তত চল্লিশ ভাগ অ-ইংরেজ দেখতে পাবে।

এই ছোট্ট দেশের মানুষরা দুশো বছর ভারতবর্ষকে শাসন করেছিল! এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে, বাঘা যতীন প্রাণ হারিয়েছেন, সূর্য সেন নিজেকে বলি দিয়েছেন, নেতাজি আত্মোৎসর্গ করেছেন। মাত্র চল্লিশ বছর আগে একজন সৎ ভারতীয় শাসক ব্রিটিশদের

বন্ধু বলে মনে করত না। ছেলেবেলায় সে যখন স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ত, তখন মনে হত, ব্রিটিশরা থাকলে সে-ও আন্দোলনে যোগ দিত। আজ সেই মানুষদের দেশে দাঁড়িয়ে কিন্তু সেরকম অনুভূতিটা আসছেই না। এদের দেখে মোটেই রাগ হচ্ছে না। হঠাৎ তার মনে হল, দোষটা আমাদেরই। আমরাই বিভক্ত হয়ে ওদের সুযোগ দিয়েছিলাম আমাদের শোষণ করতে। তা ছাড়া চল্লিশ বছর আগের মানুষদের মানসিকতার সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের কোনও সাদৃশ্য থাকবে এমন তো নাও হতে পারে। এই যেমন, ওর নিজেরই রাগটা নেই। দরজায় শব্দ হতে সে বাস্তবে ফিরে এল।

মেজর দাঁড়িয়ে আছেন। এখন ওঁর পরনে পুরোদস্তুর অভিযাত্রীর পোশাক। কোমরে হাত রেখে মেজর বললেন, "সে কী! তুমি এখনও এই অবস্থায় আছ? বের হবে না? আরে, নতুন জায়গায় এলে সেই জায়গাটা উলটেপালটে দেখতে হয়।"

"আমি তো রেডি।"

"অ। লেট'স গো ফর এ রাউণ্ড। মিসেস গ্রান্ট ফোন করেছিলেন। উনি আসতে চেয়েছিলেন। আমি নিষেধ করেছি। বলেছি, এবেলা বিশ্রাম নিন।" কথা বলতে বলতে মেজর নিজের পায়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন। "জুতো দারুণ ফিট করেছে হে। সত্যি ভুতুড়ে নয় তো?"

অর্জুন দেখল, মেজর সেই জুতো পরেছেন। ওর খুব মজা লাগছিল। তারপরেই মাথায় একটা বুদ্ধি এল। দরজা বন্ধ করে নীচে নামতে নামতে সে বলল, "মেজর, গল্পের বইতে পড়েছি ইংল্যাণ্ডের পাব খুব বিখ্যাত। আমাকে নিয়ে যাবেন?"

"মদ খাবে নাকি হে? কত বয়স হল তোমার?"

"একুশ হয়নি। মদ খাব না, শুধু দেখব।"

"তা হলে সেলর্স পাবে চলো। রিয়েল টাফ পিপ্‌লের ভিড় ওখানে। হাঁটতে হাঁটতে ডান পা'টা মাঝে-মাঝে হালকা হয়ে যাচ্ছে কেন হে?" মেজর দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অর্জুন বলল, "ওটা আপনার মনের ভুল। প্রথমবার পরছেন তো!"

ব্ল্যাকপুলে ঠাণ্ডা আছে চমৎকার। হাওয়া বইছে হুহু করে। যদিও এখন মিঠে রোদের মশারি টাঙানো চারদিকে। পাশাপাশি ওরা ফুটপাত ধরে হাঁটছেন। সামনেই যে বিশাল হলঘর, সেখানে মানুষজন ঢুকছে, বের হচ্ছে। মেজরকে বলতেই তিনি সেদিকে পা বাড়ালেন। ওটা যে গ্যামব্লিং হাউস, তা ভেতরে ঢুকে চিনতে পারল সে। ঢুকতেই বাঁ দিকে কয়েকটা কাউণ্টার নজরে এল। সেখানে বোর্ড ঝুলছে, 'চেঞ্জ'। অর্থাৎ তুমি তোমার পকেটের নোট খুচরো করে নিতে পারো। এরপর দশ ফুট অন্তর অন্তর বিভিন্ন রকমের খেলা রয়েছে। পয়সা গর্তে ফেলে হাতল ধরে টানলে

একটা রঙিন বাক্সের চাকা ঘুরবে বনবন করে। সেই চাকার গায়ে নম্বর আঁটা। চাকাটা আবার তিনটে ভাগে ঘুরছে। ওটা যখন থামবে তখন তার তিনটে ভাগে একই নম্বর এসে পাশাপাশি স্থির হলে দ্বিতীয় গর্ত থেকে পাউণ্ড পড়বে। অর্জুন দেখল একটি বাচ্চা ছেলে একের পর এক পয়সা ফেলে হাতল ঘুরিয়েই যাচ্ছে, বেচারার ভাগ্যে আর পাউণ্ড ঝরছে না। পরের টেবিলটা আরও মজার। একটা কাচের বিরাট বাক্সের ভেতরে দুটো তাক। ওপরের এবং নীচেরটায় ঠাসা হয়ে আছে পাউণ্ডের কয়েন। দুটো তাককে কোনও মেশিন ডান দিক বাঁ দিকে ঘোবাচ্ছে সামান্য। একদম নীচে একটা ট্রে রয়েছে বাক্সের বাইরে আটকানো। খেলোয়াড়কে একদম ওপরেব একটা গর্তে পাউণ্ডের কয়েন ফেলতে হবে। সেটা গড়িয়ে প্রথম তাকে পড়ামাত্র তার চাপে উপচে পড়া জমে থাকা কয়েনগুলোয় যে আন্দোলন হবে, তাতে বেশ কিছু পড়বে নীচের তাকে। সেই চাপে দ্বিতীয়
আন্দোলন হবে, তাতে বেশ কিছু পড়বে নীচের তাকে। সেই চাপে দ্বিতীয়
তাকের উপচে পড়া এবং প্রায় ঝুলে থাকা কয়েনগুলো নাড়া খেয়ে নীচে পড়লেই তা ট্রে'তে জমা হবে। যে খেলছে, সে সেগুলো তুলে নিতে পারে। অর্জুন দেখল, একজন একটা কয়েন ওপরের তাকে ফেলল গর্ত দিয়ে। সেটা ওপরের তাকের কয়েনটাকে নিয়ে নীচের তাকে পড়ল। নীচের তাকে তখন কয়েনের পাহাড়। মনে হচ্ছিল ছোঁয়া লাগলেই তার চুড়োটা হুড়মুড়িয়ে ট্রে'তে চলে আসবে। কিন্তু বাঁ দিক ডান দিকে সমানে ঘুরে চলা তাক দুটোয় এমন কিছু কায়দা আছে যে, ওগুলোই মিশে গেল জমে থাকা কয়েনে। লোকটার ভাগ্যে কিছুই এল না।

অর্জুন খেলাটা দেখতে দেখতে বলল, "কেউ যদি না পায় তো খেলে কেন?"

মেজর মাথা নাড়লেন, "কেউ কেউ নিশ্চয়ই পায়, নইলে এটা চলছে কী করে। ওদের একটা হিসেব আছে। হয়তো একশোজন এক পাউণ্ড খেলার পর মেশিনটা একজনকে দশ পাউণ্ড ফেলে দেবে। খেলবে নাকি?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। জুয়ো খেলা ঠিক নয়।"

মেজর হকচকিয়ে গেলেন, "যাচ্চলে! আরে আমরা তো জুয়াড়ি নই, একদিন মজা করার জন্যে খেলছি। কয়েনটা ধরো। ওই গর্তে মন দিয়ে ফ্যালো।"

অর্জুন পাউণ্ডটাকে দেখল। টাকার চেয়ে অনেক ভারী এবং দেখতে বেশ সুন্দর। এক পাউণ্ড মানে উনিশ টাকার মতো। এটাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না। তবু মেজরের আগ্রহে সে গর্তে ফেলল। ওপরের তাকে পড়ে ওটা গড়িয়ে এল সামনে। এসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল অন্য কয়েনের ওপরে। সেই ধাক্কায় ওপরের তিনটে কয়েন নীচের তাকে এসে পড়ল। তাকটা তখন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরে এসেছে।

আর তখনই একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ঝমঝম শব্দে চারদিক চমকিত হল। আশপাশের সমস্ত লোক নিজেদের খেলা ছেড়ে এদিকে চলে এলেন। অর্জুন দেখল, ভূমিকম্পে ধসে যাওয়া বাড়ির মতো দ্বিতীয় তাকের কয়েনের চুড়োটা তিনটে কয়েনের আঘাতে নেমে আসছে নীচের ট্রে'তে। আর তার শব্দে কানে যেন তালা লাগছে। পড়া শেষ হলে দেখা গেল, কিছু কয়েন পড়তে-পড়তেও আটকে রয়েছে ট্রে'র প্রান্তে। মেজর মাথা নাড়লেন, "একেই বলে ইনটুইশান। তোমাকে দিয়ে খেলালে পাওয়া যাবেই, মন বলছিল। নাও, তুলে নাও।"

অর্জুন দু'হাতের আঁজলায় পাউণ্ডগুলো তুলে নিয়ে মেজরের দিকে এগিয়ে ধরল। আশেপাশের দৃশ্যটি-দেখতে-আসা মানুষেরা আজ নানান মন্তব্য করছে ওদের ভাগ্য নিয়ে। মেজর আঁজলা থেকে একটি পাউণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, "ওগুলো পকেটে ঢোকাও। তোমার সম্পত্তি।"

"সে কী ? না না, আপনি তো খেলতে বললেন," অর্জুন প্রতিবাদ করল।

"তা হোক। খেলেছ তুমি।" মেজর হনহন করে এগিয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে ওগুলোকে পকেটে ঢোকাল অর্জুন। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে সামান্য। বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখল, মেজর নিচু হয়ে বসে জুতোর ফিতে বাঁধছেন। "এটা বারেবারে আলগা হয়ে যাবে নাকি হে ! চলো, তোমার জেতা পয়সায় পাবে গিয়ে বসি।"

অনেকটা হাঁটার পর ওরা একটা বাড়ির সামনে এল, যার ওপরে লেখা—সেলর্স পাব। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। পাব নিয়ে বেশ কয়েকটা গল্প পড়েছে সে। কবি, সাহিত্যিকরা পাবে বসে জমিয়ে আড্ডা মারেন। মেজরের পেছনে-পেছনে সে ভেতরে ঢুকে দেখল একটা বিশাল কাউন্টারের ওপাশে নানান ধরনের বোতলে মদ সাজানো। কাউন্টারে দু'জন মহিলা কাজ করছেন। কাউন্টারের ওপরে তিনটে মেশিন। তাতে চাপ দিতে মাপমতো মদ গেলাসে পড়ছে। কাউন্টারের এপাশে লম্বা-লম্বা টুলে তিনজন লোক বসে মদ খেতে খেতে গল্প করছে। এপাশের হলঘরে টেবিল-চেয়ার রয়েছে। আর দেওয়াল জুড়ে এবং ছাদে টাঙানো রয়েছে প্রাচীন যুগের জলদস্যুদের ব্যবহৃত নানা অস্ত্র, পোশাক।

অর্জুনের শরীর গুলিয়ে উঠল মদের গন্ধে। মেজর একটা টুলে বসে বিয়ার চাইলেন। চেয়ে অর্জুনের দিকে তাকাতে সে বলল, "কিছু খাব না।"

"কমলালেবুর রস খাও। খাঁটি জিনিস।"

জিনিসটা সত্যি খুব ভাল। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে অর্জুন খুব হতাশ হল। যদিও কেউ মাতলামি করছে না, তবু সেই জমাটি আড্ডার কোনও চেহারাই দেখা যাচ্ছে না। মেজর যেভাবে বিয়ার খাচ্ছেন, তাতে মাতাল

না হয়ে যান ! হঠাৎ মেজর বললেন, "এইসব দেখে আমার একটা পুরনো গানের কথা মনে পড়েছে। জাহাজ লুঠ করে নেওয়ার পর জলদস্যুদের একজন গানটা গেয়েছিল। গাইব ?"

মেজর গান জানেন, তা অর্জুন জানত না। আগ্রহী হয়ে সে বলল, "কেউ যদি আপত্তি করে ?"

মেজর উঠে দাঁড়ালেন বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে, "লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমি যদি একটি জলদস্যুর গান গাই, তা হলে আপনারা আপত্তি করতে পারেন বলে আমার এই তরুণ বন্ধুটি জানাচ্ছে। কথাটা কি সত্যি ?"

সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত চিৎকার উঠল, "না না। জলদস্যুর গান ? ফ্যান্টাস্টিক। শুরু করুন।"

এবার মেজর শরীর দুলিয়ে গাইতে লাগলেন। সে-গানের একটি শব্দও বুঝতে পারছিল না অর্জুন। বাংলা বা ইংরেজির ধারে-কাছে নয়। তবে কি মেজর মাতাল হয়ে গেলেন এর মধ্যে ? মাতালদের সামলানো নাকি খুব শক্ত ব্যাপার। সে দু-একবার চাপা গলায় মেজরকে সতর্ক করে দিতে গিয়েও ব্যর্থ হল।

গান শেষ করে ঝুঁকে-ঝুঁকে অভিনন্দন গ্রহণ করে মেজর বললেন, "আর একটা গ্লাস।"

অর্জুন বলল, "না মেজর, আর নয় !"

মেজর হোহো করে হাসলেন, "অ্যাঁ ! ভয় পাচ্ছ ? বিয়ারে আমার নেশা হয়ে যাবে ? আরে আমি হলাম অভিযাত্রী। তা হলে তোমাকে একটা গল্প বলি শোনো। একবার সাহারার মাঝখানে আমাদের কী দুর্দশা !, যেদিকে তাকাই, দুটো করে জিনিস দেখি। দলের সবাই মরীচিকা দেখতে লাগল। আমি পেটপুরে বিয়ার খেলাম। ব্যস। নেশার চোটে সব একটা হয়ে গেল। দৃষ্টি পরিষ্কার। কী করে হল বলো তো ? মাতাল হলে যা স্বাভাবিক, তা-ই অস্বাভাবিক লাগে। খালি চোখে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, গরমে মরীচিকা দেখছি, যেটা ধরো স্বাভাবিক অবস্থা, লাল চোখে তার উলটোটা দেখলাম।" হেহে করে হেসে উঠলেন মেজর। এই সময় একটি লোক এগিয়ে এল, "চমৎকার গাইলেন দাদা। এটা কোন্ ভাষার গান ?"

মেজর বললেন, "আগেকার দিনের জলদস্যুরা আসত পোর্তুগাল থেকে। ওদের গান।"

লোকটার চোখ, অর্জুন লক্ষ করল, মেজরের জুতোর দিকে, "আপনি অভিযাত্রী ?"

"ইয়েস," মাথা নাড়লেন মেজর।

"পাকিস্তানি ?"

"নো। ইণ্ডিয়ান-আমেরিকান।"

লোকটা হাসল। তারপর পাব থেকে বেরিয়ে গেল।

একঘণ্টা পরে ওরা যখন বাইরে এল তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় আর জনতা নেই। বাইরে আসামাত্র অর্জুন লক্ষ করল, উলটো দিকে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একটা লোক দাঁড়িয়ে। এই লোকটাই গায়ে পড়ে মেজরের সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিল। মেজর মাতাল হননি, কিন্তু মেজাজ ভাল হয়েছে। হোটেলে ফিরছিল ওরা। মেজর গুনগুন করে গাইছিলেন। অর্জুনের খুব ভাল লাগল। মেজরকে, মদ খাওয়া সত্ত্বেও, আরও ভালবেসে ফেলল সে। হোটেল অ্যাবসনে ঢোকার মুখে সে অবাক হল ঘাড় ঘুরিয়ে। লোকটি তাদের পেছন পেছন ওই অবধি এসে চোখাচোখি হতেই উলটো দিকে চলে গেল।

রিসেপশনে একজন রোগা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্র মেজর দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন, "মানুষ যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক হয়, তোমাকে না দেখলে আমি জানতাম না।" তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন এমন প্রবলভাবে যে, মানুষটির অবস্থা সঙ্গিন হল। মান-অভিমানের পালা চুকে যাওয়ার পর মেজর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিই হলেন মেজরের বন্ধু মার্শাল। ব্ল্যাকপুলের সমুদ্রে মুক্তো নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। মার্শাল বললেন, "মেজর, আমি একটু ঝামেলায় রয়েছি। তোমার সঙ্গে আড্ডা মারব তার উপায় নেই। তুমি আজকে বিশ্রাম নাও, কাল সোজা চলে এসো আমার ক্যাম্পে। ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ো।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "সমস্যাটা কী?"

"এদিকের সমুদ্রে বছর পাঁচেকের মধ্যে কোনও হাঙর আসেনি। কিন্তু দু'দিন হল একটা বিশাল হাঙরকে মাঝে-মাঝেই দেখা যাচ্ছে। আমার ডুবুরিরা এখন জলে নামতেই সাহস পাচ্ছে না। এরকম চললে তো কাজ বন্ধ রাখতে হবে," মার্শাল বললেন।

মেজর বললেন, "ওটাকে আমার ওপরে ছেড়ে দাও। তুমি জানো, আমি ফ্লোরিডাতে তিনটে হাঙর মেরেছি। এটা কোনও সমস্যাই নয়।"

মার্শাল বললেন, "সমস্যা। কারণ আমি কখনও শুনিনি, হাঙর মাটি ঘেঁষে এগিয়ে আসে। মারার চেষ্টা করেও তাই পারছি না। আর হাঙরটা আসার পর থেকেই প্রচুর মুক্তো চুরি যাচ্ছে। ঝিনুকগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ঠিক হল মার্শাল কাল সকালে গাড়ি পাঠিয়ে ওদের নিয়ে যাবেন।

ডিনার খাওয়া হবে হোটেলের রেস্টুরেন্টে। তার আগে মেজর একটু ঘুমিয়ে নিতে গেলেন। অর্জুন রিসেপশনের এক কোনায় একটি পত্রিকা নিয়ে বসে ছিল। এখন যদিও সন্ধে, তবু আটটা বেজে গেছে ঘড়িতে। কারণ, সূর্য ডোবে দেরিতে। ঘরের ভেতর বেশ আরাম। কিন্তু অর্জুনের

খুব ইচ্ছে করছিল সুন্দর শহরটায় ঘুরে বেড়াতে। মেজরের জুতো, মধ্যপথে ডিপার্টমেন্টাল শপের খুন, সব ওর মাথা থেকে সরে গিয়েছিল। শুধু সেই অনুসরণকারী লোকটা ছাড়া অস্বস্তির কিছু ঘটেনি। সে হাঙরের কথা ভাবল। হাঙররা কী ধরনের আচরণ করে, তা তার জানা নেই। শুধু জানে, একটা মাঝারি সাইজের নৌকো ডুবিয়ে দেওয়ার শক্তি ওরা রাখে।

এই সময় দরজা খুলে দুটো লোক ঢুকল। একজনকে একটু আগেই অর্জুন অনুসরণ করতে দেখেছে। সঙ্গের লোকটিকে দেখে অর্জুনের বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে উঠল। ওই লোকটাকেই সে ডিপার্টমেন্টাল শপে সঙ্গীকে হুকুম করতে দেখেছিল না ? অর্জুন নিঃসন্দেহ হল। ওরা এখানে কেন ? দূরত্ব তো কম নয়। সে আরও ঢুকে গেল সোফার ভেতরে। পত্রিকার আড়ালে নিজেকে রেখে যতটা সম্ভব কান খাড়া রাখল।

লোক দুটো রিসেপশনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, "নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছি বলে মনে করলে উপকৃত হবে। একটা লম্বাচওড়া লোক, দাড়িওয়ালা, যে নিজেকে অভিযাত্রী বলে দাবি করে, ইণ্ডিয়ান, সে কোথা থেকে আসছে ?"

রিসেপশনিস্ট খাতা দেখে বলল, "বোল্টন।"

লোক দুটো পরস্পরের সঙ্গে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করল। তারপর প্রথমজন গলা নামাল, "কত নম্বর ?"

রিসেপশনিস্ট বলল, "লুক, আমরা হোটেলের মধ্যে কোনও ঝামেলা চাই না।"

"জ্ঞান দেওয়া আমরা মোটেই পছন্দ করি না", বলে লোক দুটো লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। লিফট নামছে না দেখে ওরা এবার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

অর্জুন লাফিয়ে উঠল। রিসেপশনিস্ট ওর দিকে তাকাতেই সে বলল, "মেজরকে ফোনে সাবধান করে দাও।" তারপর দৌড়ে গেল সিঁড়ির দিকে। এই সময় লিফটটা নেমে আসতেই সে চটপট ঢুকে পড়ল। শোঁশোঁ করে লিফট উঠছে ওপরে। ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওঠার আগেই কি ও পৌঁছতে পারবে ? লোক দুটোর মতলব কী ? মেজরকে খুন করবে নাকি ওরা ? কী দোষে ? অর্জুনের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। লিফট থামতেই সে দৌড়ে বেরিয়ে এল। নীচে সিঁড়িতে কেউ নেই। মেজরের ঘরের দরজা বন্ধ। অর্জুন কিছু স্থির করতে পারছিল না। লোক দুটো কি এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে ? দরজাটা নড়ে উঠতেই সে আবার লিফটে ঢুকে পড়ল। বোতাম টিপতেই সেটা উঠে গেল ওপরে। অর্জুন লিফটটা ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ি ধরে ধীরে-ধীরে নামতে লাগল।

নিজেদের ফ্লোরে আসার মুখে সে দাঁড়াতেই দেখল, লোক দুটো বোতাম টিপে লিফটটা নামিয়েছে। এবার ওটার ভেতরে ঢুকে গেল।

ওদের একজনের হাতে মেজরের তোয়ালেতে মোড়া জুতোজোড়া। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওরা নীচে চলে গেলে অর্জুন ছুটে মেজরের ঘরে ঢুকল। দরজা খোলাই ছিল। মেজর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। অর্জুনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। উনি কি মরে গেছেন?

সে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার ডাকার পর মেজরের চোখ খুলল, "আঃ। ক'টা বাজে? মা, মাগো!"

অর্জুন যেন প্রাণ ফিরে গেল, "মেজর, আপনি ঠিক আছেন?"

"বেঠিক থাকব কেন? খিদে পেয়েছে তোমার?"

"আপনি তাড়াতাড়ি উঠুন। এই ঘরে দুটো লোক ঢুকেছিল। তারা আপনার ওই জুতোজোড়া নিয়ে গিয়েছে।" অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে নিল।

"জুতো? জুতোচোর?" মেজর লাফিয়ে উঠলেন।

অর্জুন তাঁকে ঘটনাটা বলল। মেজর চটপট তৈরি হয়ে নিলেন। তিনি নীচে নামলেন। রিসেপশনিস্ট লোকটি ওঁকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হল। মেজর দুম করে ঘুসি মারলেন কাউন্টারে, "আমি জানতে চাই, এই হোটেলটা চোর বদমাশ গুণ্ডাদের দখলে কি না?"

"নো স্যার। এটা খুব রেসপেক্টেবল হোটেল।"

"ছাই হোটেল। ওই লোকদুটোকে আপনি আমার রুমের নাম্বার বলেছেন কেন?"

লোকটা কোনও রকমে মাথা নাড়ল, "আমি ভেবেছিলাম ওরা আপনার বন্ধু।"

"বন্ধু? জুতোচোর আমার বন্ধু? আমি আপনার নামে পুলিশকে বলব। কোথায় ওরা? বলুন, কোথায় গিয়েছে ওরা?" মেজর বীভৎস রাগে চেঁচাচ্ছিলেন।

"আমি জানি না, স্যার। ওদের আমি কখনও দেখিনি। এমনভাবে কথা বলছিল যে, ভয় পেয়ে... ! স্যার, আপনি আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন।"

অর্জুন কোনও রকমে বলতে পারল, "পুলিশকে বলার আগে মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে পরামর্শ করলে হত না?"

"মিসেস গ্রান্ট?" মেজর আগের গর্জনটা ধরে রেখেছিলেন, "ও, মিসেস গ্রান্ট।...এই যে শুনুন, ডায়াল করুন।" নাম্বারটা বললেন মেজর। যোগাযোগ হতেই রিসিভার হাতে নিয়ে মেজর ইংল্যাণ্ডের হোটেলগুলো সম্পর্কে নালিশ করতে লাগলেন। তারপর বললেন, "না না, আপনাকে আসতে হবে না।...ডিনার? না না, ডিনার খাইনি।...আসব? কী দরকার?...আচ্ছা। সিটি ব্যাঙ্ক? তারপর? ...ও। বাই।"

রিসিভার রেখে মেজর বললেন, "ওই লোক দুটোকে যদি আবার এই

হোটেলে দেখি, তা হলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে, চাঁদ।"

একজন লালমুখো ইংরেজকে কথাগুলো যেভাবে শোনালেন মেজর, তাতে ওর ওপর আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল অর্জুনের।

হোটেলের বাইরে অর্জুনকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন মেজর। তখনও তাঁর রাগ কমেনি। একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে অকারণে ধমকে থামালেন। তারপর সোজা যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "আমার ঘরে ঢুকে চুরি করে, কী সাহস বলো তো!"

"আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাই।"

"হোটেলের ওই রিসেপশনিস্টটাকে ছাড়া ঠিক হবে না। ওহো, আমরা যাচ্ছি মিসেস গ্রান্টের বাড়িতে। উনি যেতে বললেন।"

"ওটা তো ওঁর বান্ধবীর বাড়ি। কিন্তু কেন যাচ্ছি?"

"উনি খেতে বললেন।"

"কেন?"

প্রশ্নটা শুনে এবার থতমত খেয়ে গেলেন মেজর, "উনি বলতেই আমি হ্যাঁ বলে ফেললাম।"

অর্জুন হেসে ফেলল। নির্জন রাস্তায় খুব সামান্য গাড়ি চলছে। সমুদ্রকে ডান দিকে রেখে ওরা এগোচ্ছে। খুব ভাল লাগছিল অর্জুনের। এখন আর কল্পনার কিছু নেই। ওই লোক দুটো জুতো পেয়ে গেছে। চোরা-কুঠুরিতে যখন কিছুই পাবে না, তখন নিশ্চয়ই খেপে যাবে ওরা। মনে হচ্ছে সেই কারণেই আবার দেখা হবে। দোকানের হত্যাকাণ্ডের জের ব্ল্যাকপুলে এসে পৌঁছবে। হঠাৎ অর্জুন দেখল, একটা বাগানওয়ালা বাড়ির সামনে দুটো লোক দাঁড়িয়ে। ওদের দেখামাত্র অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল। অর্জুন বাড়িটার নাম পড়ল, 'সি-ফেস'। পুরনো বাড়ি। কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না। লোক দুটো অমন করল কেন? সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, লোক দুটো উলটো দিকে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে উঠে শহরের দিকে চলে গেল।

এই অঞ্চলটা শহরের বাইরে। দূরে-দূরে কিছু সেকেলে বাড়ি। বাড়িটার নাম সি-ফেস। সমুদ্রমুখী। একদম ঠিকঠাক নাম। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অর্জুন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল তার। সে মেজরের একটা হাত উত্তেজনায় আঁকড়ে ধরল। মেজর চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন, বিড়বিড় করে বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

অর্জুন বলল, "মেজর। আমি পেয়ে গেছি।"

"কী?"

"এস. এফ. মানে সি-ফেস। মানে ওই বাড়িটা, আর বি. পি. মানে ব্ল্যাকপুল। ব্ল্যাকপুলের 'সি-ফেস' বাড়ি।" অর্জুনের গলায় উত্তেজিত আনন্দ।

"তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," মেজর বললেন।
অর্জুন গাড়ির আসনে নিজেকে ছেড়ে দিল, "একটু ভাবতে দিন।"

আচমকা কাউকে নিমন্ত্রণ করেও যে ভাল খাওয়ানো যায়, তা মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী দেখালেন। ভদ্রমহিলা হাসিখুশি। মাসিমা-মাসিমা ভাব। খাওয়াদাওয়ার পর ওরা বসার ঘরে বসল। মেজর হোটেলের ঘটনাটা বললেন। মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বললেন, "এখানকার পুলিশ খুব কড়া। ঘটনাটা জানতে পারলে রিসেপশনিস্টটিকে ছাড়বে না।" যদি ওরা চায়, তিনি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

মিসেস গ্রান্ট বললেন, "আর-একটা দিন অপেক্ষা করলে হয়।"

এইসময় অর্জুন জিজ্ঞেস করল মিসেস গ্রান্টের বান্ধবীকে, "আপনাদের এখানে আসবার সময় একটা বাড়ি দেখলাম। বাড়িটার নাম সি-ফেস। ওখানে কারা থাকেন?"

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বললেন, "ওঃ, ওটা এখন প্রায় পরিত্যক্ত। গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। বাড়িটার মালিক সেই রকম উইল করেছিলেন।"

"উনি কবে মারা গিয়েছেন?"

"ওঁর মৃত্যুটা রহস্যজনক। উনি আপনার মতোই অভিযান পছন্দ করতেন, মেজর। শুনেছি, বছর তিনেক আগে কোনও একটা অভিযানে গিয়ে তিনি হারিয়ে যান। অনেক চেষ্টার পর তাঁর খোঁজ না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।"

"ওঁর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?"

"না। কাউকে তো দেখিনি। বাড়িটা তালাবন্ধ রয়েছে সেই থেকে।"

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল, "এখানে সূর্য ওঠে কখন?"

"তিনটে নাগাদ। কেন?"

"আমি তার আগে ওই বাড়িতে যেতে চাই।"

"কেন? ওখানে কী দরকার?" মেজর অবাক।

"আমার বিশ্বাস, ওখানে গেলেই জুতোর রহস্য এবং জুতোচোরদের মতলব বোঝা যাবে। আমরা যদি আজ রাতে হোটেলে ফিরে না গিয়ে এখানেই বিশ্রাম করি, তা হলে আপনাদের আপত্তি আছে?" অর্জুনের গলার স্বর পালটে গেল।

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বললেন, "এখানে কেউ বসে থাকতে পারে? তা হলে শোবার ব্যবস্থা করতে হয়।"

"কোনও দরকার নেই," অর্জুন বলল, "আপনারা শুয়ে পড়ুন।"

মিসেস গ্রান্ট জোর করে তাঁর বন্ধুকে শুতে পাঠালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলো তো? ওই বাড়িতে কী আছে?"

অর্জুন বলল, "জুতোটার মধ্যে চোরা-কুঠুরিতে যে চিরকুট ছিল, তাতে জুতোর মালিক লিখেছিলেন বি. পি., এস. এফ.। জুতোটা অভিযাত্রীর, এবং বাড়িটাও। ব্ল্যাকপুল, সি-ফেস। তাই আমার মনে হচ্ছে, ওখানে না গেলে বুঝতে পারব না আমি ঠিক ভাবছি কি না!"

তখনও অন্ধকার। মিসেস গ্রান্ট গাড়ি চালাচ্ছিলেন। নিস্তব্ধ চারদিক। ঠাণ্ডার তুলনা নেই। আগেই কথা ছিল, তিনি সি-ফেস বাড়িটার আগেই থামবেন। একটু আড়ালে গাড়িটা রেখে তিনি নজর রাখবেন, আর কেউ আসে কি না। যদি সন্দেহজনক কিছু ঘটে, তিনি তিনবার হর্ন বাজিয়ে সাবধান করে দেবেন। তিনি বারংবার সতর্ক করে দিলেন, যেন ওরা পুলিশের হাতে না পড়ে। মাঝরাতে অন্যের বাড়িতে ধরা পড়লে ওদের নির্ঘাত হাজতবাস করতে হবে।

মেজর এবং অর্জুন মেন গেটে এসে দেখল, ওটা সহজেই খোলা যায়। ভেতরে পা দিতেই পাখিরা চিৎকার করে উঠল গাছে-গাছে। আবছা অন্ধকার চারপাশে। ওদের ধাতস্থ হবার সময় দিতে অর্জুন জায়গাটা জরিপ করল। এককালে বাগানটা সুন্দর ছিল। এখন অযত্নে আগাছায় ভরেছে। মেজর বললেন, "মানুষ আছে বলে তো মনে হয় না। কী করতে চাও?"

অর্জুন বলল, "আরও একটু ভেতরে চলুন। কথা বলবেন না। ওই ঝোপটার আড়ালে দাঁড়াতে হবে।"

ওরা সেখানে পৌঁছলে অর্জুন ঘড়ি দেখল। সূর্য উঠতে এখনও দেরি আছে। মেজরের পক্ষে এক জায়গায় অপেক্ষা করা মুশকিল। তিনি উশখুশ করছিলেন। আর অর্জুন কেবলই তাঁকে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বলছিল। পাখিরা থেমে গেছে। পৃথিবীর কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঠাণ্ডা যেন হাড়ের ওপর দাঁত বসাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সূর্যদেব উঠলেন। যদিও ঘড়িতে এখন শেষরাত। একফালি রোদ এসে পড়ল ভুতুড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো বাড়িটার ওপর। চাপা গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি পপলার গাছ চেনেন?"

মেজর হাসলেন, "তা চিনব না! ওই তো ওখানে একটা, ওপাশে আর-একটা।"

অর্জুন গাছ দুটোকে দেখল। বাড়িটার পুব দিকে কোনও পপলার গাছ নেই। এ দুটো উত্তর দিকে। শ্যাডো কিস্ড দ্য পপলার। পশ্চিমে সূর্য ঢললে পূর্ব দিকে ছায়া পড়ে। সেদিকে পপলার না থাকায় দেখতে হবে পশ্চিমে সেই গাছ আছে কি না। কারণ উত্তরে ছায়া আসবে না।

অর্জুন মেজরকে ইশারা করে এগিয়ে যেতে লাগল সতর্ক পায়ে।

শিশির-ভেজা পাতাগুলোয় বেশি শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু পাখিরা জাগছে। পশ্চিম দিকের বাউণ্ডারি ঘেঁষে একটা পপলার দাঁড়িয়ে। আর কী আশ্চর্য, সূর্য এখনও নীচে বলে বাড়িটার ছায়া তার গোড়ায় পড়েছে। শ্যাডো কিস্‌ড দ্য পপলার।

বুকের মধ্যে ড্রাম বাজছে। অর্জুন গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। মেজরকে বলে গেল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখুন। কাউকে দেখলে সতর্ক করে দেবেন।"

সে মনে করল পরের শব্দগুলো। ফোর এল, টু ইউ। এল মানে লেফ্‌ট, বাঁ দিকে। চার ফুট না চার হাত ? চার ফুটে তো শেকড় থাকবে। তা হলে চার হাত। 'টু ইউ' মানে ? ইউ কি আণ্ডার ? দু' হাত নীচে।

সে চারপাশে তাকাল। তারপর জায়গা মেপে মাটিতে উবু হয়ে বসল। খুব শক্ত মাটি নয়। সে পকেট থেকে ছুরিটা বের করল। কোদাল বা শাবল পেলে ভাল হত। কী করা যাবে! সে ছুরি দিয়ে খানিকটা গর্ত করে এবার মাটি তুলতে লাগল হাতে। কাদা-কাদা মাটি, সহজেই উঠে আসছে। প্রায় একঘণ্টা চেষ্টার পর মনে হল, হাত-দুয়েক গর্ত হয়েছে। কিন্তু কিছুই নেই তো! সে গর্তটাকে আরও একটু বাড়িয়েও কিছু পেল না। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল অর্জুন। সে কি পুরো ব্যাপারটাই ভুল বুঝেছে! অমলদা থাকলে···। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে এক ঝটকায় সোজা করল। সে নিজে ভুল করবে আর অমলদা তাকে শুধরে দেবেন, এ কতদিন চলবে ? অর্জুন পপলার গাছটার দিকে তাকাল। ছায়াটা নেমে এসেছে অনেকটা। গোড়া থেকে অন্তত হাত-চারেক ওপরে এসে ঠেকেছে। অর্জুনের চোখ ছোট হয়ে এল। চারটে বড় ডাল গাছটার শরীর থেকে বেরিয়েছে। ফোর এল মানে কি ফোর লার্জ ? সে ডালগুলো দেখল। তারপর ধীরে-ধীরে তার মুখে হাসি ফুটল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেজরকে ইশারায় ডাকল। মেজর এলে সে বলল, "কিছু মনে করবেন না, উবু হয়ে বসুন তো!"

"কেন ? কিছুই তো পেলে না!"

মেজর বসতেই সে দু'পা তাঁর মাথার দু'পাশে গলিয়ে বলল, "কিছু না মনে করে গাছটা ধরে উঠে দাঁড়ান।"

মেজর সোজা হতে চারটে ডালের ঠিক দু' ফুট নীচে সে গর্তটাকে দেখতে পেল। সম্ভবত গর্ত করে পাথর দিয়ে মুখটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে টাইট করে। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অর্জুন পাথরটাকে বের করতেই বাইরে তিনবার হর্ন বেজে উঠল। দ্রুত হাত চালাল সে। হাতের মুঠোয় একটা স্টেইনলেস স্টিলের কৌটো উঠে এল। লাফ দিয়ে মেজরের কাঁধ থেকে নেমে অর্জুন বলল, "দৌড়োন।"

হতভম্ব মেজর যখন তাঁর ভারী শরীর উত্তর দিকের ঝোপের আড়ালে

নিয়ে আসতে পারলেন, তখন অর্জুন চারটে লোককে দেখতে পেল। গেট খুলে তারা ঢুকছে। দু'জনকে সে গতরাত্রে হোটেলে দেখেছে, বাকি দু'জনকে দেখলেই বোঝা যায়, খুন করতে ওদের হাত কাঁপে না।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে বাড়িটার দক্ষিণ দিকে চলে গেল। একটু পরেই বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে একটি মানুষের অবাক-হওয়া চিৎকার ভেসে এল। মেজর বললেন, "চলো, পালাই।"

"পালাবেন, না লড়বেন?"

"লড়ব? বেশ, তা-ই হোক!"

কথা শেষ হবার আগেই চারজনকে দৌড়ে গেটের কাছে পৌঁছতে দেখা গেল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে গেট পরিষ্কার দেখা যায়। লোকগুলো খুব উত্তেজিত হয়ে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছে। এই সময় অর্জুন মিসেস গ্রান্টের গাড়িটাকে দেখতে পেল। গাড়িটা নজরে পড়তেই চারটে লোক একপাশে সরে দাঁড়াল। ওদেব দু'জনের হাতে রিভলভার।

মেজরের কাঁপা গলা শুনল অর্জুন, "না। লড়াটা বোকামি হবে।"

গাড়ি থেকে নামলেন মিসেস গ্রান্ট। তারপর সোজা লোকগুলোর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি সি-ফেস?"

একটা লোক কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেন? এখানে কী দরকার?"

"আমি সাপের ব্যবসা করি। এখানে আমার দুটো সাপ ঢুকেছে। ওদের নেব।"

"সাপ?"

"হ্যাঁ। ওই তো। ওখানে।" মিসেস গ্রান্ট সরাসরি মেজরের দিকে আঙুল তুলতেই লোকগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপরে কোনওদিকে না চেয়ে ওরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

গাড়িতে বসে মেজর বললেন, "ওরা পালাল কেন বলুন তো?"

মিসেস গ্রান্ট বললেন, "ওরা আপনাদের সাপ বলে ভুল করেছিল।"

মেজর বললেন, "এটা ঠিক হল না। আপনি আমাদের সাপ বানালেন।"

"ওদের কাছে। কিছু হল?"

শেষ প্রশ্ন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে। সে হাতের মুঠো খুলল। স্টেইনলেস স্টিলের কৌটোর মধ্যে একটা চাবি। চাবির গায়ে ব্যাঙ্কের চাকতি। সেখানে লেখা কোন্ ব্যাঙ্ক, লকারের নম্বর কত!

অর্জুন বলল, "এটার জন্যে ওরা মরিয়া হয়ে খুঁজছে। নিশ্চয়ই ওই লকারে খুব মূল্যবান কিছু আছে।"

মিসেস গ্রান্ট বললেন, "আমাদের এটা নিয়ে থানায় যাওয়া উচিত।"

অর্জুন বলল, "তা হলে পুলিশকে বলতে হবে আমরা কীভাবে চাবি পেয়েছি। তার চেয়ে লকার খুলে যদি দামি জিনিস দেখি, তা হলে পরিচয় না দিয়ে পুলিশকে ফোন করলেই চলবে।"

"দামি জিনিস মানে?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"সোনাদানা, টাকা।"

"যদি অন্যকিছু হয়। এই ধরো গুপ্তধনের ম্যাপ?"

অর্জুন হাসল। "তা হলে তো চমৎকার।"

মেজর উঠে বসলেন, "সোজা ব্যাঙ্কে চলো।"

অর্জুন আপত্তি করল, "না। মিস্টার মার্শালি আপনাকে আজ যেতে বলেছেন। আপনার তো হাঙর মারার কথা। আমরা সেটা দেখি আগে।"

মেজর আবার এলিয়ে পড়লেন গাড়ির সিটে, "ও। হাঙর! আমার কাছে কিছুই না। এখন আমি ইন্টারেস্টেড মানুষরূপী হাঙরে। হে ভগবান, লকারে যেন গুপ্তধনের ম্যাপ থাকে।"

অর্জুন চাবিটাকে পকেটে রেখে ভোরের সমুদ্রের দিকে তাকাল।

ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রের ধারের এই ছোট্ট শহরটাকে খুব ভাল লেগে গেল অর্জুনের। সব সময়ই ঝোড়ো বাতাস বইছে এখানে। ঠাণ্ডা আছে, তবে সেটা ডিসেম্বরের জলপাইগুড়ির মতনই। মে-জুন মাসেই যদি এই অবস্থা, তা হলে সত্যিকারের শীত এলে কী হবে! ওদের হোটেলের জানলা দিয়ে সবুজ জলের স্থির সমুদ্র দেখছিল অর্জুন। সমুদ্র বলতে যে উত্তাল জলরাশি মনে আসে, ব্ল্যাকপুলে তা দেখা যাচ্ছে না। আর এই সমুদ্রের তলাতেই মেজরের বন্ধু মার্শালিসাহেব মুক্তো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। অবশ্য জায়গাটা এই হোটেল থেকে কয়েক মাইল দূরে এবং সেখানে যাওয়ার জন্যেই ওর আর মেজরের ব্ল্যাকপুলে আসা।

মেজরের বিশেষ পরিচিত মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে হিথরোতে আসার সময় দেখা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা খুব ভাল। একসময় পেশাদার ম্যাজিশিয়ান ছিলেন। এখন মাঝে-মধ্যে অনুষ্ঠান করেন। এই রসিকা ভদ্রমহিলার বাড়িতে ওরা এক রাত ছিল। সেখানেই পুরোন জুতোর মধ্যে একটা চিরকুটে সাঙ্কেতিক শব্দ পেয়ে গিয়েছিল অর্জুন। অনেক ঝামেলার পর সেই শব্দের সূত্র ধরে একটি স্টিলের কৌটোয় লুকিয়ে-রাখা চাবি আবিষ্কার করে এখন ওরা হোটেলের জানলায় আরাম করে বসেছে। চাবিটার গায়ে ব্ল্যাকপুলের কোনও একটা ব্যাঙ্কের চাকতি এবং তাতে লকার-নম্বর লেখা। হোটেলে ফিরে আসামাত্র মেজরকে রিসেপশনিস্ট বলেছেন, "মার্শালিসাহেব খবর পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁদের জন্যে আজ দুপুরে অপেক্ষা করবেন।"

মিসেস গ্রান্ট বললেন, "মেজর, আপনারা তা হলে রওনা হন। অবশ্য

যদি চান, আমি আপনাদের আমার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।"

গতরাত্রে ওই স্টেনলেস কৌটো খোঁজার জন্যে কেউ একফোঁটা ঘুমোতে পারেনি। অর্জুন প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। একটুও ক্লান্ত মনে হচ্ছে না ওঁকে। কিন্তু গাড়িতে আসার সময় মেজব তিনবার ঢুলেছিলেন। সে বলল, "আমার প্রস্তাব হল, স্নানটান করে এখন সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। তারপর মার্শালসাহেবের কাছে যাওয়ার সময় ওই ব্যাঙ্ক হয়ে যাব।"

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র মেজর লুফে নিলেন, "কারেক্ট।" মার্শালের হুকুমমতো আমাদের চলতে হবে নাকি? শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।" বলতে-বলতে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুললেন তিনি।

মিসেস গ্রান্টকে এগিয়ে দিতে নীচে নামল অর্জুন। পার্কিং লটে পৌঁছে পৌঢ়া বললেন, "সাবধানে থাকা দরকার। আমার মনে হচ্ছে কোনও একটা বড় ঝামেলার সঙ্গে সবাই জড়িয়ে পড়ছি। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। প্রৌঢ়াকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। নিজে ম্যাজিশিয়ান, কিন্তু তাই বলে কোনও অহঙ্কার নেই। পরিষ্কার বলেছেন, "আমি অতীত আবিষ্কার করতে পারি না, ভবিষ্যৎ পড়তে পাবি না, শুধু বর্তমানেব কিছু ব্যাপারে বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারি মাত্র।"

মিসেস গ্রান্ট চলে গেলে অর্জুন দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। ভাল মেঘলা দিন আজ। সেই সঙ্গে বাতাস দাপটে বইছে। শরীরে একটা কনকনে ভাব তৈরি হচ্ছে এই কারণে। হোটেলের সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে প্রায় জনশূন্য রাস্তা এবং দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অর্জুন আবিষ্কার করল, শরীরের ক্লান্তিটা এখন আর অত প্রকট নয়। বোধহয় এই কারণেই ঠাণ্ডার দেশের মানুষেরা বেশি কাজ করতে পারে। অর্জুন ধীরে-ধীরে রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে এল। স্থির সমুদ্রে বাতাস ভাঙা ঢেউ তুলছে। কিছু রঙিন বোট জেটিতে বাঁধা রয়েছে। সেগুলোতে চড়ার জন্যে কেউ নেই অবশ্য। সমুদ্রের ওপর ভাসমান রেস্তোরাঁগুলো রঙিন সাইনবোর্ড নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষায় রয়েছে। বড় চওড়া রাস্তার ওপাশে আধ মাইল জায়গা জুড়ে নানান দোকান এবং বেটিং হাউস। অল্প পয়সায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার নেশা যাদের, তারাই ওখানে ভিড় জমিয়েছে।

রাস্তাটার নাম গ্লেব রোড। সিঙ্গল লাইন দিয়ে একটা ট্রাম সশব্দে চলে গেল। এবং তখন অর্জুনের নজরে পড়ল মেয়েটাকে। দেখলে ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে। কোঁকড়া চুল অযত্নে ছাঁটা, জিন্‌সের প্যান্টের ওপর নীল সোয়েটার এবং সাদা কার্ডিগান। সমুদ্রের ধারের সাদা রেলিং-এ হেলান দিয়ে তাকে লক্ষ করছে। কুড়ি-একুশের ওপরে মোটেই ওর বয়স নয়।

অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। মেয়েটা যেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, তার পেছনে একটি সাইনবোর্ডে 'দি গুড ওল্ডি ডেজ' নামক একটি নাটকের বিজ্ঞাপন। একটু জেদ করেই অর্জুন মেয়েটির সামনে দিয়ে হেঁটে এল। সে আড়চোখে লক্ষ করল, বাতাসে লুটিয়ে-পড়া একগোছা চুলের ফাঁকে মেয়েটির ঠোঁটে চিলতে হাসি চলকে উঠল। আরও খানিকটা এগিয়ে অর্জুন বাঁ দিকে বাঁক নিল। রাস্তা থেকে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম সোজা সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ওপরের সাইনবোর্ডে লেখা 'বেল আইল'। এখানে ছোট-ছোট ভিড়, কিন্তু মনুষ্যজন চোখে পড়ছে না। এই সময় এই আবহাওয়ার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়ে কমলা রঙের রোদ উঠল। অর্জুন আড়চোখে দেখল, মেয়েটা এবার স্পষ্ট তাকেই অনুসরণ করছে। সে সমুদ্রের দিকে তাকাল প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে। ওদিকে ছোট একটা পাহাড়ের গায়ে সমুদ্র টইটম্বুর, এপাশে অবশ্য দিগন্ত দেখা যায় না।

"এক্সকিউজ মি।" গলাটা যেন একেবারে কানের কাছে।

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল, মেয়েটি পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাওয়ায় তার চুল এবার বড্ড এলোমেলো। দু'পকেটে হাত পুরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি বাংলাদেশী?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। আমি ভারতীয়।

"এই দেশে কতদিন আছ?"

"কয়েকদিন বলাটাও বেশি বলা হবে।"

"বাঃ। তুমি তো দেখছি বুদ্ধিমান। আমিও অবশ্য ভারতীয় ছিলাম কোনও একদিন।"

"মানে? তুমি কি এখন এখানকার নাগরিক?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি কোনও গোলমাল করেছ?"

"আমি? না তো?"

"সত্যি কথা বলছ না তুমি। নিজের ভাল চাও তো এখনই ব্ল্যাকপুল ছেড়ে যাও। আমি একটা প্লে হাউসে চাকরি করি। দুজন লোককে বলতে শুনলাম কিছু কথা তোমার সম্পর্কে। তুমি ভারতীয় বলেই, মনে হল, সাবধান করে দেওয়া উচিত।" কথা শেষ করেই মেয়েটি যেমন এসেছিল তেমন ফিরে গেল রাস্তার দিকে।

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ঠিক কী শুনেছে। তাকে সাবধান করে দিতে এসে মেয়েটিও কি ঝুঁকি নিল? কিন্তু ততক্ষণ মেয়েটি রাস্তায় উঠে চোখের আড়ালে চলে গেছে। অর্জুন ফিরে এল প্ল্যাটফর্ম ডিঙিয়ে। আর তখনই আর-একটা ট্রাম সামনে এসে দাঁড়াতেই সে কোনও কিছু না ভেবেই উঠে বসল।

এক পাউন্ডের কয়েন দেখতে দারুণ। মোহর দ্যাখেনি সে কখনও। কিন্তু ওই কয়েনটাকে দেখলেই মোহরের কথা মনে আসে। অর্জুন

মেয়েটির কথা ভাবছিল। নিশ্চয়ই অনেক কাল এ-দেশে আছে। কথা বলার ভঙ্গিটিও ব্রিটিশদের মতো। শুধু ভারতীয় বলে যেচে সচেতন করতে এল ? কী জানি ! কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি হলে তাকে নিয়ে এখানে কেউ-কেউ আলোচনা করছে। এরা কারা ? এই সময়ে ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ডটা নজরে পড়তেই সে ঝটপট উঠে পড়ল। বেশ কিছু যাত্রী ট্রামস্টপে অপেক্ষায় ছিলেন এখানে। অর্জুন নামবার সময় লক্ষ করেনি আর-একটা জিপ ট্রামটার পাশাপাশি এসে আবার ট্রামটারই সঙ্গী হয়ে চলে গেল। অনুসরণকারীরা মানুষের ভিড়ে তাকে লক্ষ করেনি নামতে। রাস্তা পেরিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে এসে সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। আজ অবধি সে কোনও ব্যাঙ্কের লকার খোলেনি। কী করে খুলতে হয়, তাও তার জানা নেই। ব্যাঙ্কের অফিসাররা যদি তাকে প্রশ্ন করে তা হলেই হয়ে গেল !

দোনামনা করে সে দরজার দিকে এগোতেই ওটা দু'পাশে সরে গেল তাকে পথ করে দিতে। বিভিন্ন এয়ারপোর্টে এই ধরনের দরজা দেখে সে এখন অভ্যস্ত। ব্যাঙ্কে তেমন লোকজন নেই। কিন্তু চারপাশে নজব বুলিয়েই তার মনে হল, সে যদি লকারের খোঁজ করে তা হলে ওই যে মহিলা রিসেপশনে বসে আছেন, তার সন্দেহ বাড়বেই। ভদ্রমহিলা যে-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, সেটা পছন্দসই নয়।

হোটেলে ফিরে মেজরের ঘুম ভাঙাতে ভাল পরিশ্রম করতে হল। চেন না খুলে সামান্য ফাঁক করে ওকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেজর বললেন,"ওঃ তুমি ! আমি ভাবলাম আবার কেউ ঘর ভুল করল বুঝি।"

ঘরে ঢোকার পর অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার বলুন তো ?"

"আর বোলো না। অন্তত তিনবার দরজায় ধাক্কা দিয়েছে কেউ-না-কেউ। ঘরের নম্বর জিজ্ঞাসা করেছে। আমি খুলিনি। শুয়েই ছিলাম।"

"খুব ঘুম পেয়েছিল বুঝি !"

"না, না। ওরা ভুল নম্বর বলছিল। ষোলো নম্বর ঘর চাইছিল।"

অর্জুন চমকে উঠল, "আমাদের এই ঘরটাই তো ষোলো নম্বর।"

"অ্যাঁ।" মেজর চোখ পিটপিট করলেন। তাঁর বিশাল শরীরটাকে জবুথবু দেখাল, "বড্ড ভুল হয়ে গেছে হে। আমি ভেবেছিলাম সতেরো। লোকগুলোকে কষ্ট দিলাম অনর্থক। ছি ছি ছি।"

বিছানায় ঢোকার সময় অর্জুন শান্ত গলায় বলল, "না জেনে হয়তো ঠিক কাজই করেছেন। জানার পর আবার দরজা খুলতে যাবেন না।"

"মানে ?" মেজর ওর বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন।

"প্রতি মুহূর্তে কেউ-না-কেউ আমাদের অনুসরণ করে থাকে।"

দুপুর নয়, ওরা হোটেল ছেড়ে মার্শালসাহেবের উদ্দেশে বের হল যখন,

তখন ভর-বিকেল। অবশ্য সময়ের এই ভাগটা করতে হয় ঘড়ি দেখে। রোদ না থাকায় সকাল আর দুপুরকে বিকেলের থেকে আলাদা করা অসম্ভব।

ট্যাক্সি নয়, ব্ল্যাকপুলের বাস টার্মিনাস থেকে বাসে উঠেছিল ওরা। জলপাইগুড়ির বাস যদি এমন হত! ড্রাইভারের সিটের পাশ দিয়ে ওঠার সময় টিকিট নিয়ে ভেতরের আরামদায়ক আসনে গিয়ে বোসো। জিনিসপত্র রেখে দাও লাগেজ-বক্সে। কারও সঙ্গে কারও শরীর ঠেকছে না। একটুও ঝাঁকুনি না দিয়ে মসৃণ গতিতে গাড়িটা চলছে সমুদ্রের ধার-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে। এর মধ্যে মেজর ড্রাইভারকে বলে এসেছেন মার্শালিসাহেবের কাছে পৌঁছতে, যেখানে ওদের বাস থেকে নামতে হবে সেখানে মনে করে নামিয়ে দিতে। অর্জুনের হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের আচরণ অনেকটাই একরকম। দেশ এবং জাতিভেদে ভাষা এবং জীবনযাত্রার তারতম্যে যে-প্রভেদটা প্রথমেই নজরে আসে, সেটাকে উপেক্ষা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকে একই গলায় সুখ-দুঃখ অথবা উদ্বেগের কথা বলে। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে অনেক মানুষ বারংবার কন্ডাক্টরকে মনে করিয়ে দেয়, তাকে ফাটাপুকুরে অথবা বেলাকোবায় নামিয়ে দিতে।

মেজর একটু ঝুঁকে বললেন, "ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা মিটিয়ে গেলে হত হে। বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।"

অর্জুন বলল, "আমাদের লকার-রুমে ঢুকতে দিত না।"

"কেন? চাবি নিয়ে গেলে দেবে না কেন?"

"ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। দেখে সন্দেহ হল, ওই ব্যাঙ্কে কোনও ভারতীয়ের অ্যাকাউন্ট নেই। সবাই আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল। লকারের খোঁজ করলে ওরা নিশ্চয়ই গোপনে পুলিশকে খবর দিত।"

অর্জুন কাচের জানলায় চোখ রেখে সমুদ্র দেখতে-দেখতে কথাগুলো বলতেই মেজর মাথা নাড়লেন, "তা হলে তো মুশকিল হয়ে গেল।"

"মিসেস গ্রান্টকে দায়িত্বটা দিতে হবে। ওঁকে কেউ সন্দেহ করবে না।"

কথাটা মেজরের মনে ধরল, "ঠিক বলেছ। মিসেস গ্রান্টকে তোমার কেমন লাগছে?"

"খুব ভাল।"

"আমি যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব তারা ভাল না হয়ে যায় না।"

এই সময় বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে ড্রাইভার আচমকা ব্রেকে পা দিতেই বাস গতি হ্রাস করতেই মেজর সামনে ঝুঁকে পড়তে-পড়তে চিৎকার করলেন, "ননসেন্স। কী ধরনের গাড়ি চালানো হচ্ছে, অ্যাঁ?"

প্রশ্নটির উত্তর দেবার সময় হল না কারও। কারণ প্রত্যেকের চোখ সামনের রাস্তায়। সেখানে পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে একটি প্রাইভেট

গাড়িকে। গাড়িটির চারটে চাকাই পাশ থেকে ওঠা। বোঝাই যাচ্ছে দ্রুতগতিতে চালাতে গিয়ে কন্ট্রোল হারিয়ে চালক অ্যাকসিডেন্টটা করেছেন। যেভাবে গাড়িটি পাশ ফিরে আছে তাতে আরোহীদের মৃত্যু অস্বাভাবিক হবে না।

চোখ বন্ধ করে মেজর মাথা নাড়লেন, "এসব দেশে রাস্তায় এত স্পিড-রেস্ট্রিকশন থাকা সত্ত্বেও কেন যে অমন জোরে গাড়ি চালায়!"

পুলিশ ততক্ষণে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিচ্ছে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে। এদের বাস যখন ডান পাশ দিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন অর্জুন লাফিয়ে উঠল, "রোক্‌কে, রোক্‌কে।" পরক্ষণেই দেশটা মনে পড়ায় চিৎকার করল, "স্টপ, স্টপ।"

মেজর হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল তোমার?"

সিট ছেড়ে প্যাসেজে চলে এসেছিল ততক্ষণে অর্জুন। মুখ ফিরিয়ে উত্তেজিত গলায় সে জবাব দিল, "ওটা মিসেস গ্রান্টের গাড়ি।"

ওদের নামিয়ে দিয়ে বাসটা চলে যাওয়ার পর মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "দেখতে যদিও একরকম, তবু তুমি কী করে বুঝলে ওটাই মিসেস গ্রান্টের গাড়ি?"

"নাম্বার প্লেট।" অর্জুন হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটার সামনে। পাশেই তাদের মোটর বাইক। একজন অবাক গলায় প্রশ্ন করল, "কী চাই এখানে?"

বেশি উত্তেজিত হলে ইংরেজি বলতে এখনও অসুবিধে হয় অর্জুনের। সে কিছু জবাব দেওয়ার আগেই মেজর তাঁর আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখালেন। তাতে অভিযাত্রী হিসেবে আমেরিকান অভিযাত্রী সঙ্ঘের স্বীকৃতি রয়েছে ছবিসমেত। পুলিশের একাংশ বোধহয় পৃথিবীর সব দেশেই অজ্ঞতায় ভোগে, নইলে যে ভঙ্গিতে লোকটি কপালে হাত ছোঁয়াল তাতে মেজরই ঘাবড়ে গেলেন যেন।

"কী হয়েছে এখানে?" মেজরের গলার স্বর খুব ভারিক্কি শোনাল।

"অ্যাক্সিডেন্ট স্যার।" পুলিশটি জবাব দিল, "স্কিড্ করে এপাশে চলে এসেছে।"

মেজর মাথা নাড়লেন। অর্জুন ততক্ষণে সুটকেস নামিয়ে রেখে চলে গেছে গাড়ির গায়ে। ভেতরে কেউ নেই। মিসেস গ্রান্টের ফ্লাস্কটা দেখে তার বুক কেঁপে উঠল। এতক্ষণ বারংবার মনে হচ্ছিল নম্বরটা মনে রাখতে সে ভুল করেছে কি না। ভুল হলে ভাল লাগত। এখন ওই ফ্লাস্ক সব গোলমাল করে দিল।

এইসময় দ্বিতীয় পুলিশটি এগিয়ে এল, "এখানে আপনাদের প্রয়োজনটা জানতে পারি?"

মেজর বললেন, "এই গাড়িটা আমার এক বান্ধবীর। বাসে

যেতে-যেতে ওঁর গাড়িটাকে দেখে আমরা নেমে পড়েছি। কখন হয়েছে ঘটনাটা ?"

"কয়েক ঘণ্টা আগে। এতক্ষণে এটাকে ক্লিয়ার করা উচিত ছিল।" পুলিশ জবাব দিল।

অর্জুন এবার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারল না, "মিসেস গ্রান্ট, মানে যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তিনি, তাঁর অবস্থা কীরকম ?"

"ওঁকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা আমি জানি না, কারণ দুর্ঘটনার সময় আমি এই স্পটে ছিলাম না।"

"হসপিটালটা কোথায় ?"

"এখান থেকে মাইল তিনেক গেলে সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন।"

বোঝা গেল, এঁদের কাছে এরচেয়ে বেশি খবর পাওয়া যাবে না। জায়গাটা জনমানবশূন্য। কাছাকাছি একটা বাড়িও চোখে পড়ছে না। একপাশে সমুদ্র অন্যদিকে সবুজ ঢেউ-খেলানো মাঠ। মেজর জিভে শব্দ করে বললেন, "হুট করে বাস থেকে নেমে বড় ভুল হয়ে গেল হে। আবার কখন বাস আসবে তার তো ঠিক নেই।"

যেন নাগরাকাটা অথবা ওদলাবাড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মেজর, বলে মনে হল অর্জুনের। জায়গাটা যে খোদ সাহেবদের দেশ এবং সব-কিছু নিয়মে চলে এত বছর আমেরিকায় বাস করেও এই মুহূর্তে তিনি ভুলে গেছেন।

অর্জুন সময় নষ্ট না করে রাস্তাটা দেখছিল। যদিও কয়েক ঘণ্টা আগে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তবু চাকার দাগ রাস্তা ছাড়ার পর ঘাসের বুকে বসে আছে। মিসেস গ্রান্ট নিশ্চয়ই খুব জোরে ব্রেক কষেও সামলাতে পারেননি। গাড়ি যখন নীচে নামে অথবা সমান্তরাল পথে জল থাকলে চাকার গতি নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। কিন্তু যেখান থেকে মিসেস গ্রান্ট ব্রেক কষেছেন সেখানে গাড়ি সামান্য ওপরের দিকে উঠছিল। রাস্তাটা বাঁক ঘোরার পরেই উর্ধ্বমুখী হয়েছে। এরকম জায়গায় লোকে সাবধানে গাড়ি চালাবে। মিসেস গ্রান্টের চালানো সে দেখেছে। তাঁর পক্ষে গতি হারানো বিস্ময়কর।

সে ঝুঁকে গাড়ির চাকা দেখতে লাগল। কোথাও কোনও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে না। অবশ্য যন্ত্রের কথা বলা যায় না, ওপরে ওঠার সময় ব্রেক ফেল করতেও পারে। গাড়িটাকে সোজা করলে সেটা পরীক্ষা করা যেত। কিন্তু পুলিশ দুটো গাড়িটাকে ছুঁতে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। অর্জুন আর-একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল ভারী দুটো চাকা ওপাশের ঘাস ছেড়ে পিচের রাস্তায় উঠে এসেছে। যেখান থেকে দাগটা শুরু হয়েছে সেখানে মাঠের ভেতরে যাওয়ার মেঠো রাস্তার মুখ। এই দুটো দাগের সঙ্গে মিসেস গ্রান্টের গাড়ির দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে কি না বোঝা

যাচ্ছে না, তবে দাগটা যে বেশি পুরনো নয় তা পরিষ্কার।

এই সময় দ্বিতীয় পুলিশটি হেঁকে উঠল, "ও কী করছে ওখানে?"

মেজর গর্বিত গলায় জানালেন, "ওর নাম অর্জুন। বিখ্যাত ডিটেকটিভ। ও অবশ্য নিজেকে সত্যসন্ধানী বলে। আমেরিকায় পুরস্কৃত হয়েছে। সম্ভবত খুঁজে দেখছে এটা অ্যাক্সিডেন্ট কি না।"

কথাটা শোনামাত্র পুলিশটি এগিয়ে এল অর্জুনের কাছে, "হেই মিস্টার! তোমার লাইসেন্স দেখতে চাই।" লোকটা হাত বাড়াল।

"আমার তো কোনও লাইসেন্স নেই।"

"মাই গড। লাইসেন্স ছাড়া তুমি কোনওরকম ইনভেস্টিগেশন করতে পারো না। গেট লস্ট ফ্রম হিয়ার।" লোকটার ভঙ্গি দেখে অর্জুনের মনে হল, ও যেন কোনও অপরাধীর সঙ্গে কথা বলছে।

অর্জুন কোনওমতে বলতে পারল, "আমার মনে হচ্ছে এটা ঠিক দুর্ঘটনা নয়।"

"তোমার কী মনে হচ্ছে, তা জানাব কোনও প্রয়োজন আমার নেই। লাইসেন্স ছাড়া কোনও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এ-দেশে অ্যালাউ করা হয় না। তোমরা যদি এখনই এখান থেকে দূর না হয়ে যাও, তা হলে আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করতে পারি।"

মেজর তাঁর জিনসপত্র তুলে নিয়েছিলেন। অতএব অর্জুনকেও তাই কবতে হল। মেজর বললেন, "কী বুঝছ?"

অর্জুন বলল, "আগে হাসপাতালে গিয়ে মিসেস গ্রান্টের খবর নেওয়া দরকার।"

"সে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-জায়গাটা ছেড়ে গেলে পরের বাস কি আমাদের জন্যে দাঁড়াবে? নেক্সট বাস স্টপ কোথায় তা তো জানি না।" ওঁকে খুব কাহিল দেখাচ্ছিল।

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধ পুলিশটিকে দেখে হাঁটতে শুরু কবল।

পাশাপাশি চলতে-চলতে মেজর বললেন, "ভুলেও পিচে পা রেখো না। গাড়ি চাপা পড়লে ড্রাইভারের দোষ হবে না।"

হেসে ফেলল অর্জুন। চাপা পড়ার পর কাউকে দোষী করে কী লাভ!

বাধ্য না হলে এরকম ফাঁকা জায়গায় কেউ রাস্তার পাশ ঘেঁষে হেঁটে যায় না। ফুটপাথের প্রয়োজন হয়নি সেই কারণেই। হুশহাস গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? না-না, আমার কথা ছেড়ে দাও। অভিযাত্রী হিসেবে হেঁটে চলাই তো আমার নেশা। তবে সুটকেসের বদলে হ্যাভারস্যাক হলে ভাল হত।" মেজর ওটাকে হাতবদল করলেন। ওঁর কষ্টটা বুঝেও কোনও মন্তব্য করল না অর্জুন। তার মাথার ভেতরে যে চিন্তাটা পাক খাচ্ছে, তা হল ওটা কি সত্যিকারের দুর্ঘটনা? মিসেস গ্রান্ট কি বেঁচে আছেন? কিন্তু বিপরীত

দিকের ঘাস চেপে বেরিয়ে আসা চাকার দাগগুলো মনের ভেতর বুজকুড়ি তুলছে।

ওরা যখন হাসপাতালের সামনে পৌঁছল তখন ঘড়ি অনুযায়ী দিন শেষ। যদিও আকাশের দিকে তাকালে সময় বোঝা যাবে না। বড় রাস্তা থেকে আর একটি ছোট রাস্তা ধরে ছবির মতো কয়েকটা কটেজ পেরিয়ে ওরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়াল। সুন্দর লন, ফুলের বাগান এবং রঙিন বাড়িটি দেখে কিছুতেই অবশ্য অর্জুনের দেখা অন্য হাসপাতালের কথা মনে পড়েছিল না। ভেতরে ঢুকে বারান্দা পার হতেই ওরা রিসেপশন কাউন্টারে পৌঁছে গেল। একজন অল্পবয়সী মহিলা সেখানে বসে ছিলেন। ওদের দেখে হেসে বললেন, "গুড ইভনিং, এনি প্রব্লেম?"

মেজর সুটকেসটাকে মাটিতে রাখতে পেরে যেন বেঁচে গেলেন। হাতটাকে কয়েকবাব ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললেন, "আমাদের বলা হয়েছে যে, আজ যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার ড্রাইভার মিসেস গ্রান্ট এখানে ভর্তি হয়েছেন। তিনি কেমন আছেন?"

রিসেপশনিস্ট চট করে একটা রেজিস্টারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইনটারকমের বোতাম টিপে এমন নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন যে, অর্জুন কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর দুঃখিত-দুঃখিত মুখ করে বললেন, "ওয়েল জেন্টলমেন, ওঁর অবস্থা ভাল নয়। ঠিক বলতে গেলে বলতে হয় খুবই খারাপ। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। আপনারা এসে আমাদের উপকার করেছেন। কারণ ওঁর বাড়িতে খবর পাঠানো হলেও এখনও সেখান থেকে কোনও রেসপন্স আমরা পাইনি।" ওঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে... ।"

মেজর চটপট বললেন, "অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে? সর্বনাশ। কোথায় লেগেছে?"

"হেড ইনজুরি। ঘণ্টাখানেক পরে ওঁকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হবে। বাট ইউ নো, ডাক্তাররা শুধু চেষ্টাই করতে পারেন।" ভদ্রমহিলার গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছিল মিসেস গ্রান্টের বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্জুনের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মেজর চোখে রুমাল চাপলেন। তাই দেখে রিসেপশনিস্ট বললেন, "ইওর ক্লোজ রিলেশন?"

মেজর বললেন রুমাল সরাতে-সরাতে "মোর দ্যান দ্যাট। উনি আমার বন্ধু। ইন ফ্যাক্ট আমাদের জন্যেই ব্ল্যাকপুলে এসেছিলেন উনি। না এলে... ।"

মহিলা জানালেন যে, তিনি লোক্যাল থানায় খবর দিচ্ছেন। এসব ব্যাপারে পুলিশের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার থাকে।

মেজর যেন নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল,

“আচ্ছা, আমরা ওঁকে একবার দেখতে পারি ? জাস্ট চোখের দেখা।”

রিসেপশনিস্ট বললেন, “দেখে কী করবেন ? অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে বললাম তো। তা ছাড়া ও· টি-তে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে হয়তো ইতিমধ্যে।”

মেজর বললেন, “ও টি· থেকে যখন বের হবেন. তখন শরীরে প্রাণ থাকবে কি না কে জানে। জীবিত মানুষটাকে চোখে দেখার সুযোগ দিন অনুগ্রহ করে।”

রিসেপশনিস্ট আবার ইন্টারকমে কথা বললেন। তারপর ওদের জানালেন অপেক্ষা কবতে হবে।

সামনের সোফায় শরীব এলিয়ে দিলেন মেজর। অর্জুনের খুব খারাপ লাগছিল। অল্প আলাপেই মিসেস গ্রান্টকে ওর বেশ ভাল লেগেছিল। এরকম একটা দুর্ঘটনায় উনি আহত হয়ে মারা যাবেন ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতে গিয়েও থেমে গেল। এটা হাসপাতাল। এবং এই হাসপাতালের দিকে তাকালে এক চিলতে নোংরা ফেলতে ইচ্ছে করে না। জুতোর শব্দ কানে আসতেই সে দেখল, য়ুনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার এগিয়ে আসছেন। রিসেপশনিস্ট-মহিলা পুলিশ অফিসারদের প্রশ্নের উত্তরে মেজরকে দেখিয়ে দিতেই তাঁরা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পুলিশ অফিসারদের একজন প্রশ্ন করলেন, “এক্সকিউজ মি, আপনারা এদেশের নাগরিক ?”

মেজর মাথা নাড়লেন “না। আমরা বেড়াতে এসেছি।”

“অ্যাক্সিডেন্ট যাঁর হয়েছে সেই মিসেস গ্রান্টকে আপনারা চেনেন ?”

“হ্যাঁ। উনি আমার বন্ধু। অনেকদিনের আলাপ।”

“আপনাদের সঙ্গে ওঁর শেষ দেখা হয়েছিল কখন ?”

“আজ সকালে, আমার হোটেলে। তারপর উনি ওঁর বান্ধবীর বাড়িতে যাবেন বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান।”

“বান্ধবীর বাড়িটি কোথায় ?”

মেজর মোটামুটি জায়গাটা জানালেন। পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, “সকালে ঠিক কখন উনি আপনাদের কাছ থেকে চলে এসেছিলেন ?”

“ঘড়ি দেখিনি। তবে দশটার এদিকে নয়।”

“অথচ ওঁর দুর্ঘটনা ঘটে বিকেলে। সরাসরি চলে এলে ওই স্পটে ওঁর আসতে এত দীর্ঘ সময় লাগে না। তা ছাড়া ওঁর বান্ধবীর বাড়ি যে দিকটায় বললেন, সেদিকে উনি যাননি। এই রাস্তা তার উলটো দিকে। ওঁর জ্ঞান না ফিরলে আমরা কিছু জানতে পারছি না। কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে আশা করি সহায়তা পাব।”

"নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার কথা শুনে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।" মেজর বললেন।

দ্বিতীয় অফিসার ওদের পাশপোর্ট দেখতে চাইলে সেগুলো বের করে দেওয়া হল। ভদ্রলোক ওই দুটো উলটে-পালটে দেখে নম্বর নোট করে নেওয়া মাত্র একজন নার্স দরজায় এসে দাঁড়ালেন। রিসেপশনিস্ট বললেন, "আপনারা ওঁর সঙ্গে গিয়ে ঠিক তিরিশ সেকেন্ডের জন্যে চোখের দেখা দেখতে পারেন।"

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "ওঁর সেন্স কি ফিরেছে?"

নার্স মাথা নেড়ে নীরবে না বললেন। পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার হতাশায় কাঁধ ঝাঁকালেন। অর্জুন আর মেজর প্রায় নিঃশব্দে নার্সকে অনুসরণ করে অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে ইমার্জেন্সি লেখা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই নার্স তাদের কাচের জানলার কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

দুটো সাদা ধবধবে বিছানা। একটিতে একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে। অপরটিতে মিসেস গ্রান্ট। মাথায় ব্যান্ডেজ। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই অর্জুনের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ ছিটকে উঠল। যদিও মাঝখানে জানলার পরিষ্কার কাচ, তবু দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। মেজর অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, "আরে এ কী!"

অর্জুন ওঁর হাত আঁকড়ে ধরল। তারপর নিচু গলায় বলল, "চুপচাপ বাইরে বেরিয়ে চলুন।"

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিছানায় যিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন সেই মহিলা কোনওকালেই মিসেস গ্রান্ট নন।

মার্শাল-সাহেবের ঠিকানা পুলিশ-অফিসারকে জানিয়ে ওরা যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, তখন আলো মরে গেছে কিন্তু অন্ধকার নামেনি। এর মধ্যে কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীটাকে আরও ঝকঝকে লাগছে। বাস-স্টপে এসে দাঁড়াতেই মেজর মুখ খুললেন। যেন এতক্ষণ কথা না বলতে পেরে দমবন্ধ হয়ে আসছিল ওঁর, "কী ব্যাপার বলো তো? আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

অর্জুন বলল, "আমিও পারছি না।"

"মিসেস গ্রান্ট গাড়ি চালিয়ে এদিকে এলেন, অ্যাক্সিডেন্ট করলেন, অথচ তাঁর জায়গায় অন্য মহিলা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রইল, তাজ্জব ব্যাপার। কিন্তু পুলিশকে আমাদের বলা উচিত ছিল যে, উনি মিসেস গ্রান্ট নন। তুমি চেপে যেতে বললে কেন?"

অর্জুন এই প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিল। জবাব দিল, "পুলিশ গাড়ির

কাগজপত্র দেখে ধরে নিয়েছে, উনি মিসেস গ্রান্ট। যদি অন্য কারও সেই ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমরা পুলিশকে জানালেই সেটা তাদেরও জানতে অসুবিধে হবে না। এইটে আমি এখনই চাইছিলাম না। তা ছাড়া যে ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন, তাঁকে আপনি কি আগে কখনও দেখেছেন ?"

মেজর মাথা নাড়লেন, "না। অবশ্য ব্যান্ডেজ থাকায়..., তবু, না! কিন্তু কেন বলো তো ?"

"সেই জন্যেই আমি বলিনি। আমার পরিষ্কার মনে হল, উনি মিসেস গ্রান্টের ব্ল্যাকপুলের বান্ধবী। খুব মিল আছে ওঁদের চেহারায়। আপনি এবার মনে করে দেখুন তো!"

মেজরের চোখে-মুখে দাড়ি সত্ত্বেও চিন্তিত ভাবটা পরিষ্কার ফুটল। তারপর তিনি ঘড়ি দেখে পা বাড়াতেই অর্জুন বাধা দিল, "আরে, কোথায় যাচ্ছেন ?"

"তোমার কথা মনে হচ্ছে অর্ধেক ঠিক। আর একবার নিজের চোখে দেখে আসি।"

"পাগল হয়েছেন! এবার দেখতে চাইলে ওরা কারণ জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেবেন ? তার চেয়ে আমাদের এখনই ব্ল্যাকপুলে ফিরে যাওয়া উচিত," অর্জুন বলল।

"ব্ল্যাকপুলে!" মেজর আঁতকে উঠলেন, "পাগল! দুপুর থেকে মার্শালি আমার অপেক্ষায় বসে আছে। জীবনে এই প্রথমবার আমি সময় রাখতে পারলাম না। আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে।"

অর্জুন অনেক দূরে বাসের হেডলাইট দেখতে পেল, "আপনার বান্ধবীর ঠিক কী হয়েছে, তা না জেনেই চলে যাবেন ? আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয় ?"

"কী কাজ ?" মেজরও বাসটাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

"আপনি আজ চলে যান মার্শালি-সাহেবের কাছে। আমি ব্ল্যাকপুলে ফিরে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে কাল আপনার কাছে আসছি।"

"মাথা খারাপ! তুমি ইংল্যান্ডের কিস্‌সু চেনো না। তারপর যখন মনে হচ্ছে কেউ বা কারা আমাদের পেছনে লেগেছে, তখন একা যাওয়া উচিত হবে না।"

"আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন।"

"বলছ ?" কথা বলতে-বলতে বাসটা এসে দাঁড়াল স্টপে। মেজর দু'পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন, "না হে। তোমাকে ছেড়ে আমি একা যেতে পারব না।"

ব্ল্যাকপুলে যখন ওরা ফিরে এল তখন ঘড়িতে রাত বেশি না হলেও শহরটার দিকে তাকিয়ে মনে হল মাঝ-রাত পেরিয়ে গেছে। একটিও মানুষ নেই রাস্তায়। দোকানপাট বন্ধ। এমনকী গাড়ির চলাচল খুব কমে

এসেছে। বাস টার্মিনাল থেকে বের হওয়া মাত্র ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে ঠাণ্ডা নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। মেজর বললেন, আগের হোটেলটা অনেক দূরে, কাছে-পিঠে কোথাও ওঠা যাক।"

কয়েক-পা এগিয়েও যখন কোনও সাইনবোর্ড চোখে পড়ল না, তখনই বৃষ্টির দাপট বাড়ল। কোনও রকমে একটা ছাউনির তলায় মাথা বাঁচাতে ঢুকে গেল ওরা দুজনে। মেজর বাইরের বৃষ্টি, অন্ধকার-নামা নির্জন রাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আইডিয়াল নাইট ফর ক্রাইম।"

এই সময় দুটো হেডলাইট বৃষ্টির ফোঁটা কাটতে-কাটতে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছিল ওপাশের রাস্তা ধরে। গাড়িটা ওদের পাশ কাটিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে স্থির হয়ে রইল। মেজর বললেন, "মনে হচ্ছে পুলিশের জিপ। রোঁদে বেরিয়েছে।"

পুলিশ শব্দটা শুনে অর্জুন ভাবল তা হলে ওদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়, কাছাকাছি ভাল হোটেল আছে কি না। তারপরেই মনে হল জিপটা আলো নিভিয়ে চুপচাপ জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আর তখনই জিপের হেডলাইট দু'বার জ্বলল এবং নিভল। অর্জুন ধন্ধে পড়ল। সমুদ্রের জলের ওপর হেডলাইটের আলো সাঙ্কেতিকভাবে ফেলার কোনও মানে আছে কি? পুলিশ হলে এমন কাজ করবে কেন? কয়েক মিনিট বাদেই একটা মোটর-বোটের আওয়াজ পাওয়া গেল। সমুদ্রের ওপর অন্ধকার এবং বৃষ্টি মেশামেশি হওয়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই মোটর-বোটের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই জিপ পাক খেয়ে শহরের দিকে ফিরে গেল দ্রুত গতিতে। মেজরও যেন ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। অর্জুনের হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, "পুলিশ নয়। এরা কিছু পাচার করল বলে মনে হচ্ছে। দেখবে নাকি?"

"এখন দেখে আর কী হবে?" অর্জুন উৎসাহিত হচ্ছিল না।

মিনিট-দশেক পরে ওরা একটা গেস্ট হাউসের নোটিস-বোর্ড দেখতে পেল। গেট খুলে বাঁধানো চাতাল ডিঙিয়ে কাঠের বাংলো টাইপ বাড়ির দরজায় মেজর আঘাত করলেন। অর্জুন বলল, "কলিং বেলের বোতামটা টিপুন।"

কিন্তু বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ওপাশের একটা জানলা খুলে গেল। একজন বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, "হু ইজ দেয়ার? ওঃ! চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে দুটো শার্কের পেট ভরে যাবে, কিন্তু মাথায় ঈশ্বর পুঁটিমাছের খাবারও দেয়নি? বোতামটা দেখতে পাচ্ছ না?"

"কী? আমি শার্ক?" মেজর হুঙ্কার ছাড়লেন বাড়ি কাঁপিয়ে।

অর্জুন খপ করে মেজরের হাত ধরল, "না, না, আপনাকে উনি শার্ক বলেননি।"

বৃদ্ধা বললেন, "বলাই উচিত ছিল। না বলে ভুল করেছি। গলার স্বর

দ্যাখো, জীবনে মিষ্টি কী জিনিস বোধহয় চেখেও দ্যাখেনি।"

মেজর বললেন, "মিষ্টি ? মিষ্টি দেখাচ্ছেন আমাকে ? আপনার গলা কী ? পিলে চমকে যায়। চলো, অর্জুন ! এখানে থাকব না। অভদ্র, সভ্যতা শেখেনি।"

অর্জুন তখনও হাত ছাড়েনি, বলল, "উনি একজন মহিলা, কী বলতে কী বলেছেন।"

বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, "ঠিক বলেছি। তবে শার্ক বলিনি। শার্কের খাবার বলেছি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "শুনলেন তো। আপনাকে শার্ক বলেননি।"

"অ।" মেজর একটু বিচলিত হলেন, "শার্কের খাবার ! শার্কের খাবার আবার কী ? কী খায় শার্ক ?"

"আচ্ছা জ্বালা। এই হুমদো লোকটার সঙ্গে কে কথা বলতে চাইছে ! এই যে খোকা, তোমাকে বলছি, দয়া করে বলবে রাত দুপুরে দরজা ভাঙতে চাইছ কেন ?" বৃদ্ধার গলার স্বর নীচে নামল।

অর্জুন বলল, "ওই সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলাম দিদিমা, আমাদের থাকার ঘর চাই।"

"তাই বলো। এই ছোট্ট কথাটা ছোট্ট করে বললেই হয়। শরীর বড় হলেই যে বেশি কথা বলতে হবে এমন দিব্যি কে দিয়েছে। একটা ঘর হলেই চলবে ? সকালে ব্রেকফাস্ট পাবে রুটি ডিম জ্যাম কর্নফ্লেক্স আর দুধ। ব্যস। মাথা-পিছু আট পাউন্ড।"

মেজর বোধহয় শরীর নিয়ে কথা বলায় আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন তার আগেই বলে উঠল, "খুব ভাল। আপনার মতো মানুষ হয় না দিদিমা।"

"সে-কথা বলো।" গজগজ করতে-করতে বৃদ্ধা দরজা খুলে একবার আড়চোখে মেজরকে দেখে বাঁ হাত তুলে ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওরা ঘরে ঢুকতেই মেজর বললেন, "অন্য সময় এবং পরিস্থিতি এরকম না হলে আমি কিছুতেই এখানে থাকতাম না। যাক, দুটো বিছানা আছে তা হলে।"

ঘরটি চমৎকার। কাচের জানলায় দাঁড়ালে সমুদ্র দেখা যাবে, যদিও এই বৃষ্টির রাত্রে বাইরেটা ঘষা অন্ধকার। অর্জুন তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে ভেজা জামা পালটে নিয়ে মাথা মুছে নিল। এইসময় বাইরে বৃদ্ধার গলা বাজল, "সেই ভাল ছেলেটা কোথায় ?"

মেজর জবাব দেওয়ার আগেই অর্জুন বেরিয়ে এল। এসে হাঁফ ছাড়ল। মেজর ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। বৃদ্ধা প্রশ্ন করা সত্ত্বেও চোখ খোলেননি। অর্জুনকে দেখে বৃদ্ধা বললেন, "হুট করে ঢুকে গেলেই তো চলবে না। এই খাতায় লিখতে হবে কোত্থেকে এসেছ, নাম-ধাম। এত

রাত্রে কোত্থেকে উদয় হলে ?"

মেজর বললেন, "জাহান্নাম থেকে।"

"তা বুঝেছি। সেটাই তো উপযুক্ত জায়গা।"

অর্জুন বলল, "আমাদের এক পরিচিতা মহিলার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে খবর পেয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি বোস্টন থেকে। আমি সই করলেই হবে তো ?"

"বোস্টন থেকে হঠাৎ এত লোকজন এখানে আসছে ?"

"আরও লোক এসেছে বুঝি ?"

"ওই তো প্রোফেসর হ্যাচ এবং তাঁর বন্ধু জিপ নিয়ে এসেছেন।"

"জিপ নিয়ে ?"

"হ্যাঁ। কীসব রিসার্চের ব্যাপার।"

সইটই হয়ে গেলে বৃদ্ধা আর-একবার মেজরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে দুজনের পেটে কিছুই পড়েনি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আমাদের কিছুই খাওয়া হয়নি।"

"আমার কিছু করার নেই। কাল ব্রেকফাস্ট অবধি না খেয়ে থাকো।" বৃদ্ধা চলে গেলেন কাঠের পাটাতনে শব্দ করে।

মেজর এবার উঠে বসলেন, "এ-ঘরে টেলিফোনও নেই। মিসেস গ্রান্টের খবর নেবার জন্যে আমরা ব্ল্যাকপুলে ফিরে এসেছি—ওই বুড়ির গালাগাল শুনতে নয়।"

অর্জুন বলল, "কিন্তু এত রাত্রে যাবেন কী করে ? রাস্তায় তো কোনও গাড়ি নেই।"

মেজর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কাঁধ নাচালেন। তারপর উঠে বাথরুমে চলে গেলেন। খাবারের কথা ওঠার পর অর্জুনের খিদেটা যেন চাগিয়ে উঠল। সিগারেট ধরাতে আরও বিস্বাদ লাগল সেটা। শীত বেড়েছে বেশ। সে এপাশের জানলায় এল। হলদে আলোয় পোর্টিকোটা দেখা যাচ্ছে। তার এক কোণে একটা জিপ। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল অধ্যাপক হ্যাচ নামের লোকটা বোস্টন থেকে জিপে এসেছে এখানে বন্ধুকে নিয়ে। এই লোকটা কে ? অধ্যাপকরা কি এদেশে জিপ চালান ?

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার মিনিট-তিনেক বাদেই মেজরের নাক ডাকতে লাগল। পেটে খাবার না পড়া সত্ত্বেও একটি মানুষ এত তাড়াতাড়ি কী করে ঘুমোতে পারে ? অর্জুনের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মিসেস গ্রান্টের নিশ্চয়ই এমন কোনও বিপদ ঘটেছে যা জানাতেই ওঁর বন্ধু মার্শাল-সাহেবের কাছে যাচ্ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই জেনেছিলেন অর্জুনরা মার্শাল-সাহেবের কাছেই গিয়েছে। নইলে ওই রাস্তায় ভদ্রমহিলার যাওয়ার অন্য কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কী ঘটেছে মিসেস গ্রান্টের ?

বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করল অর্জুন। আর এইসময় অমল সোমের কথা মনে পড়ল। অমলদা কি এখনও জলপাইগুড়িতে ? এই পরিস্থিতিতে পড়লে অমলদা কী করতেন ? অর্জুন চোখ খুলল। তারপর তড়াক করে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। সমস্ত বাড়ি অন্ধকারে চুপচাপ। সে বাথরুমে ঢুকে পড়ল আলো না জ্বেলে। এদিকে একটা দবজা দেখেছিল খানিক আগে। জমাদারের জন্যেই সম্ভবত করা হয়েছে। সেইটে খুলে ও নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা যেন শরীরে করাত চালাচ্ছে। পোর্টিকো ডিঙিয়ে অর্জুন জিপের গায়ে পৌঁছে গেল। ওপবে শেড থাকা সত্ত্বেও জিপের শরীরে জল। তার মানে এটি বেশি আগে ফেরেনি। চাকায় হাত দিয়ে সমুদ্রের বালি পেল অর্জুন। জিপের ভেতরে উঁকি মারতে গিয়ে চমকে উঠল সে।

গাড়ির সিটের ওপর রাখা একটা বেতের ঝুড়ি থেকে হিসহিস শব্দ বের হচ্ছে।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। বৃষ্টি থেমে গেছে। পৃথিবীতে ঘন কুয়াশা নেমে এসেছে। আর একমাত্র গাড়িব ভেতর থেকে ছিটকে আসা ক্রুদ্ধ শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। অর্জুন কেঁপে উঠল। যতটা না ঠাণ্ডার কারণে ঠিক ততটাই ওই শব্দের তীব্রতায়। সে বুঝতে পারছিল না ঝুড়িতে কী রয়েছে ? প্রোফেসর হ্যাচ কেন এইরকম বেতের ঝুডি সিটের ওপর রেখে যাবেন যার ভেতর একটি রাগী প্রাণী গর্জে যাচ্ছে ! নাকি অর্জুনের উপস্থিতি টের ,পয়ে ওই গর্জন বাড়ছে ?

টুক করে একটা আলো জ্বলে উঠল দোতলার জানলায়। কুয়াশা মাখা কাচে আলো ঝাপসা দেখাচ্ছে। অর্জুন চট করে সরে এল গাড়িটার কাছ থেকে। গ্যারাজের থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দ্বিতীয়বার জানলার দিকে তাকাতেই একটা অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পেল। সে সরে আসায় ঝুড়ির ভেতরের আওয়াজ কমে এসেছে। এখন পনেরো ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়েও সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। এর পরেই কাঠের দরজা খোলার শব্দ হল। অর্জুন আর ঝুঁকি নিল না। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব ততটা আওয়াজ বাঁচিয়ে সে ঘরে ফিরে এল। দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে আসতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। লম্বা ঝাপসা মূর্তি। আধা অন্ধকারে মুখ দেখার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু সে শিস শুনতে পেল। ছায়ামূর্তি যেন শিস দিয়ে প্রাণীটিকে শান্ত করতে চাইছে। তারপর লোকটা কয়েক পা এগিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। সম্ভবত জরিপ করতে চাইল চারপাশ। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অর্জুন লোকটাকে যখন ফিরে যেতে দেখল, তখন ঘড়িতে অনেক রাত।

মেজর জানান দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বেশি খিদে পেলেও যে মাঝে-মাঝে গভীর ঘুম আসে তা এখন ওঁকে দেখলে বোঝা যাবে। এই মাঝরাতে

মেজরকে জাগিয়ে ঘটনাটা বলা ওঁর খিদে-বোধটাকে আবার ফিরিয়ে আনা। অর্জুন নিজের বিছানায় ফিরে এল। কিন্তু ঘুমেবকোনও চিহ্ন নেই। এখন মাথার ভেতরে প্রশ্নগুলো কিলবিল করছে। মিসেস গ্রান্টের গাড়ি নিয়ে তাঁর বন্ধু ওই হাইওয়ে ধবে কোথায় যাচ্ছিলেন ? ভদ্রমহিলা কি সত্যিই মিসেস গ্রান্টের বন্ধু ? কারণ ব্যান্ডেজের ফাঁকে খুব অল্পই সে দেখতে পেয়েছিল। কাল সকালেই মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সমুদ্রের ধারে ওইরকম রহস্যজনকভাবে প্রোফেসর হ্যাচ নামক ভদ্রলোকটি কেন তাঁব জিপ নিয়ে গিযেছিলেন ? সেই জিপের মালিক যে প্রোফেসর হ্যাচ তার অবশ্য প্রমাণ নেই। জিপের চাকায এ-অঞ্চলের বালি লাগতেই পারে। কিন্তু ভদ্রলোক গাডিব সিটে একটি ক্রুদ্ধ প্রাণীকে ঝুড়িতে বন্দী কবে রেখেছেন কেন ? সাপ কিংবা বেজি ঝুড়িতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি এদেশে বেআইনি নয় ? অধ্যাপকরা এসব পুষবেন কেন ? তা ছাড়া উনি এসেছেন বোস্টন থেকে। একই সঙ্গে ওঁর আসাটা কি কাকতালীয ? আব তারপবেই খেয়াল হল প্রাণীটি যে স্বরে গর্জন করছিল তাতে তো কারও ঘুম ভাঙেনি। ছায়ামূর্তি যদি প্রোফেসর হ্যাচ হন, তা হলে ওঁর ঘুম ভাঙল কী কবে ? ওঁকে কেন এই শীতের মধ্যেও মাঝ রাতে যেতে হল খোঁজখবর করতে ? কী করে ভদ্রলোক বন্ধ ঘরে বসেও এই শব্দ শুনতে পেলেন। এই মুহূর্তে অমল সোমের কথা মনে পড়ে গেল তার। অমলদা থাকলে যে কী ভাবে এগোতেন কে জানে! অর্জুন খুব অসহায় বোধ করছিল।

ঘুম ভাঙল বেশ দেবিতে। কম্বল সরিয়ে অর্জুন দেখল মেজর বিছানায় নেই। বিদেশে এসে তাকে কতগুলো নিয়মে অভ্যস্ত হতে হয়েছে যা জলপাইগুডিতেকোনওদিন চিন্তাও করেনি। যেমন বাথরুমের মেঝেতে জল ফেলা যাবে না, কারণ তাতে কার্পেট ভিজবে। স্নান করতে হলে পরদা টেনে বাথটবে উঠে পড়ো। কিন্তু এত আরামে ঠাণ্ডা-গরম জল মিশিয়ে স্নান করার কথা সে কি কখনও ভেবেছিল! আর এদেশের বাথরুমের কায়দাকানুন মাথা খারাপ করে দেয়। আমেরিকায় একবার টয়লেটে ঢুকে ফ্ল্যাশের বোতাম খুঁজে পেতে তাকে কি কম নাজেহাল হতে হয়েছিল ? অথচ জিনিসটা ছিল পায়ের তলায়, একটু চাপ দিতেই হুড়মুড়িয়ে জল নেমেছিল।

একেবারে স্নান করে বাইরে বেরোতেই শরীর বেশ তাজা লাগল। এবং তখনই দরজায় শব্দ বাজল। চুল আঁচড়ানো নেই। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে সেটাকে ভদ্রস্থ করে দরজা খুলতেই বৃদ্ধাকে দেখতে পেল সে। এখন বৃদ্ধার স্কার্টের ওপর একটা সাদা অ্যাপ্রন বাঁধা। হেসে বললেন, "গুড মর্নিং! বাঃ, তোমার স্নান হয়ে গেছে! বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে। আমার তো বেরিয়ে পড়তে খুব ইচ্ছে করছিল। তা কাল রাত্রে ঘুম

হয়েছিল তো ? হবে কী করে ! তোমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি। দয়া করে ডাইনিং রুমে চলে এসো।”

কথাগুলো এমন তোড়ে বলে গেলেন যে, বোঝা গেল উত্তরের জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর নজর পড়েছে মেজরের বিছানার পাশে ছোট টেবিলের ওপর রাখা চুরুটের প্যাকেটের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি, “ইশ। কীভাবে বোকা লোকগুলো পয়সা আর শরীর নষ্ট করে। ওগুলো নিশ্চয়ই তুমি খাও না ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল। ভদ্রমহিলা বললেন, “কক্ষনো খেয়ো না। তোমাকে দেখলে বেশ ভাল ছেলে বলে মনে হয়। এবার তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো।”

অর্জুন কিন্তু-কিন্তু করে বলল, “দিদিমা.... ।” সঙ্গে-সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়ে মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, “কাল থেকে শুনছি তুমি দিদিমা-দিদিমা করছ ! আমাব নাম এলিজাবেথ, তুমি আমাকে লিজা বলে ডাকতে পারো। অবশ্য অনেকেই আমায় মিসেস ব্রাউন বলে ডাকে।”

ষাট বছরের একজন মহিলাকে সে নাম ধরে ডাকবে কী করে ? বরং মিসেস ব্রাউন বলে ডাকা অনেক বেশি সুবিধেজনক। কাল রাত্রে যাঁকে অনেক বেশি বয়স্কা বলে মনে হচ্ছিল আজ সকালে ততটা মনে হচ্ছে না। তবে এদেশের বৃদ্ধারা নিজেদের যতটা শক্ত-সমর্থ রাখতে চান ততটা আমাদের দিদিমা-ঠাকুমারা চান না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “মিসেস ব্রাউন ! আমার সঙ্গী মেজরকে কি আপনি আজ সকালে দেখেছেন ?”

“না দেখলেই ভাল হত। দিনটা যে কেমন যাবে তাই ভাবছি।” মিসেস ব্রাউন মুখ ঘোরালেন।

অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। সকালে উঠে কারও-কারও মুখ দেখা নাকি অযাত্রা, এমন বিশ্বাস ভারতবর্ষের মানুষের থাকে। কিন্তু সেটা ইংল্যান্ডের একজন বয়স্কা মহিলাও যে বলবেন তা কে জানত।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল আবার, “উনি কি কিছু বলে গিয়েছেন ? আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম।”

“হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করল ব্রেকফাস্ট কখন পাওয়া যাবে ! আমি বললাম, আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত এখানে ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায়। সঙ্গে-সঙ্গে উনি রওনা হয়ে গেলেন। যতই পেটে খিদে থাকুক অত সকালে কোনও ভদ্রলোক খেতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না।” মিসেস ব্রাউন কয়েকবার মাথা নাড়লেন।

অর্জুন বলল, “কিন্তু আমাকে তো ওঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, মানে ব্রেকফাস্টের জন্যে।”

মিসেস ব্রাউন এগিয়ে এলেন কয়েক পা, “আমি তোমার ভদ্রতাবোধের

প্রশংসা করছি, কিন্তু এর দাম দিতে তুমি আজ সকালের ব্রেকফাস্টটা মিস করতে পারো।" কথা শেষ করে প্রায় ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

অর্জুন বুঝতে পারছিল না কী করবে। খিদে লেগেছে খুব। গায়ে জল পড়ার পর সেটা আরও চিড়বিড়ে হয়েছে। মেজর যে কোথায় চলে গেলেন না জানিয়ে! হঠাৎ মনে পড়তেই সে দৌড়ে জানলার কাছে ছুটে গেল। জিপটা নেই। বোকার মতো সে কিছুক্ষণ শূন্য পার্কিং প্লেসটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

মিনিট পাঁচেক পরে সেজেগুজে অর্জুন ঘরের বাইরে পা রাখল। সদর দরজার পাশেই যে খাওয়ার ঘর, তা কাল রাত্রে বুঝতে পারেনি। সেখানে এখন দুটো পরিবার খাবার খাচ্ছে। মাঝখানের টেবিলে অনেকগুলো প্লেটে পাউরুটি, জেলি, মাখন, মাংস সেদ্ধ, দুধ, কনফ্লেক্স, হ্যামের ফালি এবং আপেল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেখামাত্র জিভে জল এল এবং সেইসঙ্গে মেজরের ওপর রাগ। ভদ্রলোক না জানিয়ে নিজে খিদে মেটাতে চলে গেলেন। এই নিজের খাবার নিজে নাও কায়দাটা খুব ভাল। যত ইচ্ছে খাওয়া যায়, চাইবার লজ্জাটা আসে না। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে দরজার দিকে পা বাড়াতেই খুশি হল অর্জুন। শিস দিতে-দিতে মেজর ফিরছেন। মাথায় টুপি, সমস্ত শরীর অলেস্টার জাতীয় পোশাকে ঢাকা। ওকে দেখামাত্র হাত নেড়ে চিৎকার করলেন, "সুপ্রভাত।"

অর্জুন মাথা নেড়ে অভিযোগটা জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মেজর বললেন, "মিসেস গ্রান্টের কিছু হয়নি।"

থতমত হয়ে গেল অর্জুন, "আপনি গিয়েছিলেন?"

মেজর দাড়িতে হাত বোলালেন, "নো। টেলিফোনে কথা বললাম। আমরা এখনও এখানে আছি শুনে উনি অবাক। ভদ্রমহিলা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। যাচ্ছ কোথায়?"

"আপনাকে খুঁজতে। মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী....?" অর্জুনের প্রশ্নটা শেষ করা হল না। তার আগেই মিসেস ব্রাউন উদিত হলেন, "এই যে, বয়সের সঙ্গে যে বোধবুদ্ধি চলে যাবে এটা কেমন কথা? এই বাচ্চা ছেলেটা কাল থেকে না খেয়ে রয়েছে সেটা মনে নেই? নিজের তো খেতে যাওয়া হয়েছিল, আর এ এত ভাল যে একা খেতে যাচ্ছে না। যাও বাছা, তুমি বসে পড়ো।" শেষের কথাগুলো অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে।

কিন্তু ততক্ষণে মেজর তিড়বিড়িয়ে উঠেছেন, "কী? আমি খেয়ে এলাম? আপনি দেখেছেন আমাকে খেতে? আমি গিয়েছিলাম মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে। এমন একটা জায়গা করেছেন যেখানে টেলিফোনও নেই। মিসেস গ্রান্ট তো আপনারই বয়সী অথচ কত নরম মনের মানুষ।"

"এখানে টেলিফোন নেই ? আমার অফিস-ঘরে টেলিফোন নেই ? কিন্তু সেটা আর আপনাকে ব্যবহার করতে দেব না। শুনুন, আপনি নিশ্চয়ই অবিবাহিত ?" চোখ ছোট করলেন মিসেস ব্রাউন।

"হ্যাঁ, তাতে কী হল ?" মেজর এবার স্তিমিত।

"ঠিক ধরেছি। অবিবাহিত বুড়োগুলো এই রকম হয়। আমাকে মিসেস গ্রান্ট দেখাচ্ছে! মিসেস গ্রান্ট ? নামটা বেশ চেনা লাগছে। ও, প্রোফেসর হ্যাচ ওর বন্ধুকে বলছিল।" মিসেস ব্রাউন চোখ বন্ধ করে বললেন।

অর্জুন উৎসাহিত হল, "প্রোফেসর হ্যাচ কী বলছিলেন মিসেস ব্রাউন ?"

"বেশি কিছু শুনিনি। প্রোফেসর বলছিলেন, ভদ্রমহিলার খবর নিতে। আমাকে দেখে আর কথা বাড়াননি।"

"প্রোফেসর হ্যাচ কোথায় ?"

"খুব ভাল মানুষ। আজ অবধি সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। বলেছেন, ফিরলে আবার আমার এখানেই থাকবেন। কেউ একবার এখানে থাকলে তো আর অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না।"

মেজর খপ করে অর্জুনের হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে এলেন খাওয়ার ঘরে। ব্যাপারটা সরাসরি মিসেস ব্রাউনকে উপেক্ষা করা। অর্জুনের খারাপ লাগল। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কিছু করার নেই। সে শুধু মেজরকে বলল, "আপনি ওঁকে পছন্দ করছেন না কেন ?"

"পছন্দ ? আমি করছি না ? তুমি কি অন্ধ ? দেখলে না আমাকে দেখামাত্রই উনি কীভাবে বাঁকা-বাঁকা কথা বললেন ? কালরাত্রে দ্যাখোনি ? নাও, খাওয়া শুরু করা যাক।"

একে ব্রেকফাস্ট না বলে ব্রাঞ্চ বলাই ঠিক। যে পরিমাণ খাবার মেজর নিয়েছেন তা দুপুরেও খেতে পারত না অর্জুন। অবশ্য সে নিজেও কম নেয়নি। এবং বিকেলের আগে খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই খাবারটা ঘর-ভাড়ার মধ্যেই পড়ছে। কিন্তু অর্জুনের আর তর সইছিল না। মেজর মুখভর্তি খাবার নিয়ে চোখ বন্ধ করে চিবিয়ে যাচ্ছেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিসেস গ্রান্টের বান্ধবীর খবরটা উনি জেনেছেন ?"

দু'বারের চেষ্টায় মেজর কথা স্পষ্ট করলেন, "টেলিফোনটা তো সেই মহিলা প্রথমে ধরেছিলেন।"

অর্জুন হাঁ হয়ে গেল, "মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী ?"

মাথা নাড়লেন মেজর। খাবারটা গলা দিয়ে নামিয়ে বললেন, "উনিই তো মিসেস গ্রান্টকে ডেকে দিলেন।"

"তা হলে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যিনি শুয়ে

আছেন তিনি কে ?”

“নামটা জানি না। তবে তিনিই মিসেস গ্রান্টের গাড়িটা চুরি করেছেন।”

“গাড়ি চুরি ? এদেশে হয় ?”

এবার মেজর এমন জোরে হেসে উঠলেন ওপাশের টেবিলের মানুষেরা চমকে এদিকে তাকাল। মেজর বললেন, “পৃথিবীর সব দেশের চোর-ডাকাত-খুনির চেহারা একরকমের। যা হোক, মিসেস গ্রান্ট পুলিশের কাছে নালিশ করেছিলেন। কাল মাঝরাত্রেই পুলিশ খবরটা ওঁকে পৌঁছে দিয়েছে। উনি একটু বাদেই এখানে আসছেন। তোমার দেখছি স্নানটান হয়ে গিয়েছে। আমি খেয়েদেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।”

“মিসেস গ্রান্ট এখানে কেন আসছেন ?”

“বাঃ। উনি দেখতে চান কে চুরি করেছে। গাড়িটাও ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। আমরা ওই পথে যাব যখন, তখন উনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।” মেজর এবার খাওয়ায় মন দিলেন।

অর্জুন ঠিক করল মিসেস গ্রান্ট এলে ওঁকে নিয়ে প্রথমে ব্যাঙ্কে যাবে। লকারে কী আছে না জেনে ব্ল্যাকপুল ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না।

খাওয়া শেষ করে মেজর নিজের ঘরে চলে গেলে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। মেয়ে গাড়ি-চোর কেন মিসেস গ্রান্টের গাড়ি চুরি করে ওই পথে যাবে এবং কে তাকে দুর্ঘটনার মধ্যে ফেলল এই রহস্য সেই মহিলার সঙ্গে কথা না বললে জানা যাবে না। হয়তো এটা চোরেদের রেষারেষি। জিপটা গত রাত্রে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে নীচে তাকাল সে। জায়গাটা বাঁধানো না হওয়ায় জিপের চাকার দাগ এখনও রয়ে গেছে। সে মন দিয়ে চাকার দাগগুলো লক্ষ করল। ডান দিকের একটা চাকার তলায় নিশ্চয়ই খানিকটা অংশ কাটা রয়েছে কোনও কারণে। ছাপটা পড়ার সময় সেই অংশ মাটিতে চেপে বসেনি।

অর্জুন ধীরে-ধীরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই সকালেও চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। রোদ উঠেছে বেশ মিঠে। এমনকী, সমুদ্রটার চেহারাও ঝকঝকে দেখাচ্ছে। ওদিকের ফুটপাথ ধরে একজন সর্দারজি স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে হাঁটছেন। ওদের দেখে বড় ভাল লাগল অর্জুনের। এই বিদেশে একজন ভারতীয়কে দেখলে আত্মীয় বলে মনে হয়। চণ্ডীগড় আর জলপাইগুড়ি যেন পাশাপাশি হয়ে যায়।

পেট ভর্তি, শরীরে আরাম, অর্জুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর পায়চারি করার মতো হাঁটতে-হাঁটতে একটা প্লে হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল। এই সকালেই বেশ ভিড় জমে গেছে সেখানে। ভেতরে ঢুকে মজার খেলাগুলো দেখতে লাগল সে। একটা বক্সের মধ্যে ছোট-ছোট নানান প্রয়োজনের জিনিস আছে। একটা দশ পেনির কয়েন গর্তে ফেললে

চিমটে নেমে আসবে। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে চিমটে দিয়ে যে-কোনও একটা জিনিস তুলে নাও। চিমটেটা আপনি উলটো দিকে চলে গিয়ে গর্ত দিয়ে জিনিসটা বের করে দেবে। দেখা যায় যেসব জিনিসের দাম দশ পেনির কম সেগুলোকেই ধরা সম্ভব হয়। বেশি দামের জিনিসগুলোকে স্পর্শ করেই চিমটেটা পিছলে যায়। অর্জুন সরে এল। একটা বিরাট টেবিল টেনিসের মতো বোর্ডে দশটা প্লাস্টিকের ঘোড়া একসঙ্গে দৌড়চ্ছে। দশ পেনি ফেলে পছন্দমতন ঘোড়ার নাম্বারের বোতাম টিপে দেখতে হবে কে জিতছে। জিতলে এক-দেড় পাউন্ড পর্যন্ত পাওয়া যাবে। যন্ত্রচালিত এই ঘোড়দৌড় দেখতে বেশ ভিড়।

এইসময় অর্জুন মেয়েটিকে দেখতে পেল। সেই মেয়েটি যে সমুদ্রের ধারে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কালো মেয়েটি ওর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সে বসে আছে একটা চেঞ্জ কাউন্টারে। যাদের দশ পেনির দরকার তারা ওর কাছে গিয়ে পাউন্ড ভাঙিয়ে নিচ্ছে। কাউন্টার ফাঁকা হতে অর্জুন এগিয়ে গেল। গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন?"

মেয়েটি গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "ভাল। কত পাউন্ড ভাঙাবেন আপনি?"

"একটাও না। সেদিন আমাকে সাবধান করে দেবার জন্য ধন্যবাদ।"

"আমি যা শুনেছিলাম তাই বলেছি। লোক দুটোকে আজ সকালেও আমি দেখেছি। ইয়েস স্যার?" মেয়েটি পাউন্ড ভাঙাতে আসা এক বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়াল। অর্জুন সরে এল। দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। কোনও সন্দেহজনক মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ল না।

মিসেস গ্রান্ট পৌঁছবার আগেই ওবা ভাড়া মেটাতে মিসেস ব্রাউনের অফিস-ঘরে পৌঁছল। গম্ভীর মুখে নোটগুলো নিয়ে মহিলা অর্জুনকে বললেন, "আজ তোমরা বোস্টন ফিরে যাচ্ছ?"

অর্জুন জবাব দিতে গিয়ে মুখ তুলতেই চমকে উঠল। দেওয়ালে একটা বাঁধানো ছবি। সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "ছবিটা কার?"

মিসেস ব্রাউন কাঁধ ঝাঁকালে, "লোকটার সঙ্গে এককালে আমার বিয়ে হয়েছিল।"

"উনি।" ইতস্তত করল অর্জুন।

"না-না। সেটা হলে তো খুশি হতাম। জোচ্চুরি করে জেলে গিয়েছিল। ছাড়া পাওয়ার পর আমার এখানে এসেছিল। আমি ঢুকতে দিইনি। ওরকম হাড়বজ্জাত লোক আমি জীবনে দেখিনি।"

মেজর হতভম্ব হয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখ গোল হয়ে এসেছিল। অর্জুন তাঁর কনুই ধরে প্রায় টানতে-টানতে বাইরে বের

করে আনল। মেজর বললেন, "আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।"

অর্জুন হাসল, "তা হলে বুঝলেন, উনি খামোখা আপনাকে অপছন্দ করেননি।"

"হ্যাঁ হে। অবিকল আমার মতো দেখতে?"

"গায়ের রংটা ছাড়া।"

"তুমি ভাবতে পারো, আমার মতো দেখতে একটা লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "সামনের দিকে নয়, আমাদের সামনেই।"

লোকটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার চোখ মেজরের দিকে। মেজর যেন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আর অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। দুটো মানুষ প্রায় এক রকমের দেখতে হয় কী করে? স্বাস্থ্য, দাড়ি, চশমা। শুধু চুলের স্টাইল আর গায়ের রংটাই যা আলাদা। মানুষটি কিন্তু কথা বলল না। মেজরকে দেখতে-দেখতে পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেল। এবং তারপরেই মিসেস ব্রাউনের চিৎকার শোনা গেল, "আবার এসেছ? কতবার বলেছি যে, তোমার ছায়া মাড়াতে চাই না। না, না, একটা পেনিও পাবে না। জোচ্চোরদের সঙ্গে আমি কথা বলি না। এটা আমার পয়সায় কেনা, তোমাব কোনও অধিকাব নেই এখানে।"

মেজর মাথা নাড়লেন, "এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই চলো।"

অর্জুন বলল, "বেরিয়ে যাবেন কি? মিসেস গ্রান্টের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না?"

"অ। তা হলে তুমি একটা কাজ করো। আমাদের জিনিসপত্র বাইরে নিয়ে এসো। চমৎকার রোদ উঠেছে। সমুদ্রের হাওয়াটাও বেশ ভাল। আমি ওখানে দাঁড়াচ্ছি।" মেজব কথা শেষ করেই হনহনিয়ে এগিয়ে গেলেন।

অনেক কষ্টে হাসি চাপল অর্জুন। মেজর মিসেস ব্রাউনের ভয়ে আব গেটের এপাশে থাকতে চাইছেন না, অথচ মুখে সেটা স্বীকার করবেন না। এদিকে মিসেস ব্রাউন তখনও চিৎকার করে যাচ্ছেন। নিজেদের ঘরে যাওয়ার পথে অর্জুন দেখল ডাইনিং রুমের সামনে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। একা। যেন ওখানে দাঁড়িয়েই গালাগালগুলো শুনছে। অর্জুনকে দেখে লোকটা হাসল, "গুডমর্নিং। পাকিস্তানি?"

"নো, ইন্ডিয়ান।" অর্জুনের ইচ্ছে হল লোকটার সঙ্গে কথা বলতে।

"দিস ইজ মিস্টার ব্রাউন। হোয়াট ইজ দি নেম অব ইওর ফ্রেন্ড?"

"মেজর।"

"মেজর? মিলিটারি ম্যান?"

"হি ওয়াজ!"

লোকটা, যার নাম মিস্টার ব্রাউন, চোখ বড় করল। আর সেই সময় মিসেস ব্রাউন বেরিয়ে এলেন, "ওঃ ! তুমি আবার ওই ভাল ছেলেটার মাথা খাচ্ছ ?" প্রশ্নটা শেষ হবার আগেই মিস্টার ব্রাউন সুড়সুড় করে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল। মিসেস ব্রাউন কোমরে হাত দিয়ে যেন পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আড়চোখে মেজর মিস্টার ব্রাউনকে বেরিয়ে আসতে দেখে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সমুদ্রের গা ঘেঁষে একটা ট্রাম হুহু করে বেরিয়ে গেল। ঠিক তারই মতন দেখতে একটা লোক এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়। ব্রাউন যে সোজা তার সামনে এসে দাঁড়াবে, তা তিনি ভাবেননি, "হ্যালো, তোমার বয়স কত ?"

খুব খেপে গেলেন মেজর, "কেন ? আমার বয়সে তোমার কী দরকার ? এটা একটা প্রশ্ন হল ?"

"তুমি দেখছি বেশ মেজাজি লোক। আমি না চেষ্টা করেও রাগ করতে পারি না।"

মেজর মুখ ফেরালেন। সত্যি, মনে হচ্ছে তিনি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রাউন হাসল, "আমার বউটিকে দেখলেন ? ও খুব রাগী। তবে ব্যবসাটা ভাল বোঝে। আপনি যে আমার লাইনের লোক সেটাও কিন্তু এই চেহারার মিলের মতো তাজ্জব ব্যাপার।"

"লাইনের লোক ? কে লাইনের লোক ? আমি জোচ্চোর ? জেল খেটেছি ? অ্যাঁ ? এ বলে কী ?"

"আমার বউ-এর মতো চেঁচাচ্ছেন কেন ? লাইনের লোক না হলে দুটো টিকটিকি কাল থেকে তোমাকে ফলো করছে কেন ? সাধারণ লোককে কেউ ফলো করে ?" ব্রাউন দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসল।

"বাঃ। কী মজা ! তোমাকে কে না কে ফলো করছে আর আমি লাইনের লোক হয়ে গেলাম ?"

"দ্যাখো বাপু, আমি মিথ্যে বলছি না। গত এক বছরে কোনও জোচ্চুরি করিনি। আগের সব ঝামেলা অনেকদিন আগেই চুকিয়ে ফেলেছি। ফলো করার মতো গুরুত্ব কেউ আমায় দেবে না। হঠাৎ গতকাল থেকে দেখছি আমার পেছনে টিকটিকি লেগে আছে। এখন কারণটা বুঝতে পারছি। ওরা আমাকে তুমি বলে ভুল করেছে। তুমি লাইনের লোক না হলে ওরা তোমায় খুঁজবে কেন ?" পিটপিট করে তাকাল ব্রাউন। মেজর মুখে হাত বোলালেন। দাড়ি অসমান হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের কোথায় দেখেছ ?"

"এই তো, পথে এসো ব্রাদার। একটা ফাইভি ছাড়ো আগে।"

"ফাইভি ?" মেজর হাঁ।

"বেশি বলিনি। মাত্র পাঁচ পাউন্ড। বউয়ের কাছে গিয়েছিলাম, হাত

উপুড় করল না।"

"আমি তোমাকে খামোখা পাউন্ড দিতে যাব কেন ?"

"এক লাইনের দোস্ত বলে। কেসটা কী ? কী ফাঁসিয়েছ ? যদি একা না সামলাতে পারো তো আমাকে বলো। এ-তল্লাটের সব দু-নম্বরিদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে।" ব্রাউন মাতব্বরের মতো জানাল।

এইসময় জিনিসপত্র নিয়ে অর্জুন বেবিয়ে এল। মালপত্র তেমন ভাবী নয়, কিন্তু দুটো এক রকমেব মানুষকে দূর থেকে কথা বলতে দেখে সে ওগুলোকে নীচে নামিয়ে রেখে একমুহূর্ত দেখল। মেজর তাকে দেখামাত্র দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে ফেললেন, "এই ব্রাউন লোকটা একটা জোচ্চোর। কিন্তু ও বলছে আমি ভেবে কারা নাকি ওকে অনুসরণ করছে।"

অর্জুন আবার ব্রাউনের দিকে তাকাল। লোকটা পকেটে হাত রেখে এইদিকে বোকা-বোকা মুখে তাকিয়ে আছে। ওব মনে হল ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মেজর এবং তাঁর সম্পর্কে যারা কৌতূহলী তারা তো ব্রাউনকে দেখে ভুল করতেই পারে। এক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, কৌতূহলীরা ব্ল্যাকপুলের লোক নয়. তা হলে এই ভুল সহজে করত না।

অর্জুন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তখনই মিসেস গ্রান্ট এসে গেলেন। তিনি এলেন তাঁর বান্ধবীর গাড়িতে চেপে। ওঁদের দেখে দরজা খুলে কাছে এসে বিহ্বল গলায় বলে উঠলেন, "কী সর্বনাশের ব্যাপার বলো তো ! কে না কে মেয়ে আমার গাড়ি চুরি করে অ্যাকসিডেন্ট করল ? মেয়েটার নাকি এখনও জ্ঞান ফেরেনি। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই।"

অর্জুন গাডিটার কাছে এগিয়ে গেল, "আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

মিসেস গ্রান্ট অর্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে গুরুত্বটা অনুমান করে নীচে নেমে এলেন। মিনিট-তিনেক কথা বলার পর তিনি রাজি হলেন. "আমার বান্ধবীকে বলছি। ওর সঙ্গে ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ভাল আলাপ আছে। লকার খুলতে গেলে খাতায় সই-সাবুদ করতে হয়। সমস্ত ব্যাপারটা ম্যানেজারকে জানিয়ে করাই ভাল।"

অর্জুনের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না। ম্যানেজারকে জানালেই তিনি পুলিশ ডাকতে পারেন। পুলিশ তখন জানতে চাইতে পারে, কেন এতসব ঘটনার কথা ওদের জানানো হয়নি ? লকারে কী রয়েছে সেটাও তারা ইচ্ছে করলে তাদের জানতে না দিতে পারে। সে এ-ব্যাপারটা বলতে মিসেস গ্রান্ট বললেন, "চলো, আগে আমরা ব্যাঙ্কে যাই, তারপর অবস্থা দেখে ঠিক করা যাবে।"

অর্জুন এবার তার আপত্তির কথা জানাল, "আমি ব্যাঙ্কটা চিনি। আপনারা গাড়িতে যান, আমি হেঁটে যাচ্ছি। বেশি দূর নয়, ঠিক পৌঁছে যাব।"

"সে কী ! গাড়ি থাকতে তুমি হাঁটবে কেন ? এ কেমন কথা ?"

অর্জুন তখন ইশারায় দূরে দাঁড়ানো ব্রাউনের প্রতি ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। করা মাত্রই মিসেস গ্রান্টের চোখ গোল হয়ে গেল। তিনি দ্রুত মেজরের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই মেজরের মুখটায় একটা নার্ভাস ভাব ফুটে উঠল। অর্জুন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি ওঁর সঙ্গে হেঁটে যাব। মেজর আপনাকে যেতে-যেতে ওর গল্প বলবেন।"

মেজরেরও ইচ্ছে ছিল না অর্জুনকে একা ব্রাউনের সঙ্গে ছেড়ে দিতে। ওই জোচ্চোরটার সঙ্গে অর্জুনের যাওয়ার প্রয়োজনই বা কী তা ওঁর মাথায় ঢুকছিল না ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মালপত্র গাড়িতে চাপিয়ে মিসেস গ্রান্ট এবং তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হলেন। যাওয়ার আগে বলেন গেলেন, "আমি যাচ্ছি, কারণ আমি খুব উত্তেজিত। ক'দিন একদম ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছি লকারে কী আছে। কিন্তু এখন আর তর সইছে না। সাবধানে এসো। লোকটাকে একটাও পয়সা দেবে না।"

গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর অর্জুন ব্রাউনের পাশে দাঁড়াল, "মিস্টার ব্রাউন, আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত ?"

"মোটেই না। তোমার বন্ধুরা সব কোথায় গেল, তুমি গেলে না ?"

"না। ওদের কাজের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।" অর্জুন হাসল,"আমি একটু শহরটা ঘুরে দেখতে চাই।"

ঠোঁট ওলটাল ব্রাউন, "শহরটা দেখার মতো নয় হে। এই সমুদ্রের ধারের রাস্তা আর দোকানপাট, ব্যস্, এই হল ব্ল্যাকপুল। স্টেশনটাও দেখার মতো নয়। তুমি কি চাইছ আমি তোমার সঙ্গে যাই ?"

"আপনার যদি খুব আপত্তি না থাকে। একজন পরিচিত মানুষ সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে।"

"আরে বাবা, আপত্তি করতে যাব কেন ? তুমি আমাকে একটা লেট ব্রেকফাস্ট খাওয়াবে নিশ্চয়ই। লাঞ্চের আগে ঘোরা শেষ হবে না। আর বিকেলে নিশ্চয়ই দশটা পাউন্ড হাতে না দিয়ে তুমি পারবে না। চলো যাচ্ছি। আচ্ছা, এই যে প্লে হাউসগুলো দেখছ, খবরদার ঢুকো না। খাঁটি জোচ্চুরির জায়গা। দশ পি দশ পি করে এক পাউন্ড খরচ হয়ে যাওয়ার পর তুমি হয়তো দশ পি ফেরত পেলে। কফি খেলে কেমন হয় ?"

ডান দিকেই একটা কফি কর্নার। পঁয়তাল্লিশ পেনি দিয়ে এক কাগজের কাপ কফি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ওই টাকায় দশ কাপ কফি পাওয়া যেত। তা ছাড়া খানিক আগে খাওয়া হয়েছে, অর্জুনের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। সে দোকানদারকে একটা কফি দিতে বললে দোকানদার চোখ কুঁচকে ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যালো স্যাম, কিছু করছ মনে হচ্ছে ?"

ব্রাউন চটপট জবাব দিল, "এই আর কি। ট্যুরিস্টদের গাইড করছি।"

লোকটা যেন কথাগুলো পছন্দ করল না। কিন্তু আর কথা বাড়াল না।

দাম মিটিয়ে কফিটা ব্রাউনকে নিতে দিল অর্জুন। আর তখনই ব্রাউন বলল, "তোমাদের বন্ধুটি, ওই যাকে আমার মতো দেখতে, তার ব্যবসাটা কী বলো তো ?"

"ব্যবসা ? উনি তো ব্যবসা করেন না ?"

"করে। তুমি চেপে যাচ্ছ। টিকটিকি ঘুরছে পেছনে। এমনি-এমনি ?" লোকটা কফি শেষ করল, "শোনো, আমার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। তোমরা যদি আমাব সঙ্গে হাত মেলাও, তা হলে ভাল কামানো যেতে পারে।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "কী ভাবে ?"

"আমার ব্যবসায ওকে সবাই আমি বলে ভুল করবে। সেই ফাঁকে বাইরে থেকে আমি কাজটা কবলেও কেউ আর আমাকে সন্দেহ করবে না।" কথাগুলো বলতে-বলতে ব্রাউন ফুটপাথ ঘেঁষে হাঁটছিল, "তবে ওকে চুরুট খাওয়া ছাড়তে হবে। আমার লাইনের সবাই জানে আমি চুরুট খাই না। যা হবে তার অর্ধেক আমাব, অর্ধেক তোমাদেব।" মনে-মনে আচমকা হিসাব কবতে লাগল ব্রাউন। বাস্তাটা পাব হবার জন্যে অর্জুন পা বাডিযেছিল, হঠাৎ মনে হল, একটা গাড়ি খুব দ্রুত ছুটে আসছে। কিছু বোঝাব আগেই সে দু'পা পিছিযে আসতে গাডিটা ব্রেক কষল। চাকাটা ইচ্ছে কবে ডান দিকে বেঁকতে-বেঁকতে বাঁ দিকে মোড নিতেই ব্রাউন পড়ে গেল মাটিতে। কিছু বোঝাব আগেই লোক দুটো নেমে এল জিপ থেকে। ব্রাউনকে তুলে নিল ধবাধরি কবে। চিৎকার কবে বলল, "হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি।" তাবপবে উধাও। ব্যাপাবটা পরিষ্কাব হতে অর্জুনের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাওয়া জিপটাব দিকে তাকিয়ে থেকে অর্জুনের তখনও মাথা ঝিমঝিম কবছিল। এত বড একটা কাণ্ড ঘটে গেল অথচ সমুদ্রেব ধাবে বেডাতে আসা মানুষেরা সামান্য চঞ্চল হল না। শুধু একটা বিশাল চেহারার পুলিশ সামনে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার বন্ধু ?"

কী উত্তব দেবে ঠাহর করতে পারল না অর্জুন। শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে বলল, "না। একটু আগে আলাপ হয়েছে।"

পুলিশটা কাঁধ নাচাল, "হি ইজ লাকি। কেন যে লোকে অন্ধ হয়ে রাস্তা পার হয়।" উদাস-উদাস মুখ করে লোকটা আবার চলে গেল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে এই ঠাণ্ডাতেও মুখ মুছল অর্জুন। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ব্রাউনকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ওরা যদি ব্রাউনের পুরনো শত্রু হয় তা হলে বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি মেজর ভেবে ব্রাউনকে নিয়ে যায় ? চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র সে কেঁপে উঠল। ভুলটা ওদের খুব শিগ্‌গির ধরা পড়বে। অর্জুন দ্রুত রাস্তার ওপাশে চলে

এল। ট্রামটা থামতেই তাতে সে উঠে বসল। বসার জায়গা পেয়েও বাইরের দৃশ্য দেখার মতো মন ছিল না। যারা তাদের পেছনে লেগেছে তাদের চেহারা বা হদিস জানা নেই। প্রোফেসর হ্যাচ নামক মানুষটি যে এই ঘটনার সঙ্গে কতটা জড়িত তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। সে কি ভুল? পুলিশটাকে কি জানানো উচিত ছিল ওরা ব্রাউনকে ইলোপ করেছে? লোক দুটো কি শুধু জিপে চেপে তাদের অনুসরণ করেছে, নাকি রাস্তাতেও ওদের কেউ-কেউ ছিল! অর্জুন কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। দূর থেকে ব্যাঙ্কটাকে দেখতে পেয়ে সে নেমে পড়ল।

ব্যাঙ্কের সামনের পার্কিং লটে মিসেস গ্রান্টের বান্ধবীর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তার খানিকটা পেছনে মেজর দুটো বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ফুটবল খেলছেন রবারের বল নিয়ে। অর্জুনকে দেখে খেলা ছেড়ে এগিয়ে এলেন হাসতে-হাসতে, "এককালে খেলতাম, বুঝলে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওঁরা কোথায়?"

"ব্যাঙ্কের ভেতরে। তোমাব সঙ্গীটিকে দেখছি না?"

অর্জুন ব্রাউনের ব্যাপারটা বলতেই মেজরের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, "সর্বনাশ! তুমি পুলিশকে কিছু বলোনি? অতবড় একটা হুমদো লোককে দিনদুপুরে ধরে নিয়ে গেল?"

হুমদো শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র অর্জুনের হাসি পেল। শব্দটা তো মেজরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চেহারা যেহেতু দুজনের একইরকম। মেজর বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি হাসছ? হাসতে পারছ?"

তখনই মিসেস গ্রান্ট তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলেন। অর্জুনের বুকের ভেতর ড্রাম বাজতে লাগল। দুই প্রৌঢ়া কাছে এসে দাঁড়াতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বলল, "ম্যানেজার খুব ভাল মানুষ। তিনি বললেন অন্যের লকার আমরা খুলতে পারি না। কিন্তু যেহেতু লকারের মালিক গতবছর ভাড়া দেননি তাই ওঁরা তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি ফেরত এসেছে। এ-অবস্থায় ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে তিনি লকার খুলছেন। কিন্তু কিছু দিতে পারবেন না সেখান থেকে। আমরা কেন ইন্টারেস্টেড তাও জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, ভদ্রলোক মিসেস গ্রান্টকে ওই চাবি দিয়ে এসেছিলেন বোস্টনে গিয়ে।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

মিসেস গ্রান্ট পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন, "লকারে কোনও টাকাকড়ি-গহনা ছিল না। শুধু একটা কাগজ ছিল। আমি সেটাকে কপি করে নিয়ে এসেছি।"

হঠাৎ অর্জুনের নজর পড়ল একটা জিপ বাঁক ঘুরে এ-পথে আসছে। সে চিৎকার করে মেজরকে বলল, "চটপট গাড়ির পেছনে চলে যান।"

প্রায় মেজরের হাত ধরে সে টেনে নিয়ে এল গাড়ির পেছনে।

মিসেস গ্রান্ট কী করবেন ঠিক করার আগেই জিপটা তীব্র গতিতে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন ভদ্রমহিলার হাসি শুনতে পেল। মুখ বের করে সে দেখতে পেল জিপের আরোহী এক মহিলা এবং দুটি বাচ্চা। সে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই মিসেস গ্রান্ট হাসতে-হাসতে বললেন, "জিপটাকে এত ভয় পেলে কেন?" অর্জুন লজ্জা পেল, "ঠিক এইরকম জিপ খানিক আগে মিস্টার ব্রাউনকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের বোধহয় এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না।"

অতএব ওরা বওনা হল। মিসেস গ্রান্ট তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে যাবেন হাসপাতাল পর্যন্ত। সেখানকার থানার অফিসারের সঙ্গেও দেখা করবেন তাঁরা। মেজর আর অর্জুন বাস ধরবেন ওখান থেকে। জিপের আতঙ্ক থেকে মেজর খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। পেছনেব সিটে অর্জুনের পাশে বসে চুপচাপ ইংল্যান্ডেব গ্রাম, খামার, মাঠ দেখছিলেন। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিচু গলায় মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস কবলেন, "আচ্ছা, ওরা আমাকে ইলোপ কবতে চাইবে কেন? আমি ওদের কোনও পাকা ধানে মই দিয়েছি?"

অর্জুন কোনও উত্তর দিল না। মেজব একটা নিশ্বাস ফেলে পেছনের দিকে তাকালেন। ব্ল্যাকপুল ছেড়ে গাড়ি এবার হাইওয়ের দিকে এগোচ্ছে। ওদের পেছনের গাড়িগুলোকে খুব নিবীহ দেখাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছিল, মেজর কাউকে সন্দেহের বাইরে বাখছিলেন না। ব্যাপারটা মিসেস গ্রান্টও লক্ষ কবছিলেন। মুখ ফিরিয়ে তিনি অর্জুনকে ইশারা করলেন। ব্যাপারটা বোঝার আগেই অর্জুন শুনল মিসেস গ্রান্ট মেজরকে বলছেন, "আমি জানতাম আপনি অভিযাত্রী। কোনও কিছুতেই ভয় পান না। কিন্তু এখন দেখছি আপনি খুব ভিতু।"

"আমি ভিতু!" মেজর হঠাৎ হাহা করে এমন হেসে উঠলেন যে, মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী পর্যন্ত চমকে উঠলেন। মেজর বললেন, "একমাত্র আরশোলা আর টিকটিকি ছাড়া আর কিছুতেই আমার ভয় নেই।"

সঙ্গে-সঙ্গে মিসেস গ্রান্টের চোখ বিস্ফারিত হল, "মাই গড!"

মেজর একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "তার মানে?"

মিসেস গ্রান্ট অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও অর্জুন, ইউ মাস্ট হেল্প হিম। তুমি ওর পাশে বসে আছ। ওর পকেট থেকে প্রাণীটিকে বের করে দাও।" কথাটা কানে যাওয়ামাত্র মেজরের দাড়ি ঠেকল বুকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর শরীর শক্ত হয়ে গেল, চোখ বিস্ফারিত। অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না। মেজরের বুকে শুধু কলমের মাথা ছাড়া অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব সে দেখতে পেল না। ততক্ষণে মেজর কথা বলেছেন। গলার স্বর ভয়ে বিকৃত, "অ-অ অর্জুন, টিকটিকিটাকে পকেট থেকে ফেলে দাও!" বলতে-বলতে তিনি

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। অর্জুন মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকাল। ওঁর মুখে দুষ্টুমির হাসি। আর তখনই কাণ্ডটা করলেন মেজর। বাঁ হাতের এক থাবায় কলমটাকে তুলে বাঁ দিকে ছুড়ে ফেললেন জানলা গলিয়ে। গাড়ি চলছিল জঙ্গুলে এলাকা দিয়ে। মিসেস গ্রান্ট চিৎকার করে উঠলেন, "আরে, আরে, আপনি কলমটাকে ফেলে দিলেন ?"

"কলম ! আমার বুক পকেটে টিকটিকি উঁকি মারছিল আর আপনি বলছেন কলম ?"

খেঁকিয়ে উঠলেন মেজর। মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছেন। অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনার বুক পকেটে টিকটিকি আসবে কেমন করে ?"

"সেটা অবশ্য একটা কথা, কিন্তু এসেছিল তো !"

"না, আসেনি। আপনার কলমটাকে উনি ম্যাজিকে টিকটিকি বানিয়ে দিয়েছিলেন।"

তৎক্ষণাৎ আঁতকে উঠলেন মেজর। বাঁ হাতে বুক পকেটটা চাপড়ে নিলেন। তারপর দবজা খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লেন। মেজরকে পেছনের দিকে ছুটে যেতে দেখে অর্জুনও নামল। খুব নির্জন জায়গাটা। জঙ্গলে এবং ওপাশে তাকালে জনবসতির চিহ্ন দেখা যায় না। মিসেস গ্রান্ট চেঁচিয়ে বললেন, "আই অ্যাম সরি। মেজরকে তাজা করার জন্যে কাণ্ডটা না করলেই হত। আমরা একটু এগিয়ে পার্কিং প্লেসে গাড়িটা রাখছি। এখানে থাকলে পুলিশ ধরবে।"

অর্জুন হাত নাড়তে গাড়িটা ফার্লং-দুই এগিয়ে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল। হুশহাশ করে গাড়ি যাচ্ছে। পাশাপাশি আটটা ট্রাকে বিপরীতমুখী গাড়ি ছুটে যাচ্ছে মসৃণভাবে। এমন দৃশ্য পশ্চিমবাংলায় চিন্তা করা যায় না। এখানে কেউ আচমকা গাড়ি ঘুরিয়ে ট্র্যাফিক জ্যাম করে না, পার্কিং প্লেস ছাড়া গাড়ি দাঁড় করায় না। অর্জুন দেখল মেজর প্রায় মাটি হাতড়ে কলম খুঁজছেন। পাশে দাঁড়িয়ে নজর বোলাতে-বোলাতে সে জিজ্ঞেস করল, "খুব দামি কলম ?"

মেজর মুখ না তুলে জবাব দিলেন, "কলম ইজ কলম। কিন্তু এরকম বোকাটে রসিকতা করার কোনও মানে হয় ?" ছোঁড়ার সময় যাকে টিকটিকি মনে হয়েছিল, ঝোপেঝাড়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যে রীতিমত কষ্টকর তা বুঝতে সময় লাগল মেজরের। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে হতাশ গলায় উচ্চারণ করলেন, "যা, অত রেয়ার পয়জনটা হারিয়ে ফেললাম।"

"পয়জন ? আপনি কি বিষের কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ হে। আমি একটা অন্ধ, প্যাঁচা, বুদ্ধু, বোকা।" বিড়বিড় করলেন মেজর। ওঁর দাড়ি এখন অবিন্যস্ত। তাতে মোটা আঙুলগুলো সাঁতার

কাটছে।

অর্জুন এবার হতভম্ব, "কলমে বিষ মানে ?"

"খুব সিম্পল ব্যাপার। আমি কলমের ভেতরে বিষ রেখেছিলাম। বছর-দুয়েক আগে আমাজনে নৌকো বাইতে-বাইতে দেখেছিলাম একটা হাতি মরে পড়ে আছে তীরে। কাছে গিয়ে কোনও ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম না। অথচ হাতিটা খুবই কম বয়সী। আমার আদিবাসী গাইড বলল, ওটা মরেছে র‍্যাটল স্নেকের কামড়ে। অনেক চেষ্টার পর আমি বিশ ফোঁটা র‍্যাটল স্নেকের বিষ জোগাড় করেছিলাম। খুব দামি জিনিস হে। কোথায় যে ফেললাম!"

মেজরের নিশ্বাস পড়ল শব্দ করে।

"কিন্তু অত দামি জিনিস কলমের ভেতরে রাখতে গেলেন কেন ?"

"সিম্পল ব্যাপার। আত্মরক্ষার অস্ত্র। মুখটা খুলে নিবটা যদি শত্রুর শরীরে ঢুকিয়ে দিই, তা হলেই সে ঢলে পড়বে। ওই কলমে আমাকে কখনও লিখতে দেখেছ ? নেভার।"

জীবনে এরকম অস্ত্রের নাম শোনেনি অর্জুন। এবং এটা মেজরের মাথাতেই আসা সম্ভব। ওদিকে তখন মিসেস গ্রান্টের গাড়ি থেকে হর্নের আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্জুন বলল, "চলুন।"

"যাব মানে ? কলমটাকে ফেলে রেখে চলে যাব?" বলতে-বলতে মেজরের চোখের দৃষ্টি স্থির হল, "অর্জুন, দ্যাখো তো ওটা কী ?"

মুখ তুলে অর্জুন দেখতে পেল একটা গাছের ডালে কলমটা আটকে আছে। মেজর চলন্ত গাড়ি থেকে যাকে ছুঁড়েছিলেন, সে মাটিতে পড়েনি। অর্জুন ঘাড় নাড়তেই মেজর ছুটে গিয়ে গাছটাকে ঝাঁকাতে লাগলেন। আর এই সময় প্রচণ্ড শব্দ করে একটা কালো পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল পাশের হাইওয়েতে। চটপট দুটো পুলিশ-অফিসার নেমে পড়ল, "এই যে কী করছ তোমরা ? এদিকে এসো। কে তোমরা ? ধান্দাটা কী বলো ?" ওরা এগিয়ে এল কাছে।

মেজর তেমন পাত্তা না দিয়ে হাত তুলে ওপরের ডালটা দেখালেন, "আমার কলমটা ওখানে ?" অফিসার দুজন মুখ তুলে কিছু না দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে ইশারায় কথা বললেন। তারপর একজন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী বললে ? কলম ?"

গাছ ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে মেজর বললেন, "ঠিকই শুনেছ। কলম।"

দ্বিতীয় অফিসার হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, "অ্যাই, উঠে এসো। তোমাদের থানায় যেতে হবে।" মেজর তখন হতাশ চোখে ওপরের দিকে তাকাচ্ছেন। এত ঝাঁকুনিতেও কলমটা পড়ছে না। মুখ নামিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, "মামার বাড়ি আর কি! কোনও অপরাধ করিনি আর থানায় নিয়ে যাবেন! কার পাকা ধানে আমরা মই দিয়েছি হে ?"

"হাইওয়ের পাশে নেমে যাওয়া বেআইনি। তার ওপর কোনও মতলবে গাছ ঝাঁকাচ্ছ তাও জানতে হবে। একটু আগে তোমার মতো একটা লোককে....।" অফিসার থেমে গেল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে কলমটা নেমে এল। সোজা মেজরের কাঁধে লেগে ছিটকে পড়ল অর্জুনের সামনে। মেজর 'পেয়েছি' বলে চিৎকার করে কয়েক পা লাফিয়ে এসে ওটাকে তুলে নিলেন। তার মুখে এবার খুশি। একবার কাঁধটা হাতের টোকায় ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "ভাবো অর্জুন, কলমটা মুখ-খোলা অবস্থায় ওপর থেকে এখানে পড়েছিল। ওঃ। এতক্ষণে সব শেষ। জীবন বড় ছোট হে। চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

দ্বিতীয় অফিসারটি দ্রুত এগিয়ে এলেন কাছে। তারপর মুখ লাল করে বললেন, "দেখি কী জিনিসের বাহানা করছিলে?"

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন, "না। এটা দেওয়া যাবে না।"

১ "যখন আইন কিছু দেখতে চায় তখন তুমি দেখাতে বাধ্য।" অফিসার তার কোমরের রিভলভারে হাত দিল। মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন। প্রথম অফিসারটি ওপর থেকে চিৎকার করল, "বব,ব্রিং দ্যাট পেন। মনে হচ্ছে ওর ভেতর কোনও রহস্য আছে।"

কলমটা হাতে নিয়ে দু-একবার উলটেপালটে দেখে অফিসার ওদের ইঙ্গিত করল অনুসরণ করতে। অর্জুনের হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল। এর মধ্যে তার নজরে এসেছে, যে-আঙুলে কলমটাকে ধরেছে অফিসার, তার ওপরে সদ্য শুকিয়ে-আসা একটা ক্ষতের দাগ। যদি নিব ওখানে লাগে অথবা কলমে লিক থাকে তা হলে আর দেখতে হবে না। এই সময় মিসেস গ্রান্ট গাড়িটা নিয়ে পিছিয়ে এলেন, "কী হল আপনাদের? কলমটা পেলেন?"

অফিসার জিজ্ঞেস করল, "ম্যাডামের পরিচয়?"

মিসেস গ্রান্ট নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "এঁরা আমার বন্ধু।"

"হতে পারেন। কিন্তু এঁদের আমরা থানায় নিয়ে যাচ্ছি।"

মিসেস গ্রান্টের কোনও কথাই ওরা শুনল না। পুলিশের গাড়ির বদলে অবশ্য মিসেস গ্রান্টের গাড়িতে ওদের উঠতে দেওয়া হল। মিসেস গ্রান্ট কালো গাড়িটাকে অনুসরণ করলেন। মেজর খুব উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিসেস গ্রান্ট, হাইওয়ে থেকে নেমে আমরা কি কোনও অন্যায় করেছি বলে মনে হচ্ছে আপনার?"

মিসেস গ্রান্ট মাথা নাড়লেন, "মোটেই না। তবে ওরা আপনাকে গাছ ঝাঁকাতে দেখে হয়তো সন্দেহ করছে।"

"সন্দেহ? কিসের সন্দেহ! ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রের, মানুষের স্বাধীনতার সম্মান দেওয়া হয় বলে এতদিন জানতাম। এ যে দেখছি ফ্যাসিস্ট সরকারের চেহারা।" মেজর হুঙ্কার ছাড়লেন। মিসেস গ্রান্ট বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "কোথাও কোনও ভুল হয়েছে। একটু অপেক্ষা করুন,

দেখাই যাক না কী বলেন ওঁরা।"

"আমাদের সময়ের কোনও দাম নেই ? কী ভেবেছে ওরা ? আমরা ক্ষতিপূরণ চাইব।" মেজর বিড়বিড় করলেন। কিন্তু অর্জুনের চোখে তখন অফিসারের আঙুলের শুকনো ক্ষত ভাসছিল। র‍্যাটল স্নেকের বিষ যদি ওখানে লাগে ! সে নিচু গলায় মেজরকে সে-কথা বলতেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বাংলায় বললেন, "তুমি শুকনো ক্ষত দেখেছ ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল। মেজর বললেন, "আমাদের উচিত এখনই লোকটাকে সতর্ক করে দেওয়া।"

"কিন্তু কলমের মধ্যে বিষ আছে জানতে পারলে ওদের সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে।" অর্জুন জানাল।

"বেড়ে যাবে ? জেল হয়ে যাবে হে। যদি বলি কলমটা আমার অস্ত্র, তা হলে ওটা বেআইনি অস্ত্র। কোনও লাইসেন্স নেই। যদি বলি, র‍্যাটল স্নেকের বিষ রেখেছিলাম শখে পড়ে, তা হলে জিজ্ঞাসা করবে এয়ারপোর্টে ডিক্লেয়ার করেছিলাম কি না ? উত্তর শুনে সঙ্গে-সঙ্গে জেলে পাঠিয়ে দেবে আমাকে।" মেজর অত্যন্ত বিষণ্ণ গলায় কথাগুলো বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। যেহেতু কথাবার্তা বাংলায় হচ্ছিল, তাই মিসেস গ্রান্টের পক্ষে মানে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি এবার মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "আমি সত্যি খুব দুঃখিত। আপনার সঙ্গে টিকটিকির রসিকতা না করলে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হত না।"

এটা সম্ভবত মেজরেরও মনের কথা, তাই তিনি কোনও প্রতিবাদ করলেন না। পুলিশের গাড়িটার নির্দেশ অনুসরণ করে ওরা শেষ পর্যন্ত পুলিশ-স্টেশনে পৌঁছে গেল। অর্জুন দেখল লোকটা এখনও মরেনি, তবে কলমটা হাতেই ধরে রেখেছে। ওই কলম খুলে লিখতে গেলে কাগজে কীরকম দাগ পড়বে ? বিষের রং তো নীল হয়। তা হলে কি নীলচে লেখা ফুটবে ?

ওদের থানার ভেতরে নিয়ে আসা হল। জলপাইগুড়ির থানার তুলনায় একে তো হোটেল-হোটেল মনে হচ্ছে। বাইরের বোর্ডে প্রচুর ছবি টাঙানো। ওপরে 'ওয়ান্টেড' লেখা। অফিসার-ইন-চার্জ-এর টেবিলে পৌঁছে দেখল রোগা, লম্বা এক ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। কলমটা তাঁর সামনে রেখে পেট্রল-কারের অফিসার অভিযোগ পেশ করল, "সার, এই লোকটিকে লক্ষ করুন। তিন নম্বর হাইওয়ের পাশে একটা গাছ ঝাঁকাচ্ছিল গাড়ি থেকে নেমে। আমরা চার্জ করতে অজুহাত দিল ও নাকি এই কলমটাকে খুঁজছিল।"

অফিসার-ইন-চার্জ নির্লিপ্ত মুখে কলমটাকে দেখলেন, "এর মধ্যে কী আছে ? হিরে না ড্রাগ ?"

মেজর বললেন, "নাথিং। এটা একটা কলম। আর আমরা

রেসপেক্টেবল ট্যুরিস্ট।"

"শো মি ইওর আইডি।" ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন।

মেজর পকেট থেকে তাঁর পাশপোর্ট এবং আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী সঙ্ঘের কার্ড বের করে দেখালেন। সেটাকে উলটে-পালটে দেখে অফিসার-ইন-চার্জ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি গাছে কলম খোঁজার অভিযান করেন। ইনি কী করেন?" প্রশ্নটি অর্জুনকে দেখিয়ে। অর্জুন তার পাশপোর্ট বের করে টেবিলে রাখতেই মেজর যোগ করলেন, "ও খুব প্রতিভাবান প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

বাঁ হাত দিয়ে পাশপোর্টগুলো ঠেলে দিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, "এইসব ফালতু লোককে আমি আমার এলাকায় দেখতে চাই না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ! তা হলে আমবা আছি কী করতে!"

তারপর তিনি কলমটা তুলে নিলেন। অর্জুনের বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে লাগল। এই সময় মিসেস গ্রান্ট বললেন, "স্যার, আমি এই দেশের একজন নাগরিক, খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হয়। আমি বলছি এরা নির্দোষ এবং আমার বন্ধু।"

ততক্ষণে কলমটা খুলে ফেলেছেন ভদ্রলোক। অর্জুন দেখল সাধারণ চেহারার নিবওয়ালা কলম। তবে নিব পয়েন্টেড। একটা কাগজ টেনে নিয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "মহাশয়ার পরিচয়?"

মিসেস গ্রান্ট যখন পরিচয় দিচ্ছেন, তখন কাগজে ফ্যাকাসে একটা রেখা তুলল নিব। পবিচয়টা শুনে মুখ তুললেন অফিসার-ইন-চার্জ, "ওঃ, আপনার নাম আমি শুনেছি। কিন্তু আপনি কী বলতে চান জানি না। খামোখা একটা বাজে কলমের জন্যে কেউ গাছ ঝাঁকায়?"

মিসেস গ্রান্ট বললেন, "কম দাবি কখনও কারও প্রিয় হতে পারে। একটু ঝাঁকিয়ে নিন।" অফিসার-ইন-চার্জ মেঝেতে কলমটা ঝাঁকালেন। অর্জুনের মনে হল জলীয় কিছু ছিটকে পড়ল নীচে। সে মেজরের মুখের দিকে তাকাল। দাড়ি-গোঁফ থাকা সত্ত্বেও সেই মুখে যেন সন্তান-হারানোর বেদনার ছাপ। আমাজনের তীর থেকে সংগ্রহ করা বিষের কী দুর্দশা। অফিসার-ইন-চার্জ আবার লিখতে গেলে দাগ ফুটল না। রেগেমেগে কলমের মুখটা বন্ধ করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি জানলা দিয়ে বাইরে। সঙ্গে-সঙ্গে মেজর উঠতে যাচ্ছিলেন। অর্জুন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর পাশে। চটপট সে মেজরের হাত আঁকড়ে ধরতেই ভদ্রলোক কোনওমতে নিজেকে স্থির করলেন। অফিসার-ইন-চার্জ মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার দুই বন্ধুকে তাড়াতাড়ি দেশে ফেরত পাঠান। একবার ইংল্যান্ডে এলে তো কোনও ভারতীয় ফিরতে চায় না। এরা ক্রমশ বদলা নিতে ইংল্যান্ডকেই দখল করে নেবে।" এই পেট্রল-কারের অফিসার এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের কানে ফিসফিস করে কিছু বলতেই তিনি সোজা হয়ে

বসলেন। তাঁর চোখ এবার মেজরের ওপর। কিছুক্ষণ দেখার পর মাথা দুলতে লাগল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হাতের ইশারা করলেন মেজরকে, "ইউ ফলো মি।"

ব্যাপারটা এমন নাটকীয় যে, মেজর খুব ঘাবড়ে গেলেন। অর্জুনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি উঠে দাঁড়াতেই অর্জুন বলল, "চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।"

ওরা এগিয়ে যেতেই আর-একজন অফিসার মিসেস গ্রান্টদের হাত তুলে অপেক্ষা করতে বললেন। ঘব থেকে বেরিয়ে এক সরু প্যাসেজ দিয়ে কিছুটা হেঁটে মাঝারি ঘরেব সামনে ওরা পৌঁছে গেল অফিসার-ইন-চার্জের পেছন-পেছন। ঘরটার দরজায় তালাচাবি লাগানো। দরজার ওপরে একটা চৌকো খোপ, তাতে শিক লাগানো। সেখানে মুখ লাগিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ জড়ানো ইংরেজিতে ধমকালেন। অর্জুনেব মনে হল, তিনি যেন কাউকে ডাকলেন। একটু বাদেই মিস্টার ব্রাউনের মুখ সেখানে দেখা গেল। কপালে শুধু একটা প্লাস্টার সাঁটা। ওদের দেখে খুব রেগে গেল লোকটা। আচমকা চিৎকার করে উঠল, "ইউ, ইউ, ফর ইউ দে হ্যাভ ডান দিস।"

অর্জুন ব্রাউনকে লকআপে দেখে খুব হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাউন যখন খুব উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলছিল, তখন শিকের ফাঁক গলে থুতু এসে ছিটকে লাগল মেজরের মুখে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চিৎকাব করে উঠলেন, "কী! এত বড় স্পর্ধা! তুমি...তুমি থুতু ছিটোলে?"

"অ্যাঁ?" ব্রাউন চোখ পিটপিট করল, "আমি থুতু ছিটিয়েছি? কী মিথ্যুক লোক এটা?"

অর্জুনের হাসি পেয়ে গেল। দুটো মুখ দেখতে অবিকল একরকম। যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেজর কথা বলছেন। আর এইরকম উত্তেজনার মুহূর্তে মেজরকে দেখলে টিনটিন কমিকসের ক্যাপ্টেন হ্যাডকের কথা মনে আসে চট করে। হঠাৎ মেজর পরিষ্কার বাংলায় তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই উজবুকটা আমাকে অপমান করছে আর তুমি হাসছ অর্জুন?"

অফিসার-ইন-চার্জ হাত তুললেন, "তুমি এদের চেনো?"

ব্রাউন বলল, "দেখেছি। আমার বউয়ের হোটেলে ছিল। ওই ছেলেটা খুব ভাল। ওর সামনে থেকেই লোকগুলো আমাকে ইলোপ করেছিল। জিজ্ঞাসা করে দেখুন।"

"বাট হোয়াই? তুমি এমন কোনও ডিউক নও যে, তোমাকে কেউ ইলোপ করতে যাবে?"

"আমাকে করেছিল নাকি? ওই দেড়েলটাকে করতে গিয়ে আমাকে ভুল করে নিয়ে গিয়েছিল।"

“এ যা বলছে তা সত্যি জেণ্টলম্যান ?” অফিসার-ইন-চার্জ প্রশ্ন করলেন অর্জুনকে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে মাথা নাড়তেই তিনি আবার ওঁকে অনুসরণ করতে বলে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। চেয়ারে বসে প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে দুটো ভাঁজ করে নৌকো বানাতে-বানাতে জিজ্ঞেস করলেন, “নাউ, তোমরা আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছ। পুরো ঘটনা খুলে বলো।”

মিসেস গ্রান্ট চুপচাপ বসে ছিলেন সেখানে। ভদ্রলোক যেভাবে কাগজ ভাঁজ করছেন, তাতে বুকের ভেতর ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল অর্জুনের। র‍্যাটল স্নেকের বিষ এত তীব্র যে, শুকনো অবস্থাতেও হাতে লেগে গেলে এবং সেই হাত জিভে ঠেকলে একই প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে শুনেছে সে। ওই কাগজে লেখার চেষ্টার সময় কি বিষ লেগে যায়নি ? সে যতটা সম্ভব গল্পটা শোনাল। মিসেস গ্রান্টের গাড়িটাকে অ্যাকসিডেন্ট করতে দেখে তারা হাসপাতালে গিয়েছিল। সেখানে যে শুয়ে ছিল, তাকে দেখতে এই ভদ্রমহিলার মতো নয় বলে সন্দেহ হতে সে আর মেজর ব্ল্যাকপুলে ফিরে এসেছিল। এসে জেনেছে মিসেস গ্রান্টের গাড়িটা চুরি গেছে কিন্তু তাঁর কিছু হয়নি। সেই রাত্রে হোটেলে কিছু সন্দেহজনক লোককে দ্যাখে তারা। এবং এই ঘটনাটা জেনে গেছে বলে একদল লোক তাদের মুখ বন্ধ করতে চায় বলে সন্দেহ হয়েছিল। তারাই ব্রাউনকে মেজর বলে সন্দেহ করেছিল।

ঘটনাটা শুনে অফিসার-ইন-চার্জ জিজ্ঞেস করলেন, “এত ঘটনা পুলিশকে রিপোর্ট করেননি কেন ?”

এবার মিসেস গ্রান্ট কথা বললেন, “ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখার জন্যে আমি ওঁদের রিপোর্ট নিয়ে ওই হাসপাতালে যাচ্ছিলাম।”

অফিসার-ইন-চার্জ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাবলেন, ব্রাউনকে কিছুক্ষণ আগে আমরা ওই হাইওয়ের পাশে পেয়েছিলাম। ও অজ্ঞান হয়েছিল। একই গল্প শুনিয়েছে সে, অবশ্য প্রথমটা বলেনি জানত না বলে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনার গাড়ি চুরি করে অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে তার কী লাভ।” অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, “চলুন, আপনাদের নিয়ে ওই হাসপাতালে যাই। দেখি কে সত্যি বলছে।”

ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। অফিসার নিজের গাড়ির দিকে যেতেই মেজর ছুটে চলে গেলেন জানলার নীচে। পড়ে থাকা কলমটিকে তুলে তৃপ্তির হাসি হাসলেন। তাই দেখে অফিসার মন্তব্য করলেন, “মনে হচ্ছে ওই বস্তুটির সঙ্গে আপনার কোনও স্মৃতি জড়িয়ে আছে।”

মেজর মাথা নাড়লেন, “অব কোর্স। আমাজন, আমাজন।” আর তখনই ঘরের ভেতর থেকে একটা সেপাই বারান্দায় বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলল, “অফিসার, আমাদের বেড়ালটা এই ঘরে এসে আচমকা মরে

গেল।"

গাড়ি থেকে মুখ বার করে অফিসার-ইন-চার্জ ধমকে উঠলেন, "ফালতু কথা, বেড়াল আচমকা মরে নাকি!"

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে কলমটা আঁকড়ে ধরলেন।

মৃত বেড়ালটাকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা সেপাই। তাই দেখে অফিসার-ইন-চার্জ গাড়ি থেকে যেন ছিটকে দৌড়ে এলেন, "ও, মাই গড! হু কিলড্ হিম?" বেড়ালটাকে হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখলেন তিনি, "উন্ড-এর কোনও চিহ্ন নেই। কী ঘটেছিল ঠিকঠাক বলো তো?"

সেপাইটা বলল, "বেড়ালটাকে ঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম। তারপর আর খেয়াল করিনি। হঠাৎ দেখলাম, পড়ে গিয়ে উলটে গেল। ডেড।"

"কোনখানটায়?" অফিসার-ইন-চার্জ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"আপনার টেবিলের ঠিক পাশে।"

বেড়ালটা ফেরত দিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ বিড়বিড় করলেন, 'বেড়ালও কি হার্টফেল করে? উঃ, আজ সকাল থেকে একটার-পর-একটা বেয়াড়া ব্যাপার হচ্ছে। ভাল করে এর সমাধির ব্যবস্থা করবে, বুঝলে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল হে।"

মেজর এতক্ষণ অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনছিলেন কথাগুলো। তাঁর বাঁ হাত সমানে বুকপকেটের কলমটাকে আঁকড়ে রয়েছে। একফাঁকে ফিসফিসিয়ে বললেন, "বরাত ভাল, তাই বেড়ালের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা গেল। আহা, অবোধ প্রাণীটা শহিদ হল।"

অফিসার-ইন-চার্জ সবাইকে ইশারা করে গাড়ির দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে-থাকা অফিসারকে হুকুম দিলেন, "ব্রাউনটাকে বের করে আনো তো! ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।"

ব্রাউনকে হঠাৎ কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্জুন বুঝতে পারছিল না। মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। মেজরের সঙ্গেও আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না। কিন্তু মেজরই বললেন, "ওই ফেরেব্বাজ লোকটাকে খামোখা লক-আপ থেকে কেন বের করল বলো তো? ঠিক তোমার মতো দেখতে আর-একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাবতে পারো?"

অর্জুন কোনও জবাব দিল না। গাড়ি চলছে হাইওয়ে দিয়ে পুলিশ-কারকে অনুসরণ করে। বিপরীতমুখী গাড়ির ভিড় এখন বেড়েছে। কেউ-কেউ ক্যারিয়ারে নৌকা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যারাভান চোখে পড়ল কয়েকটা। রাস্তার পাশে লেখা রয়েছে, এদিকে বাঁক নিলে রেস্টুরেন্ট এবং পেট্রল-পাম্প পাবেন। এর খানিকবাদেই হাসপাতালের চিহ্নটা দেখতে পাওয়া গেল। পুলিশের গাড়িটা সেদিকে বাঁক নিতেই ওরাও হাইওয়ে

ছেড়ে নেমে এল।

গাড়ি থেকে নেমে একজন অফিসার ছুটে গেল ভেতরে। অফিসার-ইন-চার্জ টেলিফোন তুলে গাড়িতে বসেই কারও সঙ্গে কথা সেরে নিলেন। ব্রাউন পেছনে চুপচাপ বসে। টেলিফোন নামিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, "এটা আমার জুরিসডিকশনে নয়। তোমাদের, মানে উনি যদি সত্যিকারের মিসেস গ্রান্ট হন, তবে ওঁকে লোকাল থানায় যেতে হবে। তার আগে আমার···।"

অফিসার-ইন-চার্জের কথা শেষ হবার আগেই সেই অফিসারটি ফিরে এল। এসে জানান, "যার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, তাকে দেখতে হলে মর্গে যেতে হবে। বেচারা বেঁচে নেই।"

অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, "এইমাত্র লোকাল থানা বলল সেই কথা। লেটস গো।"

জলপাইগুড়ির মর্গের ধারেকাছে গেলেই গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবে পেটে থাকলে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে পা বাড়াতে ইচ্ছে করছিল না অর্জুনের। মৃতা মহিলাটিকে দেখে তার কী লাভ ? কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছিল না সে। অথচ যে-ঘরটায় তারা পৌঁছল তাকে মর্গ বলে কিছুতেই মনে হচ্ছিল না। ছিমছাম সুন্দর একটা কাচের এপাশে ওরা দাঁড়িয়ে। ওপাশে নম্বর-লেখা লকারের মতো ট্রে রয়েছে ঠাণ্ডা ঘরে। মর্গের ইন-চার্জ অফিসারের নির্দেশে বোতাম টিপতেই সেই ট্রে বেরিয়ে এল, যাতে মিসেস গ্রান্টের গাড়ি-চোর শুয়ে আছে। অফিসার-ইন-চার্জ তার সঙ্গীর দিকে তাকালেন। লোকটা চিনতে না পারার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। এবার তিনি মিসেস গ্রান্টকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি একে কখনও দেখেছেন ?"

যদিও কোনও গন্ধ নেই এবং শায়িতা মেয়েটির মাথায় সুন্দর ব্যান্ডেজ করা, তবু মিসেস গ্রান্ট নাকে রুমাল চেপে রেখেছিলেন। সে অবস্থায় তিনি মাথা নেড়ে না বললেন। অর্জুন দেখল, মেয়েটির বয়স বেশি নয় এবং ঠোঁটের ওপরে একটা জড়ুল আছে। এই সময় পেছন থেকে ব্রাউনের গলা ভেসে এল, "ও মাই গড।"

অফিসার-ইন-চার্জ ঘুরে দাঁড়ালেন, "ইয়েস ? সামনে এগিয়ে এসো ব্রাউন। ডু ইউ নো হার ?"

চোখ গোল করে ব্রাউন এগিয়ে এল কাচের দেওয়ালের সামনে। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। অফিসার-ইন-চার্জ খুশি হলেন, যেন এই উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রাউনকে লক-আপ থেকে বের করে এনেছেন এই ভঙ্গিতে অন্য অফিসারকে নট করে ব্রাউন কাঁধে হাত রাখলেন, "হু ইজ শি ?"

ব্রাউন জিভ চাটল। নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "হার নেম ইজ

স্ট্রেঞ্জি। আই মেট হার টোয়াইস।”

“কোথায় ব্রাউন ? বলে ফ্যালো চটপট।”

“একবার ম্যাঞ্চেস্টারে আর একবার এই দু'দিন আগে ব্ল্যাকপুলে।”

“কী করত ও ?”

“যোগাযোগ।”

“কী ধরনের যোগাযোগ ?”

“আমি ঠিক জানি না। দিব্যি করে বলছি। ও অনেক ওপরের ডালের পাখি ছিল।”

“ব্ল্যাকপুলে ওকে কার সঙ্গে দেখেছ ?”

“ও একটা জিপে করে যাচ্ছিল। জিপের ড্রাইভারকে আমি চিনি না। ওকে দেখে আমার খুব আগ্রহ হয়। আমার কাছে একটাও পাউন্ড ছিল না, নইলে ট্যাকসি নিয়ে ফলো করতাম।”

ব্রাউনের কথা শেষ হতেই মর্গের কেয়ারটেকারকে ট্রে ভেতবে ঢুকিয়ে দেবার ইঙ্গিত করে অফিসার-ইন-চার্জ ঘুরে দাঁড়ালেন, “লুক ব্রাউন। তোমাব বিরুদ্ধে আপাতত আমাব কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি গন্ধ পেয়েছিলাম, যা আমি অপরাধীদের গাযে পেযে থাকি। তোমার কি খুব শখ হচ্ছে এখানকার কোনও খালি ট্রেতে শুয়ে পডতে ?”

“ও, নো।” ব্রাউন দ্রুত মাথা নাডল।

“তোমার সম্পর্কে আমি জানতে পেবেছি কিছু জালিয়াতি আর জুয়ো খেলে পয়সা উডিয়ে দেওযা ছাডা তেমন কোনও বড কুকর্ম এখনও করোনি। অতএব ওই ট্রে'তে যদি শুতে না চাও তা হলে সত্যি কথাটা গুছিয়ে বলো।” বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ কবলেন অফিসার-ইন-চার্জ।

ব্রাউন ঠোঁট চাটল। এটা সম্ভবত লোকটার মুদ্রাদোষ। তাবপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, “আমরা কি এই হতচ্ছাড়া জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি ?

মাথা নেড়ে অফিসার-ইন-চার্জ দলটাকে নিয়ে বাইরে এলেন। তারপর মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, “গাড়িটাকে আপনি নিজে একবার শনাক্ত করে আসুন ম্যাডাম। ইনশিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে তো আপনাকেই কথাবার্তা বলতে হবে। লোকাল পুলিশ-স্টেশনে ওটা রাখা আছে। পরে যদি কোনও প্রয়োজন পড়ে তা হলে আমরাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।”

মিসেস গ্রান্ট মেজরের দিকে তাকালেন। এখনও মেজরের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝেননি অফিসার-ইন-চার্জ। তিনি বললেন, “আপনি অফিসার, ইতিমধ্যেই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার বন্ধুদের অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে মিস্টার ব্রাউনের শুধু চেহারার মিল এবং উনি গাছ ঝাঁকাচ্ছিলেন এটা কোনওভাবেই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। উনি

কি আমার সঙ্গে যেতে পারেন ?”

“এক মিনিট !” বলেই অফিসার-ইন-চার্জ ব্রাউনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, “স্ট্রেঞ্জির পুরো নাম কী ?”

“আমি জানি না অফিসার। লোকে ওকে ওই নামেই ডাকত। আসলে ও যাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত তারা অনেক গভীর জলের মাছ। আমার সাধ্য ছিল না ওর কাছে পৌঁছবার।” সরল গলায় বলল ব্রাউন।

“কাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত ? নামগুলো বলো চটপট।”

“একজনের নামই মনে আছে। কুঁজো-হ্যারিস। সাপের বিষেব ব্যবসা করত সে।”

কথাটা শোনামাত্র মেজর আবার বুকপকেটে হাত দিলেন। অফিসার-ইন-চার্জ জিজ্ঞেস করলেন, “এই কুঁজো-হ্যারিসকে তুমি চিনলে কী করে ?”

ব্রাউন হাসল। তারপব পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাঠি বের করে দাঁতে চাপল, “ওকে সার ম্যাঞ্চেস্টাবে সবাই চেনে। যারা সাপের বিষের ছোবল নিয়ে নেশা করে, তারা তো বেশি করে চেনে। ব্ল্যাকপুলে আমার যখন কিছু হল না তখন ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়েছিলাম ভাগ্য ফেরাতে। কিন্তু পাত্তাই দিল না কেউ। তাই এবার ব্ল্যাকপুলে ফিরে এসে স্ট্রেঞ্জিকে দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম আমি। মনে হল ওর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলে কাজের কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু পকেটে পয়সা ছিল না যে ফলো করব। তা ছাড়া জিপে কোনও মেয়ে বসে থাকলে আমার খুব অস্বস্তি হয়।”

“জিপটার মালিক কে তুমি জানো ?”

“না। ব্ল্যাকপুলের কেউ নয়।”

এক মুহূর্ত ভাবলেন অফিসার, “ব্রাউন, তোমার কথায় যদি একটাও মিথ্যে থাকে, তা হলে একটা করে হাড় জমা রাখতে হবে তোমাকে। ওরা জিপে তুলে কী বলেছিল তোমাকে ?”

ব্রাউন হাসল, “তিনবার বলেছি সার।” তারপরেই অফিসার-ইন-চার্জের মুখের দিকে তাকিয়ে চটপট গম্ভীর হয়ে গেল, “গাড়িতে তুলেই একজন আমার কোমরে নল ঠেকাল। চাপা গলায় বলল, চিৎকার করলেই পেট ফুটো করে দেবে। আর-একটা লোক ব্যস্ত হয়ে বলল, ছোকরাটাকে তুলে আনা হল না কিন্তু। ড্রাইভ যে করছিল সে বলল, ওকে নিয়ে মাথা ঘামাব কেন, এই সাহায্য করবে। তারপর ওরা আমাকে নিয়ে এল সমুদ্রের ধারে শহর ছাড়িয়ে। গাড়ি থামিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করল, আপনার পাশপোর্ট ? আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার কোনও পাশপোর্ট নেই। গলার স্বর শুনে সম্ভবত ড্রাইভারের সন্দেহ হল। সে নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী ? নাম বলতেই আমার দাড়ি ধরে টানল। আমি চিৎকার করে উঠতেই সে ছেড়ে দিয়ে আবার

গাড়িতে উঠল। কোনও কথা না বলে হাইওয়েতে এসে এক ধাক্কায় আমাকে রাস্তার পাশে ফেলে দিতে বলল সঙ্গীদের। অন্য কেউ হলে মরে যেত। কিন্তু চলন্ত গাড়ি থেকে পড়েও আমি মরিনি একটু কায়দা জানার জন্যে। অবশ্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।"

অফিসাব-ইন-চার্জ মৃদু হাসলেন, "নাঃ, তোমার স্মৃতিশক্তি দেখছি বেশ ভাল। প্রথমবারে যা বলেছ তা থেকে সরে আসোনি। কিন্তু স্ট্রেঞ্জি কেন মিসেস গ্রান্টের গাড়ি চুরি করতে গেলেন?"

"আমি জানি না সাব। বিশ্বাস করুন।"

ব্রাউনকে ছাড়া হল না। কিন্তু মেজরকে আর ঝামেলায় পড়তে হল না। অফিসার-ইন-চার্জ শুধু বললেন তিনি যেন যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই মেজরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই কারণে মেজর যেখানে থাকবে তাব কাছাকাছি পুলিশ-স্টেশনেব সঙ্গে সপ্তাহে একদিন নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে কথা বলেন। যাওয়ার আগে ব্রাউন নিচু গলায় অর্জুনকে বলল, "এরা আমাকে ফরনাথিং হ্যারাশ করছে। কিন্তু ইয়ং ম্যান, তুমি সাবধানে থেকো। সাম হাউ তোমাকে আমার ভাল লেগে গেছে বলে সাবধান করে দিচ্ছি।"

মেজরের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মাথা থেকে এক আকাশ ওজন যেন নেমে গেল। তিনি হাইওয়ের দিকে ছুটে-যাওয়া পুলিশের গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী বিড়ম্বনা বলো তো। ঠিক বললাম তো, কথাটা বিড়ম্বনাই তো?"

এই পরিস্থিতিতে একটি বাংলা শব্দের ঠিক প্রয়োগ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে পারে? মেজরের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, মানুষটির মন সত্যি শিশুর মতন। কিন্তু ওঁর পকেট থেকে বিষকলম সরিয়ে ফেলা উচিত। আবার কোত্থেকে ওটাকে কেন্দ্র করে বিপদ ঘাড়ে এসে পড়ে তা কে জানে! চোখের সামনে সেই মৃত বেড়ালটা যেন ঝুলছে। কিন্তু কথাটা সরাসরি বললেও বিপদ।

লোকাল পুলিশ-স্টেশনটিও আগেরটির প্রতিচ্ছবি। তবে এর অফিসার-ইন-চার্জ বেশ খোলামেলা লোক। মিসেস গ্রান্টের পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, আপনি ওই গাড়িতে ছিলেন না।" গাড়িটা রয়েছে পুলিশ-স্টেশনের পেছনে একটা চালাঘরের নীচে। সেদিকে তাকিয়ে মিসেস গ্রান্ট গালে হাত রাখলেন। ওঁকে এখানে অনেক সময় কাটাতে হবে এখন। কীভাবে গাড়ি চুরি গেল, কখন জানতে পারলেন, পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন কি না থেকে শুরু করে ইনশিওরেন্স কোম্পানি পর্যন্ত হাজার প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করাতে হবে তাঁকে।

অর্জুন আর ভেতরে গেল না। পুলিশ-স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে মেজর বললেন, "বেলা তো পড়ে আসছে। এবারে মার্শালের ওখানে যাওয়ার

বাস ধরলেই তো হয় !"

অর্জুনও তাই চাইছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের লকারে যে বস্তুটি আবিষ্কার করে এনেছেন মিসেস গ্রান্ট, সেটির হদিস না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যাওয়া উচিত হবে না। মিসেস গ্রান্ট ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু সেটা করতে হলে সন্ধে হয়ে যাবেই। তার চেয়ে এখানে কোনও থাকার জায়গা আছে কি না খুঁজে-পেতে দেখা দরকার।

সেটার সন্ধান পাওয়া গেল। একজন কনস্টেবল জানাল, হাইওয়ের মুখেই ডান হাতে একটা মোটেল আছে। তবে সেখানে খাবারদাবার পাওয়া যায় না। মেজর কনস্টেবলকে বললেন, "দয়া করে মিসেস গ্রান্টকে বলবেন একটু অপেক্ষা করতে। আমরা পাশের সুপার মার্কেট থেকে ঘুরে আসছি।"

গাড়িতেই জিনিসপত্র রেখে ওরা খালি হাতে বের হল। চারপাশ ফাঁকা। শেষ বিকেলের আলোয় হাইওয়ে-ফেরত গাড়িগুলোকে দেখা যাচ্ছে। সুন্দর রাস্তায় দু-তিনজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল না। এমনকী, সুপার মার্কেট যেন ফাঁকা। বোস্টনের সুপার মার্কেটের সঙ্গে এর কোনও পার্থক্য নেই। মেজর চলে এলেন রেডিমেড খাবারের ব্লকে। অর্জুন ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পারস্পরিক বিশ্বাস কতটা থাকলে এমন দোকান চালানো যায়। পশ্চিমবাংলায় এইরকম অভ্যাস তৈরি করতে অনেক সময় লাগবে। এবং এইসময় সে জিপটাকে দেখতে পেল। মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁক নিয়ে সোজা সুপার মার্কেটের সামনে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিপের দরজা খুলে দু'জন লোক দু'পাশ থেকে নামল। একজন স্বাস্থ্যবান, মাথায় টাক, অন্যজন দোহারা লম্বা এবং মাথায় বাঁকানো ব্যালকনি-টুপি। গাড়ির দরজা চাবি দিয়ে লোক দুটো এগিয়ে আসছিল সুপার মার্কেটের দিকে। দোহারা চেহারার লোকটার হাঁটার ভঙ্গি দেখে অর্জুন দৌড়তে লাগল। প্রসাধনের ব্লক পেরিয়ে, কাঁচা সবজি ডিঙিয়ে সে মেজরের সামনে পৌঁছে গেল। মেজর ততক্ষণে ঝুড়ি-ভর্তি করে নানান খাবারের প্যাকেট নিয়ে কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছিলেন। ওকে দেখামাত্র বললেন, "একটু দুধও নিয়ে নিলাম, বুঝলে। চকোলেট দেওয়া।"

অর্জুন ওকে টেনে একটা সেলফের আড়ালে নিয়ে এল, "সেই জিপের মালিক আর তার সঙ্গী এই সুপার মার্কেটে ঢুকছে। আপনাকে ওরা চিনতে পারবেই। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়তে হবে।"

"অ্যাঁ ! ওরা এখানে ?" মেজর প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "লুকোব কী হে ? ব্যাটাদের ধরে পুলিশের কাছে তুলে দিই চলো। কোথায় ওরা ?"

অর্জুন মেজরের কনুই ধরল, "ওসব করতে যাবেন না। ওদের বিরুদ্ধে আমরা কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারব না। আপনি ওই পেছনের

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। আপনার দাড়ির জন্যে ওরা আপনাকে সহজেই চিনতে পারবে। আমি এগুলো নিয়ে কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি।”

মেজর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন কান দিল না। শেষপর্যন্ত মেজর বাঁ দিকে পা বাড়ালে সে ট্রলিটাকে ঠেলতে-ঠেলতে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে চলল। হয়তো এটা অসময়, তাই সুপার মার্কেটে ক্রেতা হাতে গুনে পাওয়া যাবে। অর্জুন দেখতে পেল লোক দুটো পাশাপাশি এগিয়ে আসছে প্যাসেজ দিয়ে। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে সামনের সেল্‌ফ থেকে কুকুরের খাবারের টিন তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। লোক দুটো ওর মুখ দেখতে পাবে না সরাসরি। তাকে আমলও দিল না ওরা। সোজা এগিয়ে গিয়ে রেডিমেড খাবারের ব্লকে গিয়ে থামল। কুকুরের খাবারের টিনটা হাতে নিয়ে অর্জুন আড়চোখে দেখল, দোহারা চেহারার লোকটির হাতের ছড়ি বারংবার পায়ের পাশে মৃদু আঘাত করে যাচ্ছিল। তার নির্দেশে টাক-মাথা খাবার নিচ্ছে। অর্জুন আর দাঁড়াল না। কাউন্টাবে দাম মিটিয়ে ট্রলি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার মুখে আডচোখে সে দেখে নিল ওরা এখনও কাজ শেষ করেনি। এবং ওখান থেকেই সে মেজরকে দেখতে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে তিনি হাত নাড়ছেন। ওরা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখতে পাবে ওঁকে। অর্জুন হাত নেড়ে মেজরকে সরে যেতে বলতেই তিনি যেন থতমত হয়ে দ্রুত এগিয়ে পার্কিং লটের দিকে চলে এলেন। অর্জুন দেখল, ও একেবারে উলটো বুঝলি রাম-এর অবস্থা। সে ট্রলির ঝুড়ি থেকে প্যাকেটগুলো বের করে হনহনিয়ে চলে এল পার্কিং লটে। এখানে এখন দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির সংখ্যা গোটা পনেরোর বেশি হবে না। সে চিৎকার করে মেজরকে বলল, “ওই ভ্যানটার পেছনে দাঁড়িযে থাকুন। ওরা আসছে।”

ঘাড় ঘুরিয়ে অবশ্য এখনও ওদের বেরিয়ে আসতে দেখল না।

মেজর তার কথা শুনেছেন। অর্জুন দেখল একমাত্র ভ্যানটার পেছনে যাওয়া ছাড়া এখানে ওদের নজর এড়িয়ে থাকা যাবে না। প্যাকেটগুলো নিয়ে সে চলে এল জিপটার পাশে। কাচের জানলা দিয়ে তাকাতেই সে চমকে উঠল। পেছনের সিটের ওপর সেই সাপের ঝুড়িটা রয়ে গেছে। অথচ আজ সে গাড়ির কাছে পৌঁছনো সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র আওয়াজ করছে না প্রাণীগুলো। ওরা কি তবে ঝুড়ির মধ্যে নেই? অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোক দুটো সুপার মার্কেটের দরজা দিয়ে বের হচ্ছে। সে চটপট জিপের পিছনে চলে এল। মাল রাখার একটা খোপ পেছনে রয়েছে যা এখন তালাবন্ধ। ওরা নিশ্চয়ই কিনে আনা জিনিসপত্র রাখতে গাড়ির পেছনে আসবে। অর্জুন ঘুরে ডান দিকের চাকার কাছে চলে এসে বাতাস বের হবার মুখটা প্রাণপণে খুলতে লাগল। শেষ মুখটা ঘুরবার আগেই সে ছিটকে সরে এল পাশের গাড়ির পিছনে। ওরা ততক্ষণে চলে এসেছে।

দোহারা লোকটা জিপের পেছনে এসে জড়ানো গলায় কিছু বলতেই প্যাকেট হাতে লোকটা চাবি ঘোরাল। অর্জুন যে গাড়ির পাশে লুকিয়েছিল সেটা খুব নিচু। হাঁটু মুড়ে বসতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। দোহারা লোকটা চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। অর্জুন যথাসম্ভব নিজেকে লুকিয়ে মাঝে-মাঝে নজব রাখছিল। খোপের দরজা খুলে লোকটা একটা সুটকেস বের করে নীচে রেখে খাবারের প্যাকেটগুলো সেটার ভেতর ঢুকিয়ে আবার ঢাকনায় তালা লাগাল। তারপর ফিরে যাওয়ার সময় সুটকেস তুলতেই ওটা চওড়াভাবে অর্জুনের চোখের সামনে এক মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই সরে গেল। ওরা সুটকেসটা সিটের পাশে রেখে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অর্জুনের বুকের ভেতর তখন ড্রাম বাজছে। সুটকেসের ওপর স্পষ্ট লেখা দেখতে পেয়েছে, স্ট্রেঞ্জি। ওটা স্ট্রেঞ্জির সুটকেস! স্ট্রেঞ্জির সুটকেস এদের সঙ্গে কেন? শুধু এই কারণেই তো ওদের ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়! চাকার মুখ ভাল করে খোলা হয়নি, নইলে গাড়িটা দাঁড়িয়ে যেত এতক্ষণে, আর এইসময় অর্জুন পিঠে কারও হাতের ছোঁয়া পেল। মেজর মনে করে মুখ ফেরাতেই লোকটা চোখ ছোট করে তাকাল, "হোয়াট হ্যাপেনড মাই ডিয়ার বয়? আমার এলাকায কেউ নাক গলাক তা আমি একদম পছন্দ করি না যে!"

বেশ রোগা, চোয়াল-ভাঙা লোকটার পরনের কোটটায় বেশ কয়েকটা ফাটল, রংচটা প্যান্ট আর পায়েব জুতোর অবস্থা খুবই করুণ। কিন্তু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং কথা বলার মধ্যে দিব্যি মাতব্বরি। অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আমি তো কারও এলাকায় কিছু করতে আসিনি!"

হঠাৎ লোকটা খিকখিক করে হেসে উঠল, "ইয়ার্কি। নিজের চোখে দেখলাম, গাড়ির চাকার হাওয়া লোপাট করছ। কিন্তু কেন? কারও জানলা খোলা থাকলে খিদে পেলে আমি এক-আধটা প্যাকেট তুলে নিই, কিন্তু চাকার হাওয়া খুললে কী লাভ হবে বুঝতে পারছি না। যাহোক, এবার কেটে পড়ো চাঁদ। খুব ভাগ্য যে, টায়ার ফেঁসে যায়নি, নইলে ড্রাইভারকে বলে দিতাম তোমার কীর্তির কথা।"

"কেন বলতেন?" অর্জুনের বেশ মজা লাগছিল লোকটার কথা বলার ধরনে।

"বকশিশ দিত।" লোকটা হাত বাড়াল, "সিগারেট আছে?"

আর এই সময় মেজর চলে এলেন কাছে। লোকটা দেখে একটুও পাত্তা না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চলে যেতে দিলে কেন? ধরে পুলিশে হ্যান্ডওভার করার সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিত হয়নি।"

অর্জুন বলল, "কিছু করার ছিল না। ওরাই যে আমাদের পেছনে লেগেছে, তার কোনও প্রমাণ নেই। অন্তত এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। চলুন।" ওরা কথা বলছিল বাংলায়। চোয়াল-ভাঙা লোকটা

জুলজুল করে দেখছিল ওদেব, এবং কথাবার্তার অর্থ অবশ্যই বুঝতে পাবছিল না। এবার ওদের চলতে দেখে এগিয়ে এল চটজলদি, "হেই জেন্টলমেন, অন্তত একটা পাউন্ড ছাড়ো।"

মেজর প্রায় মারমুখী হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, "কে হে তুমি ? তোমাকে খামোখা পাউণ্ড দিতে যাব কেন ? যাও, নিজের কাজ করো গিয়ে।"

লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে খিকখিক করে হাসল আবার, "ওই লোক দুটোকে দেখে অমন চোরের মতো লুকিয়েছিলে কেন ? ঠিক আছে। আমি পুলিশ-স্টেশনে যাচ্ছি। গিয়ে বলব, তোমরা কী করছিলে।"

মেজর লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু অর্জুনের মনে হল, এই উটকো ঝামেলার জন্য পুলিশ-অফিসাররা তাদের সন্দেহের চোখে দেখবেনই। সে একটু নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার কথা পুলিশ-অফিসাররা শুনবে বলে মনে করো ?"

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল, "তা শুনবে না। আমাকে তো ওখানে ঢুকতে দিতেই চায় না। তবু বলব। চেঁচিয়ে বলব, যাতে ওরা তোমাদের ব্যাপারটা জানতে পারে।"

পুলিশ-স্টেশনের সামনে মিসেস গ্রান্ট এবং তার বান্ধবী দাঁড়িয়ে আছেন। রোদ নেই, ছায়া আরও ঘন হয়েছে। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে বলল, "চেঁচিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বলে পাউন্ড পাবে ?"

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল লোকটা, "না। পাব না।"

মেজর খিচিয়ে উঠলেন, "কেন ওর সঙ্গে কথা বলে মেজাজ খারাপ করছ ?"

অর্জুন হাসল, "না, মেজাজ খারাপ হবে কেন ? আপনি মিসেস গ্রান্টদের সঙ্গে কথা বলুন। আজ রাত্রে আমরা এখানকার মোটেলেই থাকব। আমি আসছি।"

মেজর খুব বিরক্ত মুখে এগিয়ে গেলে অর্জুন লোকটাকে বলল, "আমরা চোর-বদমাশ নই। তুমি সত্যি পাউন্ড রোজগার করতে চাও ? আমি কাউকে ভিক্ষে দিই না। তবে তুমি যদি কাজ করে দাও, তা হলে আমি তোমাকে দুটো পাউন্ড দিতে পারি।"

"কাজ ! না, না, পরিশ্রম করা আমার দ্বারা চলবে না।"

"সেটা তোমার সমস্যা ! বুঝতেই পারছ, চোর হলে আমরা পুলিশ-স্টেশনে আসতাম না। এখন তুমি বলার আগেই আমরা মিথ্যে বলে তোমায় বিপদে ফেলতে পারি।"

লোকটা ঠোঁট ওলটাল। "বিপদে কী ফেলবে ? পুলিশ যদি ক'দিন লক-আপে রাখে, তা হলে তো আমারই মজা। খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না। তা কাজের কথাটা কী বলছিলে ?"

অর্জুন লোকটাকে ভাল করে লক্ষ করল। প্রচণ্ড সেয়ানা। কিন্তু দাগি

অপরাধী নিশ্চয়ই নয়, নইলে এই পুলিশ-স্টেশন পর্যন্ত আসতে সাহস করত না। সে বলল, "তুমি তো তখন আমাদের লক্ষ করছিলে, কিন্তু গাড়িতে যারা মালপত্র তুলল তাদের ভাল করে দেখেছ?"

"তা দেখব না? লম্বা লোকটাকে মনে নেই, তবে ওর সঙ্গীটা, ওকে ভুলব না। আমাকে যদি একটা ঘুসি মারে নির্ঘাত উড়ে যাব।" লোকটা চোখ বন্ধ করে বলল, "আর হ্যাঁ, গাড়িটাকেও মনে রেখেছি।"

"ভাল। আমার মনে হচ্ছে ওরা আজ এই অঞ্চলেই থাকবে। কোথায় আছে খোঁজ নিয়ে যদি আমাকে জানাও, তা হলে দু' পাউন্ড পাবে। আমরা এখানকার মোটেলে উঠছি।"

লোকটা সেই বিরক্তিকর খিকখিক হাসিটা হাসল। "হেই মিস্টার, তুমি আমাকে খাটিয়ে কেটে পড়ার মতলব করছ না? এখানে তিনটে মোটেল আছে। তার কোন্‌টায় তোমরা থাকবে?"

অর্জুন বিপাকে পড়ল, "এখনও ঠিক করিনি ভাই।"

লোকটা মুখ এগিয়ে আনল, "তা হলে তোমাকে একটা কথা বলি। ভুলেও জ্যাকের ওখানে উঠো না। ও আমার কাজিন। আসলে সম্পত্তিটা আমারই ছিল, ও নিয়ে নিয়েছে। আমার ঢোকা নিষেধ। এবার রইল 'রিসর্ট' আর 'ভ্যালি ভিউ'। রিসর্টে বড়লোকেরা ওঠে। তোমরা বরং ভ্যালি ভিউতে উঠো। চারজন আছ তো! ঠিক আছে, আমি খবর দিয়ে রাখছি।"

"না, না, তোমাকে খবর দিতে হবে না।"

"আশ্চর্য! তুমি তো খুব বাজে লোক! খবর দিলে তোমরা যে ভাড়া দেবে, তার একটা কমিশন মোটেলের মালিক ম্যাস আমাকে দেবে। তোমাদের কী ক্ষতি হল? লোকটা পিছু ফিরে কয়েক পা হেঁটে চিৎকার করল, "হেই ম্যান, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।"

"অর্জুন।"

"ও-ও— !" লোকটাকে হতাশ দেখাল। তারপর বলল, "ওই মোটকাটার নাম কী? তোমারটা আমি উচ্চারণ করতে পারছি না।"

"মেজর!" উত্তর দিয়ে অর্জুন হেসে ফেলল। লোকটা এবার খুশি হল, "দ্যাটস গুড।"

মিসেস গ্রান্ট চাইলেন সেদিনই বোস্টনে ফিরে যেতে। কারণ তার বান্ধবীর পক্ষে বিনা নোটিসে বাইরে রাত কাটানো সম্ভব নয়। পুলিশ-স্টেশনের ঝামেলা আপাতত মিটলেও ওঁকে হয়তো আবার এখানে আসতে হবে। গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগিয়ে তিনি রাস্তার একপাশে সেটাকে দাঁড় করালেন। এখন ঘড়ি অনুযায়ী রাত নেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখানে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ নেভানো আলোয় পৃথিবী দৃশ্যমান থাকে। মিসেস গ্রান্ট তাঁর ব্যাগের ভেতর থেকে ব্যাঙ্ক থেকে

নিয়ে-আসা কাগজটা বের করলেন, "ইটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে, একটা ম্যাপ এবং কিছু কোড লেখা আছে এতে। তোমরা কি ইন্টারেস্টেড ?"

অর্জুন হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। খুব আগ্রহ নিয়ে সে চোখ রাখল মিসেস গ্রান্টের কপি করে নিয়ে আসা লেখাটার ওপর। মেজর নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তার পাশে বসে ছিলেন। এমনকী, কাগজটার দিকে তাকাচ্ছিলেনও না। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে অর্জুন ভাঁজ করে কাগজটা বুক-পকেটে রাখল। মিসেস গ্রান্ট সামনের সিটে বসে ওর দিকে মুখ ফিবিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, "তোমরা কি আজ ব্ল্যাকপুলে ফিরে যাবে ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, না। আমরা আর পিছু ফিরব কেন ? এখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে মিস্টার মার্শালের ওখানে চলে যাব।"

"তা হলে তোমাদের জন্যে একটা হোটেলের ব্যবস্থা করতে হয়।" গাড়ি চালু করলেন মিসেস গ্রান্ট।

অর্জুন তাঁকে চটপট জানিয়ে দিল, "হোটেল নয়, মোটেল।"

আসলে সে মোটেলে কোনওদিন থাকেনি। হোটেল এবং মোটেলের পার্থক্য নিজের চোখে দেখাও হয়নি। ভাবতবর্ষে মোটেল বলে কোনও থাকার জায়গা চালু আছে কি না তাও তার জানা নেই। সে মিসেস গ্রান্টকে বলল, "এখানে তিনটে মোটেল আছে। আপনি ভ্যালি ভিউ-তে চলুন।"

এবার মেজর নড়েচড়ে বসলেন, "আরে ! তুমি নাম জানলে কী করে ?"

অর্জুন হাসল, "জেনে ফেলেছি।"

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বেশির ভাগ সময় চুপ করে থাকেন। এবার তাঁর বন্ধুকে বললেন, "শুনেছি এখানে একটা ভাল জায়গা আছে রিসর্ট নামে।"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয় ভ্যালি ভিউতে থাকাটাই সুবিধেজনক।" পথের পাশে লাগানা বোর্ডে চিহ্ন দেওয়া আছে আশেপাশে কী পাওয়া যাবে। কাউকে জিজ্ঞেস না করেই সেই চিহ্ন দেখে মিসেস গ্রান্টের গাড়ি এসে থামল ভ্যালি ভিউ মোটেলের সামনে। একটা ছোট লন, কিছু গাড়ি এবং দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পেছনে একতলা আউট হাউস গোছের বাড়ি। ওপরে লেখা, 'মোটেল ভ্যালি ভিউ'।

জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলে মিসেস গ্রান্ট বললেন, "আমি কাল সকাল ছ'টায় টেলিফোন করব। যদি কোনও সমস্যা হয় তা হলে আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবে।" বলতে-বলতে তিনি ব্যাগ খুললেন, "মেজর, আমার শুভেচ্ছার নিদর্শন তোমার বুকে রেখে দিও।"

অর্জুন দেখল, একটা লাল গোলাপ ভদ্রমহিলা মেজরকে দিলেন ব্যাগ

থেকে বের করে। গাড়িটা চলে গেলে ওরা জিনিসপত্র নিয়ে মোটেলের অফিস-রুমে চলে এল। অর্জুন দেখল মেজর বারংবার গোলাপের ঘ্রাণ নিয়ে বলছেন, 'বিউটিফুল'।

এই সময় একটা লোক হাহা করে হেসে উঠল। অফিসঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বিশাল চেহারার লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। লাল গেঞ্জি, হাতে নানান উলকি। লোকটা হাসি থামিয়ে বলল, "হেই মিস্টার, প্যাকেটের বাইরে গন্ধ পাচ্ছ ? দিনদুপুরে আর-একটা মাতাল এল।" মেজর খুব খেপে গেলেন, "কী, আমি মাতাল ? আমাকে মাতাল মনে হচ্ছে ?"

এইরকম গায়ে পড়া রসিকতায় অর্জুনও বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু মেজরের দিকে তাকিয়ে সে অবাক। এতক্ষণ মেজরের হাতে যা গোলাপ বলে মনে হচ্ছিল, তা লাল মোড়কের চকোলেটে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এবং তখন মেজরও সত্যিটাকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তিনি অর্জুনকে বললেন, "যাওয়ার আগে এই ম্যাজিক-রসিকতা করে গেল ? হাইওয়েতে শিক্ষা হয়নি। কিন্তু তুমি বুঝতে পেরেছিলে এটা ফুল নয় ?" অর্জুন মাথা নাড়ল।

হোটেলের চেয়ে বেশ শস্তা। ওই উলকি-পরা লোকটাই ম্যানেজার। খাতায় নামটাম লিখে দেওয়াল থেকে একটা চাবি বের করে মেজরের সামনে রেখে সে বলল, "চারজন ইন্ডিয়ানের আসার কথা ছিল। যাব একজনের নাম মেজর। দু'জন কমে গেল কেন ? আমি ফোর-বেডেড রুম রেখেছিলাম।"

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেজর ঝুঁকে দাঁড়ালেন টেবিলের ওপর, "আমার ডাকনাম জানলে কী করে হে ? না অর্জুন, মনে হচ্ছে এখানেও গোলমাল আছে।"

অর্জুন হাসল, "আপনি কি স্যাম ?"

"ইয়েস।" ম্যানেজার হাসল, "ইউ মেট টিম ? টিম দ্য বেগার ?"

লোকটার নাম তা হলে টিম ? অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

স্যাম বলল, "টিম ফোনে তোমাদের কথা বলেছিল। কিন্তু দু'জন কমে যাওয়াতে আমার ঝামেলা বাড়ল। কবে যাবে তোমরা এখান থেকে ?"

"কাল সকালেই।" অর্জুন জানাল। লোকটাকে ওইরকম চেহারা সত্ত্বেও তার মন্দ লাগছে না। "এদিকে ভারতীয়রা কদাচিৎ আসে। আমার মায়ের বাবা অনেকদিন সিমলায় ছিল। ইউ নো সিমলা। ইনফ্যাক্ট মাই মাদার ওয়াজ বর্ন দেয়ার। খোঁজ নিলে দেখবে আউট অব টেন ব্রিটিশ ফ্যামিলিজ অন্তত দুটো ফ্যামিলির লোক ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল।" স্যাম হাসল। অর্জুনের একটু রাগ হল কথাটা শুনে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করেছিল এই কথাটা কি একটু ঘুরিয়ে বলে লোকটা খোঁচা দিল। সে ওই

কথা তুলতে স্যাম হাত নাড়ল, "আরে ম্যান, তোমার পূর্বপুরুষরা বোকামি করেছিল বলে আমার পূর্বপুরুষরা সুবিধে পেয়েছিল। তোমার পূর্বপুরুষরা ইউনাইটেড ছিল না বলেই অমন কাণ্ড ঘটেছিল। আমাদের সঙ্গে তাব কী সম্পর্ক ?"

চাবি নিয়ে নম্বর খুঁজে-খুঁজে শেষ ঘবটিতে যখন ওরা ঢুকল, তখন সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে। বাইরে পাতলা অন্ধকার ফিনফিনে মশারির মতো টাঙানো। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। ঘরের ভেতরটা আহামবি নয়। দুটো বিছানা আছে বটে, কিন্তু তাব অবস্থাও জলপাইগুড়ির হোটেলের তুল্য। একটা রুম-হিটার রয়েছে। মেজর ধবাচুড়ো ছেড়ে বিছানায় শবীর ফেলতে সেটা প্রতিবাদ করে উঠল। গায়ে না মেখে মেজর বললেন, "খুব টায়ার্ড ! আজ সারাদিন যা ধকল গেল ! খাবারগুলো খেয়ে সাততাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাক।"

ক্লান্তি লাগছিল. কিন্তু তাব চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল খাবারের। টয়লেটের বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে গরমজলেব দেখা পেয়ে খুশি হল অর্জুন। ঘবে ফিবে এসে সুপাব মার্কেট থেকে কিনে আনা খাবারগুলো নিয়ে বসে সে মেজরকে জিজ্ঞেস করল, "মিসেস গ্রান্টের এনে দেওয়া কাগজটা সম্পর্কে আপনি তখন একটুও ইন্টারেস্ট দেখালেন না যে !"

একমুখ খাবাব চিবোতে চিবোতে মেজর বললেন, "তোমার সেকেন্ড হ্যান্ড জুতো কেনার পর থেকেই একটার পর একটা ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে। মার্শালের কাছে আমাব পৌঁছনোর কথা কবে আর আমি এখন কোথায় আছি !"

অর্জুন বুঝতে না পেবে জিজ্ঞেস করল, তাঁর সঙ্গে ইন্টারেস্ট না নেওয়ার কী আছে ?"

"আরে ! জুতো কেনার পর থেকেই কেউ না কেউ আমাদের বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে। তারা আছে অথচ সামনাসামনি তাদের সঙ্গে লড়াই কবতে পারছি না। এরকম কাঁহাতক ভাল লাগে !" মেজর খেয়ে যাচ্ছিলেন।

"আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না।" শান্ত মুখে অর্জুন বলল।

"তোমাকে তো বুদ্ধিমান বলে জানতাম হে। আজ সুপার মার্কেটের সামনে বদমাশটাকে পেয়েও তুমি ছেড়ে দিলে কেন ? ল্যাঠা চুকে যেত ওদের পুলিশের হাতে তুলে দিলে !" মেজরের মুখ এবার ভারী। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল সত্ত্বেও সেই অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি।

"আপনাকে তো বলেছি কারণটা। প্রথমটা ওদের ধরা আমাদের দু'জনের পক্ষে কতটুকু সম্ভব হত, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত, ওদের দোষী করার মতো কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।"

মেজর মাথা ঝাঁকালেন, "যাই বলো, তারপর থেকেই আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। কী লেখা আছে কাগজটাতে?"

অর্জুন বাঁ হাতে বুক পকেট থেকে কাগজটা বের করে সামনে রাখতেই মেজর এঁটো হাতেই ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। আলোর দিকে কাগজটা ধরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "ইউরেকা! এই লেখাটা নির্ঘাত ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল। ইয়েস। ইন্ডিয়া, মানে, যদি বাংলাদেশে যায়, তা হলেও অবাক হবার কিছু নেই।"

অর্জুন হতভম্ব, "ওই কোড-ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে এত কথা জেনে ফেললেন?"

"ওহো অর্জুন, তুমি যদি পরিষ্কার দেখতে পাও, তা হলে আমার অভিজ্ঞতার দাম থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যে-অভিযাত্রী মানুষটি এই নোট লিখে গেছেন, তিনিও চাননি সাধারণ মানুষ চট করে বুঝে নিক তিনি কী বলতে চাইছেন।" মেজর ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছিলেন। কাগজটা হাতে নিয়ে প্রথমে জানলার দিকে তাকালেন, তারপর দরজার। এবার ঠোঁট চাটলেন। তারপর নিচু গলায় অনুরোধ করলেন, "অর্জুন, সাবধানের মার নেই। এসব নিয়ে আলোচনা করার আগে দরজা-জানলার ওপারে কেউ আড়ি পেতেছে কি না দেখে নেবে?"

অর্জুনের এবার মজা লাগল। এতক্ষণ বাদে মেজর যেন একটু ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। সে উঠে জানলার ওপাশে কাউকে দেখতে পেল না। মেজর বলে উঠলেন, "দরজাটা, মনে হচ্ছে, দরজার বাইরে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে।"

হাসি চেপে অর্জুন দরজা খুলল। এবং তার নজরে এল লম্বা বারান্দা দিয়ে কেউ একজন হেঁটে আসছে। অর্জুনকে দেখতে পেয়ে লোকটা হাত তুলল, "হেই ম্যান?"

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, "হেলো!" ঘরের ভেতর থেকে মেজর বলে উঠলেন, "দ্যাখো, আমার সিক্সথ্ সেন্স বলছিল কেউ আড়ি পেতে শুনছে। লোকটা কে?"

ততক্ষণে টিম এসে পড়েছে কাছে, "এবার দুটো পাউন্ড দাও।"

অর্জুন বলল, "আগে কী কাজ করেছ বলো, তারপর ভাবা যাবে।"

টিম হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠল, "ওসব ভাবাভাবির মধ্যে আমি নেই। তুমি আমাকে একেবারে সাপের গর্তে পাঠিয়েছিলে। তোমাদের কথা ওখানে বলে আমি আরও বেশি রোজগার করতে পারতাম। নেহাত ওই মোটকাটা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলল। দাও, দাও।"

ততক্ষণে মেজর এসে দাঁড়িয়েছেন অর্জুনের পাশে। টিমকে দেখেই তাঁর মেজাজ চড়ল, "ও। তুমি? তখন থেকে আমাদের পেছনে লেগেছ?

আড়ি পেতে কথা শোনা হচ্ছিল ? তোমাকে আমি পুলিশের হাতে যদি না তুলে দিই!"

অর্জুন তাড়াতাড়ি বাধা দিল, "মেজর প্লিজ। ইনি আড়ি পাতেননি। আমিই একটা কাজে ওকে পাঠিয়েছিলাম। ঠিক আছে টিম, বলো কী খবর ?"

"না। আর না। যথেষ্ট হয়েছে। এই দেড়েলটা আমাকে অপমান করেছে।"

"তুমি ভুল ভাবছ। আসলে উনি একটু উত্তেজিত ছিলেন।"

টিম হঠাৎ মেজরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। ওর দৃষ্টি মুখ থেকে সরছিল না। মেজর খুব অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আবে, আমার দিকে ওভাবে তাকাবার কী দরকার ?"

টিম নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমি কাউকে বলব না। তোমার দাড়ি কি নকল ?"

"নকল ? আমার দাড়ি নকল ? এ হতভাগা বলে কী ?" মেজর আঁতকে উঠলেন।

টিম মাথা নাড়ল, "কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক তোমার মতো দেখতে একটা লোককে আমি 'ভিলেজ পাব'-এ দেখে এলাম। দুটো মানুষের চেহারা একরকম হয় না। নিশ্চয়ই একজন আর-একজনকে নকল করছে।"

অর্জুন বলল, "তা হলে পুলিশ ওকে আর ধরে রাখেনি। এ-দেশের পুলিশ দেখছি আগেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। ছেড়ে দাও এসব কথা, টিম, বলো কী খবর ?"

"পাঁচ পাউন্ড লাগবে। তার এক পেনি কম নয়। এই লোকটা আমাকে অপমান করেছে।"

"পাঁচ পাউন্ড? মামাব বাড়ি।" খেঁকিয়ে উঠলেন মেজর। অর্জুন অনেক চেষ্টায় মেজরকে শান্ত করে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে টিম বলল, "আমাদের সরকারের কী হাল! নইলে এইবকম বদমেজাজি লোককে কী করে ভিসা দেয়! তুমি ভাল ব্যবহার করছ বলে কথা বলছি। পাঁচ পাউন্ড দাও, তারপর খবর শুনবে। আজকাল মানুষকে বিশ্বাস করি না।"

অর্জুন ঝুঁকি নিল। পাঁচটা পাউন্ড বের করে এগিয়ে ধরতেই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল টিম। নোটটা দেখে ভাঁজ করে কোমরের কাছে তৈরি করা পকেটে গুঁজে ফেলল। তারপর বলল, "ওই ঢ্যাঙা লোকটা হল হ্যাচ। ও নাকি প্রোফেসর। ওর সঙ্গীটির পরিচয় জানি না। দু'জনে এক ঘরে ওঠেনি। গাড়ি থেকে মালপত্র নিয়ে সঙ্গীটা প্রোফেসরের ঘরে রেখে এসেছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা কোথায়, মানে কোন হোটেলে উঠেছে ?"

টিম হাসল। তারপর বলল, "একটু সামনে এগিয়ে বাঁ দিকে তাকালেই জিপটাকে দেখতে পাবে।"

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, "তার মানে? এই মোটেলেই উঠেছে?"

টিম বলল, "চোখ মেলে হাঁটো ছোকরা। তা হলে অবশ্য আমি পাঁচ পাউন্ড পেতাম না। দশ আর এগারো নম্বর ঘর। কোথাও না পেয়ে তোমায় খবর দিতে এসে এখানেই পেয়ে গেলাম। গুড নাইট।" শিস দিতে-দিতে লোকটা চলে গেল।

দরজাটা বন্ধ করে অর্জুন বলল "দারুণ ব্যাপার। যারা আমাদের অনুসরণ করছে, তারা এই মোটেলেই রয়েছে। ওদের নেতার একটা জিপ আছে, একটি স্বাস্থ্যবান দেহরক্ষী আর পোষা সাপ সঙ্গে রাখছে।"

মেজর মাথা নাড়লেন, "তা হলে এরা তারা নয়।"

"মানে?" অর্জুন মেজরের এত নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না।

"মনে করে দ্যাখো, বোস্টনের কাছে হাইওয়ের ডিপার্টমেন্টাল শপে দু'জন লোক জুতোর সন্ধানে এসেছিল। তাদের চেহারার সঙ্গে এদের কোনও মিল নেই। জিপে যে কাণ্ডটা ঘটল সেখানে আরও বেশি লোক ছিল। সেইরাত্রে সমুদ্রের ধারে আলোর সঙ্কেত দেখে তোমার কি মনে হয়নি একটা বড় দলের কাজ এটা?" দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে চোখ বন্ধ করে কথাগুলো বলছিলেন মেজর।

"কিন্তু মেজর, জিপটা প্রোফেসর হ্যাচের। তিনি মিসেস গ্রান্টের কথা বলছিলেন। ব্ল্যাকপুলের হোটেলে উনি বলেছেন যে, ওঁর বাড়ি বোস্টনে। সেই জিপের মধ্যে সাপের গর্জন আমি শুনেছি। এখন জিপটা দাঁড়িয়ে আছে, এই মোটেলের পার্কিং লটে।" অর্জুন বোঝাতে চাইল।

মেজর চোখ খুললেন, "তাও তো বটে। তোমার কথাটা মেনে নিলে বুঝতে হবে, একটা বড় দল ওই জুতোর ভেতর রাখা কাগজটার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাকিরা কোথায়?"

"এখানে কি থাকার জায়গার অভাব?"

"তা হলে তো পুলিশকে জানাতে হয়।"

"কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন?" অর্জুন হাসল, "তার চেয়ে এক কাজ করুন। সোজা প্রোফেসরের দরজায় নক্ করে জিজ্ঞেস করুন যে, কেন তিনি আমাদের সঙ্গ ছাড়ছেন না?"

"মাথা খারাপ। ভদ্রলোক যখন সাপ পোষেন!"

"আপনি সাপকে খুব ভয় পান?"

"বিন্দুমাত্র নয়। আমার সঙ্গেই বিষ আছে দেখছ।"

"তা হলে এসব কথা ছেড়ে দিন। এরা তো সরাসরি আমাদের ওপর

হামলা করছে না ! এবার আসুন, ওই কাগজটিতে কী লেখা আছে, শোনা যাক !"

"কেউ যদি আড়ি পেতে শোনে ?"

নিজের ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি আর কলম বের করে মেজরের দিকে এগিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, "বাংলায় লিখে দিন। এখানে কেউ পেলেও মানে বুঝতে পারবে না।"

খুশি হয়ে মিসেস গ্রান্টের কপি করে আনা কাগজটা সামনে রেখে কলম খুললেন মেজর। কিন্তু তারপরেই ওঁর মুখ বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে গেল। তিনি বললেন, "কিন্তু, অর্জুন, বাংলা লিখতে গেলেই যে গোলমাল হয়ে যায় আমাব। খুব বানান ভুল হয়।"

অর্জুনের হাসি পেল। মেজর দীর্ঘদিন বিদেশে আছেন, ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু জলপাইগুড়ির অনেক শিক্ষিত মানুষ কোনও কিছু লিখতে গেলে বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। সে বলল, "ভুল বানান বুঝতে আমার অসুবিধে হবে না।"

মেজর এবার একবার কাগজ দেখছেন, চিন্তা করছেন, তারপর সেটাকে নিজস্ব বাংলায় অনুবাদ করছেন। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। মেজর যে-অর্থ তৈরি করছেন, সেটা সত্যি কি না তা এই মুহূর্তে বোঝার কোনও পথ নেই। থাকলে কপি করে আনা কাগজটা ছিঁড়ে ফেলা যেত।

ইশারায় মেজর এমনভাবে ডাকলেন যেন ঘরের মধ্যেই অনেকজোড়া কান খাড়া হয়ে আছে। অর্জুন উঠে ডায়েরিটা তুলে নিল। সমুদ্র বানানে দীর্ঘ-উকার আছে। লেখাটা ঠিকঠাক বুঝতে একটু সময় লাগল। সমুদ্র। বড় ঢেউ। উত্তর দিকে একঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড়টানা নৌকোর। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর। মে মাসে সূর্য মাথার ঠিক ওপরে আসে সাড়ে বারোটায়। ডুবুরি। পাথরটা নড়েনি নোয়ার আমল থেকে। জাহাজ-বাঁধা পাথর। সুড়ঙ্গটা তার তলায়। ঢুকবে একটা মানুষ।

দু'বার পড়ল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, "সমুদ্রটা কোথায় ?"

"তা তো লেখা নেই। ফ্যাদম নটগুলো ফালতু লেখা। আসল মানেটা এই।"

"কিন্তু তা থেকে তো জায়গাটা বোঝা যাবে না। যিনি এত সতর্ক, তিনি এই সূত্র না রেখে যাবেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"তুমি কি বলতে চাইছ আমি অর্থ বুঝতে পারিনি। দ্যাখো অর্জুন, তোমার বয়স কম হলেও অনুসন্ধানের ব্যাপারটা ভাল বোঝো, কিন্তু সেই বোঝাটায় তো এখনও ম্যাচিওরিটি আসেনি। তুমি বলতে চাইছ আমার অভিজ্ঞতার কোনও দাম নেই ?" মেজরকে খুব অখুশি দেখাচ্ছিল।

"আপনার অভিজ্ঞতাকে আমি অবজ্ঞা করব কেন ? আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। পৃথিবীর কত রহস্যময় জায়গায় আপনি গিয়েছেন।

আপনার কি কখনও মনে হয়েছে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি না ?”

“না, না। তা মনে হয়নি অবশ্য। কিন্তু ওই কাগজটায় যে কোডগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা আমার খুব পরিচিত। তুমি মার্শালের সঙ্গে আলাপ হলে ওকে দেখিও, সে-ও একই কথা বলবে।”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু মেজরের ব্যাখ্যা সে মন থেকে নিতে পারছে না। একটি মানুষ কিছু দামি জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। তারপর তাঁর মনে হয়েছে, যদি পৃথিবীতে না থাকেন তবে একটা সূত্র রাখা দরকার সেটা উদ্ধার করার। তিনি সূত্রটি ব্যাঙ্কের লকারে রেখে লকারের চাবি নিজের বাড়ির বাগানে গাছের কোটরে রেখে দিয়েছেন, যাতে সহজে কারও হাত না পড়ে। এবার সেই গাছের কোটরের বিবরণ সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে নিজের জুতোর তলায় গোপন গর্ত করে রেখে দিয়েছিলেন। এত সতর্কতা যিনি পছন্দ করেছিলেন, তিনি চাননি চট করে কেউ ওই লকাব পর্যন্ত পৌঁছে যাক। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে লকারটার হদিস পাবে তাকেও তিনি বিভ্রান্ত করবেন কেন ? অতগুলো পরীক্ষায় পাশ করে যে এল, তাকে তিনি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবেন গুপ্তধন পেতে গেলে কী করতে হবে। সমুদ্র। বড় ঢেউ। উত্তর দিকে দাঁড়টানা নৌকোয় এক ঘণ্টা যেতে বলেছেন তিনি। কিন্তু কোন সমুদ্র ? তার কোন তট থেকে ? এরকম ভুল কেউ করে ? আর আকাশ এবং মাটি সমান দূরত্বে যে-কোনও সমুদ্রে গেলেই পাওয়া যাবে। মাথার ওপরে সূর্য আসার ব্যাপারটা কোনও মানে তৈরি করে না। শুধু সমুদ্রে ডুব দিয়ে একটা বিশাল প্রাচীন পাথরের সন্ধান করতে হবে যার তলায় সুড়ঙ্গ রয়েছে, এই খবরটাই ঠিকঠাক। কিন্তু শেষের এই খবর সম্বল করে তো এগনো যায় না। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল মিসেস গ্রান্টরা ব্যাঙ্কে যখন লকার থেকে মূল কাগজটা বের করে নকল করছিলেন, তখন কোনও শব্দ ভুল করে বাদ দেননি তো ! ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মেজর এরমধ্যে প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকছেন। অর্জুন উঠে নকল করে আনা কাগজটি আবার দেখল। টানা ইংরেজি নয়। যে-শব্দগুলো আছে তা ইংরেজির মতো, কিন্তু মেজর বলেছিলেন পুরনো ইংরেজি। একটা পালতোলা নৌকোর ছবি আঁকা আছে। টানা পড়তে চাইলে কোনও মানে তৈরি হয় না।

ঘুম ভাঙল নাক ডাকার শব্দেই। অর্জুন মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে সময় বুঝতে পারল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে অবাক। সাড়ে আটটা বাজে। এবং তখনই খিদেটাকে টের পেল। দরজা-জানলা বন্ধ, কিন্তু ঘরটাই যেন বরফ হয়ে আছে। সে বিছানা থেকে নেমে কাঁপতে-কাঁপতে বাথরুমে গেল। বাথরুমের জানলার পরদা সরিয়ে মনে হল পৃথিবীটা ছায়া-ছায়া, কোথাও আলোর চিহ্ন নেই।

তৈরি হয়ে অর্জুনের মনে হল, মেজরকে আর একটু ঘুমোতে দেওয়া

যাক। বয়স হয়েছে, এখন তো একটু বিশ্রাম দরকার। সে দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়াল। আকাশে চাপ-চাপ ময়লাটে মেঘ। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিও হয়ে গেছে একটু আগে। সূর্যদেবের কোনও চিহ্ন নেই। কেমন একটা আলসেমিতে জড়ানো চারধার। জলপাইগুড়ির বর্ষাকালেও এমন ভিজে সকাল আসে না। কিছু খাওয়া দরকার এবং আসার সময় মেজরের জন্যে প্যাকেট নিয়ে আসতে হবে। মোটেল ছেড়ে বারটার মধ্যে বেরোলেই চলবে। ওয়েদাব খারাপ বলে নিশ্চয়ই এখানে বাস বন্ধ হয় না।

কয়েক পা হাঁটতেই পার্কিং লটটা নজরে এল। বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে, কিন্তু প্রোফেসর হ্যাচের জিপ নেই। অর্জুন চারপাশে তাকাল। তাদের অনুসরণকারীদের কথা সে একদম ভুলে গিয়েছিল। ওরা কি ভোরবেলায় চলে গেছে ? ওরা কি টের পায়নি যে, একই মোটেলে তারাও আছে। সতর্ক পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে রিসেপশনে এসে এক বয়স্কা মহিলাকে দেখতে পেল। রেজিস্টারে কিছু লিখছিলেন, ওকে দেখে হেসে বললেন, "গুড মর্নিং।"

অর্জুন বলল, "গুড মর্নিং। আচ্ছা, এখানে খাবাবেব দোকান কোথায় ?"

"কী খাবে ?"

"ব্রেকফাস্ট।"

"গেট পেরিয়ে বাঁ দিকে মিনিট-তিনেক গেলেই রেস্টুরেন্টের সাইন দেখতে পাবে।"

"কাল যে ভদ্রলোক বিসেপশনে ছিলেন, তিনি কখন আসবেন ?"

"বারোটার পর।"

"ও। তাব আগেই অবশ্য আমবা বেরিয়ে যাব। আচ্ছা, প্রোফেসব হ্যাচরা কি চলে গেছেন ?"

"প্রোফেসব হ্যাচ ?"

"যিনি জিপে এসেছিলেন।"

"ও। হ্যাঁ। একটু আগেই ওরা বেরিয়ে গেলেন।" মহিলা বললেন, "আপনি ওঁকে চেনেন ?"

"না। তবে নাম শুনেছি।"

"ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন পরে আবার এখানে এলেন।"

"আগে বুঝি খুব আসতেন ?"

"দু-তিন বছর আগে।"

মহিলার কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন গেটের দিকে হাঁটা শুরু করতেই কনকনে হাওয়ার মধ্যে পড়ল। যদিও বৃষ্টি নেই, তবু ঠাণ্ডাটা যেন হাড়ের ভেতরে ঢুকছে। প্রোফেসর হ্যাচ দু-তিন বছর আগে খুব আসতেন এখানে। যে অভিযাত্রীটি গুপ্তধন রেখেছেন, তিনি গত হয়েছেন ওই

সময়েই। তা হলে কি সমুদ্রটা এই তল্লাটেই। হ্যাচ যেটা আন্দাজ করতে পারছেন, কিন্তু সঠিক হদিস পাচ্ছেন না।

ব্যাপারটা ভাবতে-ভাবতে অর্জুন রেস্টুরেন্টের কাঁটা চামচের সাইনবোর্ড দেখতে পেল। রাস্তা ছেড়ে সে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। এই ঠাণ্ডার সকালে কোনও খদ্দের নেই। বৃদ্ধ দোকানদার মাথা নাড়লেন। মেনুবোর্ড দেখে অর্জুন দু'পাউন্ডের মধ্যে খাবারের অর্ডার দিয়ে কোণার টেবিলে বসল। এখান থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। এবং সেই ভিজে রাস্তায় একটিও মানুষ নেই। কাউন্টারে বৃদ্ধের মাথার ওপর টি-ভি চলছে। বিবিসির খবর হচ্ছে সেখানে। অর্জুন কিছুক্ষণ মন দিয়ে খবর শোনার চেষ্টা করল। রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো তার মোটেই ভাল লাগে না। সে আবার রাস্তার দিকে তাকাল। এখানকার মানুষেরা কি কাজ আর বাড়ি ছাড়া কিছু বোঝে না? এইসময় খাবার দিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। অর্জুন তাঁকে একই খাবার প্যাক করে দিতে বলল। খিদেটা জব্বর। খাওয়া প্রায় শেষ করে নিয়ে মুখ তুলতেই সে টিভিতে সমুদ্র দেখতে পেল। অস্থির ঢেউগুলো পেরিয়ে একটা স্পিডবোট ছুটে যাচ্ছে। যিনি খবর পড়ছিলেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছে না এখন, কিন্তু গলা শোনা যাচ্ছে। স্পিডবোটটা গিয়ে একটা ছোট লঞ্চের গায়ে লাগল। বোট থেকে দু'জন সেখানে উঠে গেলেন। একজনের হাতে সানগান আর টেপ রেকর্ডার। অন্যজনের হাতে টিভি-ক্যামেরা। সংবাদপাঠক বললেন, "আমাদের প্রতিনিধিরা মিস্টার মার্শালের সঙ্গে কথা বললেন। মিস্টার মার্শাল বললেন," এবার টিভি-তে এক ইংরেজ প্রৌঢ়ের মুখ, "হ্যাঁ, শার্ক। এই তল্লাটের সমুদ্রে শার্ক এসেছে। প্রথম দিকে দিনের বেলায় আসত। এখন রাত্রে হানা দিচ্ছে। এর ফলে আমার গবেষণার কাজ খুব ব্যাহত হচ্ছে।"

প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার মার্শাল, আমরা জানি আপনি মুক্তো নিয়ে রিসার্চ করছেন। এত জায়গা থাকতে এই সমুদ্রকে বেছে নিলেন কেন?"

"আমার জানা ছিল এই সমুদ্রে কোনও সামুদ্রিক জন্তুর উৎপাত নেই। দাঁড়টানা নৌকোয় চেপে চমৎকার ঘুরে বেড়ানো যায়। কিন্তু হঠাৎ এখানে কী করে শার্ক ঢুকল বুঝতে পারছি না।"

মিস্টার মার্শালের বয়স হলেও স্বাস্থ্যটি ভাল। মুখে চাপ লাল দাড়ি। সংবাদ-পাঠক অন্য বিষয় নিয়ে বলা শুরু করতেই প্রায় লাফিয়ে উঠল অর্জুন। ওই মার্শাল নিশ্চয়ই মেজরের বন্ধু। মেজর বলেছিলেন তাঁর বন্ধু মুক্তো নিয়ে গবেষণা করছেন। অর্জুন দ্রুত কাউন্টারে চলে গিয়ে দাম মিটিয়ে প্যাকেট নিয়ে প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে চলে এল মোটেলে।

মেজর দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুব বিরক্ত। অর্জুনকে দেখামাত্র চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাঃ। আমাকে কিছু না বলে তুমি

উধাও ?”

“আপনার জন্যে খাবার আনতে গিয়েছিলাম।”

“তা যাও। যাওয়ার আগে পকেটে পাউন্ড আছে কি না দেখে যাবে তো ? হুটহাট বেরিয়ে গেলেই হল ?”

অর্জুন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, “আমাব মানিব্যাগ তো সঙ্গেই বয়েছে।”

মেজর এবার হোহো করে হাসলেন, “ও ! আমার টাকায় খেতে ইচ্ছে করছিল বুঝি ?”

“আমি আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“বাঃ। তুমি ওই নেংটি ইঁদুরটাকে পাঠাওনি আমাব কাছ থেকে দশ পাউন্ড চেয়ে ?”

“নেংটি ইঁদুর ?”

“ওঃ। কাল যে তোমার দূতেব কাজ করেছিল। লোকটা এসে বলল, তাড়াতাড়ি দশ পাউন্ড দিন, উনি খাবারের দোকানে আটকে আছেন।”

“লোকটা বলল আর আপনি দিয়ে দিলেন ?”

“মানে ? তুমি ওকে পাঠাওনি দশ পাউন্ডের জন্যে ?”

“না। আমি কাউকে পাঠাইনি।”

“সে কী ! আমি তো ওকে সন্দেহ করিনি একফোঁটাও।”

দশ পাউন্ড কম কথা নয়। খাবার খেতে বসেও মেজরের চোখ দেখার মতো ছিল। বারংবার বলে যাচ্ছিলেন, “লোকটা বেমালুম ঠকিয়ে দিল আমাকে ? বুঝলে হে, দেখার চোখটাই বড়, অভিজ্ঞতার বড়াই করে কোনও লাভ নেই। ও হ্যাঁ, দশ পাউন্ড নিয়ে চলে গিয়েও লোকটা আবার ফিরে এসেছিল। ওই খামটা দিয়ে গিয়েছে। বলেছে তুমি এলে তোমায় দিতে।”

টেবিলের ওপর রাখা ছোট খামটা দেখল অর্জুন। এই মোটেলের রিসেপশনে যে খামগুলো রাখা আছে তারই একটা দিয়ে গেছে লোকটা। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে খামটা তুলে বুঝল ভেতরে কাগজ আছে। সে কাগজটা বের করতেই খুব খারাপ হাতের লেখায় লোকটার বক্তব্য পড়ল, “ডিয়ার মিস্টার ব্রাদার অব মেজর। তোমার দাদাকে ঠকিয়ে আমি দশ পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি না। তোমরা যাদের ভয় পাচ্ছ তারা আজ সকালেই সমুদ্রের দিকে রওনা হয়েছে। এই খবরটার দাম দশ পাউন্ডের বেশি হবে। কী বলো ? নীচে কোনও নাম-সই নেই।” অর্জুন হেসে ফেলল। সুপারমার্কেটের সামনে যে লোকটা প্রায় ভিক্ষে করে কাটায়, তারও রসিকতা করার ক্ষমতা আছে। খেতে-খেতে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “হাসছ যে ?” অর্জুন চিঠিটা এগিয়ে দিল।

বাসে পাশাপাশি দুটো সিট পাওয়া যায়নি। মোটেল থেকে বেরোবার

পথে অর্জুন মেজরকে বি বি সির খবরটার কথা বলেছিল। মেজর খবরটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, "দূর! এখানে শার্ক আসবে কোত্থেকে? মার্শালের বড় সন্দেহবাতিক। আর ওকে তো আমি চিনি, সবসময় নিজের পাবলিসিটি চায়। তুমি ঠিক বুঝেছ ওই মার্শাল আমাদের মার্শাল?"

অর্জুন বলল, "মুক্তোর গবেষণা করছেন। মুখে লাল দাড়ি, ভাল স্বাস্থ্য।"

"মিলছে। তা স্বাস্থ্য ওর কী এমন! পাঁচ বছর আগে আমাকে দেখলে বুঝতে পারতে স্বাস্থ্য কাকে বলে।" মেজর গর্বিত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন।

জানলা দিয়ে ইংল্যান্ডের গ্রামের খেত দ্রুত সরে-সরে যেতে দেখল অর্জুন। চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ চলকে উঠল যেন। বিবিসির প্রতিনিধির কাছে মার্শালসাহেব আজ বলেছেন, "আমার জানা ছিল এই সমুদ্রে কোনও সামুদ্রিক জন্তুর উৎপাত নেই। দাঁড়টানা নৌকোয় চেপে চমৎকাব ঘুরে বেড়ানো যায়।" দাঁড়টানা নৌকোর কথা হঠাৎ বললেন কেন মার্শালসাহেব! লকারের কাগজটিতেও তো দাঁড়টানা নৌকোর কথা বলা আছে। আজকের পৃথিবীতে যখন এতবকমের আধুনিক জলযান তৈরি হয়েছে তখন সমুদ্রে দাঁড়টানা নৌকোর ঘোরাফেরার কথাটা কি স্বাভাবিক? নাকি ওই অঞ্চলে দাঁড়টানা নৌকোয় ঘুরে বেড়ানোই রেওয়াজ! তা হলে মার্শাল সাহেব এখন যে সমুদ্রে মুক্তো নিয়ে গবেষণা করছেন সেই সমুদ্রের কথাই কি লকারে রাখা কাগজটাতে বলা হয়েছে! প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে সে একটু এগিয়ে বসা মেজরের দিকে তাকাল। মেজর এই দুপুর বেলাতেও ঘুমাচ্ছেন। পাশে-বসা এক ভদ্রলোক আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও প্রবলেম?"

অর্জুন প্রশ্ন শুনে নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বলল, "না, না তো।"

তখনই তার গুরু অমল সোমের একটা কথা খেয়াল হল। "কখনওই ওয়ান প্লাস ওয়ান করে কোনও সিদ্ধান্তে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ো না।" পৃথিবীর অনেক সমুদ্রেই হয়তো দাঁড়টানা নৌকো চলে। অর্জুন অলস হয়ে আবার বাইরের দিকে তাকাল। হঠাৎ দূরে সবুজ, জমাট সবুজের গালচে ছড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হল। জানলার কাচ বন্ধ। বাস বাঁ দিকে যখন ঘুরছে তখন ওটা হারিয়ে যাচ্ছে। আবার ডানপাশে ফিরতেই ওটা অনেক কাছে এগিয়ে আসছে। সবুজ গালচে যে সমুদ্রের চেহারা তা বুঝতে পেরে উত্তেজনাটা আবার ফিরে এল। এত শান্ত সমুদ্র, যেন ব্ল্যাকপুলকেও হার মানায়। কিন্তু যত বাস এগিয়ে যাচ্ছিল, তত ছোট-ছোট ঢেউ দেখতে পেল সে। এবং সেই ঢেউয়ের ওপর পালতোলা দাঁড়টানা ছোট-ছোট নৌকো মোচার খোলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। বাসের টার্মিনাসে পৌঁছে

গেলে যাত্রীরা যখন নামতে শুরু করেছে, তখন দুপাশে হাত ছুঁড়ে মেজর হাই তুললেন। তুলে ঘোষণা কবলেন, "এসে গেছি, বুঝলে!"

অর্জুন খানিকটা পেছনে ছিল। মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন মেজর। বাসের প্রায় সব লোক নেমে গেছে। অর্জুন এগিয়ে মেজরের পাশে পৌঁছতেই তিনি বললেন, "একটু আগে একটা মারাত্মক স্বপ্ন দেখলাম। তাই, বলছি কি, লকারেব কাগজে যাই লেখা থাক তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে কী লাভ! আমরা তো ইংল্যান্ডে গুপ্তধন খুঁজতে আসিনি।"

"কী স্বপ্ন দেখেছেন?"

"খুব খারাপ। তারপর ধরো, স্বপ্নটাকে মিথ্যে করে আমরা এককাঁড়ি মণিমুক্তো পেলাম খুঁজে। কিন্তু লাভ হবে কিছু! এ-দেশের কাস্টমস তার একরত্তি নিয়ে যেতে দেবে না। শুধু-শুধু পবিশ্রমই সার হবে। তার ওপর জীবনের ঝুঁকি।" খুব গম্ভীরভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন কথাগুলো মেজর। অর্জুন হাসল, "আমরা তো এখনও পর্যন্ত সমুদ্রটার হদিস পাইনি। অতএব ওসব চিন্তা কবে লাভ কী? স্বপ্নে কি নিজেকে মৃত দেখলেন?"

করুণ ভঙ্গিতে দু'বাব মাথা নাড়লেন মেজব।

অর্জুন বলল, "উঠুন, নিজের মৃত্যু স্বপ্নে দেখলে আয়ু বেড়ে যায়।"

"সত্যি বলছ? কিন্তু তা হলে তো সবাই নিজের মৃত্যু স্বপ্নে দেখত।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি বুঝি ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারেন?"

"তা পারি না।" এবাব মেজব লাফিয়ে উঠলেন সিট থেকে, "এত তাড়াতাড়ি মরব না বলছ?" সেইসময় একজন য়ুনিফর্মপবা লোক দবজায় মাথা গলাল, "জেন্টলমেন, টিকিটের দাম কি এখনও ওঠেনি বলে তোমাদের মনে হচ্ছে?"

তড়িঘড়ি মালপত্র নিয়ে নেমে এল ওরা। সামনেই একটা বাড়ি। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "মার্শালি সাহেবের ওখানে পৌঁছতে গেলে কি করতে হবে জানেন?"

মেজর বললেন, "অবশ্যই। জেটিতে চলো।"

পা বাড়াতে গিয়েই অর্জুন মেজরের হাত শক্ত করে চেপে তাঁকে আটকে দিল, প্রোফেসর হ্যাচের জিপ সামনের রাস্তাটা দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল।

জিপটি হ্যাচের কি না সে-বিষয়ে যখন অর্জুন একটু দ্বিধাগ্রস্ত, ঠিক তখনই একজনের ওপর নজর পড়ল। এখানকার সমুদ্রের জল নীল নয়। একটা সবজে ছায়া যেন জলের ওপর নেতিয়ে রয়েছে। আর সেই কারণেই সমুদ্রটাকে কীরকম বিমর্ষ দেখাচ্ছে। হাওয়ায় ওঠা ছোট-ছোট ঢেউ যেন জলের ওপর গড়িয়ে চলেছে সমানে। সমুদ্র ঢুকে এসেছে অনেকটা ভেতরে। যেন ইংরেজি ইউ অক্ষরের ভেতরের খালি জমিটা

সমুদ্রের দখলে। নানান ধরনের পাল-তোলা নৌকো এই তিন দিক বন্ধ সমুদ্রের বুকে মহানন্দে ভাসছে। পাড়ে লোকজন বেশি নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে এলোমেলো। অর্জুন লোকটাকে দেখেই এবার চিনতে পারল।

মেজরও দেখেছিলেন ওকে। দেখে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, "হতভাগাটা এখানে এল কোত্থেকে ? আবার হাত নাড়া হচ্ছে।"

সত্যিই ব্রাউনকে দেখলে মেজর বলে চমৎকার ভুল হয়। শুধু চামড়ার রংটা যদি কিছুদিন হাজারিবাগে থেকে পালটে আনতে পারত, তা হলে আর কথাই ছিল না। বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছতেই ব্রাউন বলল, "মিসেস গ্রান্ট বললেন তোমরা এখানে এসেছ। পথে কোথায় ফেঁসেছিলে হে ?"

মেজর চটপট ধমকে উঠলেন, "তাতে তোমার কী দরকার ? আমরা যেখানে যাচ্ছি তোমার সেখানে যাওয়া আমি মোটেই পছন্দ করছি না। আর পুলিশগুলো হয়েছে এমন, হুট করে ছেড়ে দিল দ্যাখো। আরও দিন-দশেক আটকে রাখলে কী ক্ষতি হত ?"

ব্রাউন বলল, "হত। আমাকে দু'বেলা খাওয়াতে হত। আমি তো তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা খরচ বাঁচাল। চারধারে এখন বাজেট কমানোর ব্যাপার চলছে।"

অর্জুন শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "এখানে আপনি কী করছেন মিস্টার ব্রাউন ?"

"তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। কাল থেকে এই বাসস্ট্যান্ডেই ঘোরাফেরা করছি।"...

"কিন্তু কেন ?"

ব্রাউন তার দাড়িতে হাত বোলাল। চোখ পিটপিট করে মেজরকে দেখল। তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল, "তোমাকে আমার বেশ ভাল লেগে গিয়েছে বলে বলছি। আমি টের পেয়েছি তোমাদের সঙ্গে একটা ক্রাইম জড়িয়ে আছে।"

"কী ? আমরা ক্রিমিনাল ?" মেজর চিৎকার করে উঠলেন।

হাত তুলে তাকে থামাল ব্রাউন। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই শিশুটিকে কেউ কখনও শান্ত হয়ে থাকবার উপদেশ দেয়নি কেন বলো তো, আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের পেছনে নিশ্চয়ই কোনও ক্রিমিনাল গ্যাং লেগেছে। নইলে ব্ল্যাকপুলের রাস্তা থেকে একইরকম চেহারার জন্যে ভুল করে আমায় জিপে তুলে নিয়ে যেত না। ওদের কাছে রিভলভার ছিল। লোকগুলোর কোনও দয়ামায়া নেই, নইলে আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিত না। তারপর ধরো স্ট্রেঞ্জির কথা। স্ট্রেঞ্জিকে কেউ মেরে ফেলেছে। ম্যাঞ্চেস্টারে তো দেখেছি স্ট্রেঞ্জির কী খাতির! ও

দলে থাকলেই পয়সা। পুলিশকে আমি বলিনি, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যারা মেরেছে তারা স্ট্রেঞ্জি ভেবে মারেনি। গাড়িটা যে স্ট্রেঞ্জি চালিয়ে যাচ্ছে তা তারা জানতই না। ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছে মিসেস গ্রান্ট চালাচ্ছেন। কাবণ মিসেস গ্রান্ট আমাকে গতকাল বলেছেন চুরি যাওয়ার আগে তিনি গাড়িটা চালিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল শপে গিয়েছিলেন লোশন কিনতে। অতএব ক্রিমিনালরা মিসেস গ্রান্টকেই মারতে চেয়েছিল। কেন ? তার সঙ্গে ওদের কোনও শত্রুতা তো নেই। পরে বুঝলাম যেহেতু উনি তোমাদের বন্ধু এবং গাড়িটা নিয়েএদিকেই আসছেন বলে মনে হয়েছিল, তাই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটিয়ে দিল ওরা। আমার নাম যে কেন শার্লক হোমস্ হল না কে জানে !"

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেজর বললেন, "অনেক বকেছ। এবার বিদেয় হও।"

"বিদায় হতে তো আসিনি এতদূর !"

"মানে ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকতে চাও ?"

ব্রাউন চোখ পাকাল, "দ্যাখো বুড়ো, আমাকে রাগিয়ে দিও না বলে দিচ্ছি। রেগে গেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমার হাতে কোনও কাজ নেই। যাকে বলে অখণ্ড অবসর। এইরকম সময়ে আমি ক্রাইমের গন্ধ পেয়েছি। এখন আমি তোমাদেব ছেড়ে চলে যাই কী করে ? তা ছাড়া তুমি তো খুব অকৃতজ্ঞ মানুষ। ছিছিছি।"

মেজর এবাব একটু ঘাবড়ে গেলেন, "মানে ? তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হতে যাব কেন খামোখা ?"

"একশোবার কৃতজ্ঞ হবে।" ধমকে উঠল ব্রাউন, "তোমার মতো দেখতে বলেই তো ওরা আমাকে জিপে তুলছিল, বন্দুক ঠেকিয়েছিল। তোমার জন্যেই তো গাড়ি থেকে পড়তে হয়েছিল আমাকে। অজ্ঞান না হয়ে আমি তো মরেও যেতে পারতাম। কৃতজ্ঞ হবে না ? যদি আমার বদলে তোমাকে নিয়ে যেত ওরা, মানে আমি যদি না থাকতাম তা হলে এতক্ষণে তোমার সাইজের কফিনের বাক্স খুঁজতে হিমশিম হতে হত এই ছেলেটাকে, তা জানো ?"

মেজরের মুখের চেহারা এখন এমন যে না হেসে পারল না অর্জুন। দু'জন প্রায় এক চেহারা এক উচ্চতার মানুষ মুখোমুখি স্থির। মনে হচ্ছে আয়নায় এ-ওকে দেখছে। সে বলল, "কিন্তু মিস্টার ব্রাউন, আমরা এখানে এসেছি মেজরের এক বন্ধুর অতিথি হিসাবে। তিনি সমুদ্রের জলে রিসার্চ করছেন। সেখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব ?"

ব্রাউন চোখ ছোট করে তাকাল, "এর সেই বন্ধুটির সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?"

"না, তা নেই।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"তিনি কি তোমাকেও নেমন্তন্ন করেছেন ?"

"না তা করেননি।" সত্যি কথাটা না বলে পারল না অর্জুন।

"তোমাকে তো আমার বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছিল। আরে তুমি যদি বিনা নেমন্তন্নে যেতে পারো, তা হলে আমি পারব না কেন ? দু'জনের যেখানে জায়গা হয় তিনজনেরও হয়।"

মেজর এবার আপত্তি করলেন, "না, হয় না। অর্জুন আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে যাব কেন, অ্যাঁ ? চিনি না জানি না, রাস্তার লোককে নিয়ে যাব সঙ্গে ?"

ব্রাউন দাড়িতে হাত বোলাল, "বড্ড কথা খরচ হচ্ছে। শোনো হে, ব্রাউন কখনও অপমান হজম করে না। শেষ নিশ্বাস যতক্ষণ না পড়বে ততক্ষণ আমি বদলা নেবই।"

মেজর এবার ঘাবড়ে গেলেন, "আমি আবার অপমান করলাম কখন ?"

"তুমি কেন করবে ? ওই লোকগুলো। খামোকা আমাকে জিপে তুলল, পিঠে নল ঠেকাল আর তারপর জিপ থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। এটা আমি এমনি-এমনি হজম করব ? প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না।" ব্রাউন এমন জোরে কথা বলল যে ওপাশের ফুটপাথে দাঁড়ানো কয়েকটা বাচ্চা চমকে এদিকে ফিরল! মেজর বললেন, "বেশ তো, প্রতিশোধ নাও না, আমাদের সঙ্গে কেন ?"

"কারণ তোমরা হলে টোপ। ওরা আবার তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসবেই। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকলে ওদের হদিস পাব। নইলে কোথায় খুঁজে মরব ওদের ?"

ব্রাউনকে এতক্ষণে বেশ পছন্দ হল অর্জুনের। লোকটা একটু গোলমেলে, বউ তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে, ছোটখাটো অপরাধ করেছে কিন্তু মানুষ হিসেবে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। জলপাইগুড়ির অনেক ছোটখাটো ক্রিমিনাল তার সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক রাখত। তারা কোথায় কী করছে তারাই জানে, কিন্তু অনেক ব্যাপারে তাকে সাহায্য করত। সে মেজরকে অনুরোধ করল, "খুব অসুবিধে হবে কি মিস্টার ব্রাউন সঙ্গে গেলে ?"

মেজর বললেন, "বুঝেছি। ক'বার তোমার প্রশংসা করতেই গলে গিয়েছ! আরে মার্শাল থাকে সমুদ্রের ধারে। হোটেল তো নয়। বলছ যখন তখন চলুক। তুমি ছেলেমানুষ বুঝবে না। যার বউ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক কি না... !"

মেজর কথা শেষ করার আগেই ব্রাউন অর্জুনের হাত জড়িয়ে ধরল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি এই লোকটা এখনও বিয়ে করেনি, না ?" অর্জুন মাথা নাড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর গলায় ব্রাউন ঘোষণা করল, "বিবাহিত মানুষদের

ব্যাপারে আনাড়ি লোকের মন্তব্য করা আমার একেবারে অসহ্য !"

দেখা গেল ব্রাউন এই তল্লাটটা মোটামুটি চেনে। ক্রিমিনালদের খোঁজে গতরাতে এখানে এসে সে নাকি কোনও হোটেলে ওঠেনি। হোটেলের খরচ চালাবার পয়সা তার পকেটে নেই। রাত হলে একটা বাংলোবাড়ির দরজায় নক করেছিল। অর্জুনকে ব্রাউন বলেছিল, "এই ব্যাপারটা অনেক সময় খুব কাজে আসে। পাঁচটা দরজায় নক করলে একটা বাড়িতে ভাল ব্যবহার পাওয়া যায়। আমি তো ভাই পরিষ্কার বলি, এখানে এসে আমার পার্স হারিয়েছি, হোটেলে যাওয়ার উপায় নেই, রাতটা যদি দয়া করে থাকতে দেন তা হলে উপকৃত হব। তবে হ্যাঁ, বেশি রাত হলে লোকজন সন্দেহ করে। এসব করতে হয় সন্ধে-সন্ধে নাগাদ। বেশির ভাগই আউট-হাউসে থাকতে দেয়, কেউ-কেউ অবশ্য গ্যারাজে, যদিও কম্বল দেয় ঠাণ্ডার জন্যে। কপাল ভাল থাকলে খাবারও জুটে যায়।"

লোকটাকে ভাল লাগছিল অর্জুনের। প্যাঁচানো লোক হলে এমন সরল গলায় নিশ্চয়ই কথা বলত না। অর্জুনের মনে হল একেই বলে ভ্যাগাবণ্ড। ওরা জলের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। মেজর সামনে হাঁটছিলেন। তাঁর হাতে একটা কাগজ। সম্ভবত সেইটাতে মিস্টার মার্শালের ঠিকানা লেখা। এরমধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছেন তিনি হদিস। ব্রাউন যতবারই ঠিকানাটা জানতে চেয়েছে তিনি নির্বাক থেকেছেন। ব্রাউনের সঙ্গে তিনি কোনও সমঝোতা করে চলবেন না এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

পালতোলা নৌকোগুলোর দিকে তাকিয়ে মেজর বললেন, "অর্জুন, এসো, টু-সিটার নৌকোটা ভাড়া করা যাক। মার্শালের কাছে পৌঁছতে হলে শুনলাম নৌকো ছাড়া কোনও উপায় নেই। ও নাকি একটা দ্বীপের মতো জায়গায় ক্যাম্প করেছে।"

অর্জুন হেসে বলল, "টু-সিটার কেন ? মিস্টার ব্রাউন তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।"

"টু-সিটারের ভাড়া কম হত।" উদাস গলায় জানালেন মেজর।

"ছাই হত।" ফুট কাটল ব্রাউন, "ওটা তো খেলনা। বন্দর থেকে বেরোলেই উলটে যায়। মিস্টার মার্শাল দ্বীপে থাকেন ? এখানে তিনটে বড় দ্বীপ আছে। যে-কোনও এঞ্জিনওয়ালা নৌকো নিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে কোন দ্বীপে ভদ্রলোক আছেন। টু-সিটার নৌকোয় দ্বীপে যারা পৌঁছয় তাদের ট্রেনিং আলাদা। দাঁড়াও আমিই ডাকছি।" ব্রাউন একটানা কথাগুলো বলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে একটা মোটরবোটওয়ালাকে ডাকল। লোকটার গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি, মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি, বয়স হয়েছে। ব্রাউনের বক্তব্য শোনার পর লোকটা মাথা নাড়ল, "মার্শাল খুব কড়া লোক। আমাকে বলেছে ওই দ্বীপে যেন বিনানুমতিতে আমি এখান থেকে লোক নিয়ে না যাই। অফিসারদের সঙ্গে

ভাল সম্পর্ক আছে ওর।"

মেজর দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন উদাসীন ভাব দেখিয়ে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, "কড়া মানুষ? কড়া? আমাব চেয়েও। নেমন্তন্ন করেও নিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা রাখেনি, আমি ওকে কড়া হওয়া কাকে বলে দেখাব। বলো আমরা মোটরবোটে যাব।"

ড্রাইভার ইতস্তত করছিল, তাকে বুঝিয়ে বলা হল মেজর মিস্টার মার্শালের বন্ধু। অতএব লোকটা রাজি হল। দর-কষাকষি করে ব্রাউন ভাড়া কমিয়ে মেজরকে শুনিয়ে বলল, "আমি অন্তত পনেরো পাউন্ড বাঁচিয়ে দিলাম। এইটে খেয়াল বাখলেই খুশি হব।"

মেজব জবাব দিলেন না। মোটববোটে চারজন লোক চমৎকার বসতে পারে। মেজর একা বসেছেন, উলটো দিকে অর্জুন ব্রাউনের পাশে। সবুজ জলের তিন পাশে সাজানো রেস্টুরেন্ট, দোকানপাট দেখতে দেখতে ওরা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আকাশ এখন ঘোলাটে। নৌকোয বসে থাকতে চমৎকার লাগছিল। হঠাৎ মেজর বললেন, "অর্জুন, তোমার ওই কোড ল্যাঙ্গুয়েজটা মনে আছে তো? চারপাশে নজর দাও। আমরা তো শুধু প্রকৃতি উপভোগ করব বলে ট্যুরিস্ট হিসেবে আসিনি।"

মেজর এখানেই থামলেন বলে অর্জুন খুশি হল। মার্শালের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি বেড়ানো, তা হলে এসব কথা কেন উঠছে, প্রশ্নটা করতেই পারে ব্রাউন। কিন্তু দু'জনেব সম্পর্কটা এখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে কেউ কারও কথা তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করবে না।

অর্জুন লাইনগুলো আর একবার মাঝে-মাঝে আওড়ে নিল। সমুদ্র। উত্তর দিকে এক ঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড-টানা নৌকোব। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর! মে মাসে সূর্য মাথার ওপরে আসে ঠিক সাড়ে বারোটায়। ডুবুরি। পাথরটা নড়েনি নোযার আমল থেকে। জাহাজ-বাঁধা পাথর। সুড়ঙ্গটা তার তলায়। ঢুকবে একটা মানুষ।

না। কোনও শব্দ সে ভুলে যায়নি। হাত বাড়িয়ে সমুদ্রের জল ছোঁয়ার চেষ্টা করল অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সতর্ক কবল ব্রাউন, "না। ওটা কোরো না।"

ব্রাউন মুখ ঘুরিয়ে নিল, "কী দরকার!"

অর্জুন অবাক হল, "ওখানে তো কোনও হিংস্র জন্তু আছে বলে মনে হয় না।"

"জন্তুর কথা বলছি না।" ব্রাউন তাব কানের কাছে মুখ নিয়ে এল, "আমার ভয় লাগে। মানে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, সাঁতারটা শেখার সময় পাইনি। ওই মাথামোটাটাকে খবরটা জানিয়ে দিও না।" অর্জুনের বেশ মজা লাগল। সাঁতার সে নিজেও জানে না। তিস্তানদীতে সাঁতার শেখার প্রশ্ন নেই। করলাতে অবশ্য শেখা যেত। কিন্তু জলের নাম শুনলেই মা

আঁতকে উঠতেন। কিন্তু সে কিছু বলল না। এতক্ষণ তারা ইউ শেপের বাইরে চলে এসেছে। সমুদ্র এখানে শান্ত। তাদের মোটরবোট সশব্দে জল কাটতে-কাটতে বেরিয়ে যাচ্ছে। পেছনে জলের ওপর যেন দাগ রেখে যাচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোন দিকে যাচ্ছি ?"

মেজর চোখ বন্ধ করে বললেন, "উত্তর দিকে।" বলেই এমন ভাবে লাফিয়ে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকাতে লাগলেন যে, নৌকোটা দুলে উঠল এবং ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল। ব্রাউন কোনওমতে টলতে-টলতে সামলে নিয়ে বলে উঠল, "অদ্ভুত তো ! উত্তর দিক বলেই পৃথিবীতে কেউ এমন লাফায় তা জন্মে শুনিনি। এখনই আমি জলে পড়ে যাচ্ছিলাম।"

মেজর যেন এসব কথা শুনতেই পেলেন না। এবার হতাশ গলায় বললেন,"সমুদ্র এত বড় যে, ঠিক কোনটা উত্তর দিক বোঝাই মুশকিল। সূর্যটা কোথায় বলো তো ?" তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। ব্রাউন জবাব দিল, "সমুদ্রের ঠিক ওপরে।"

মেজর ঘুরে আঙুল তুললেন, "লুক, ওই ভাল ছেলেটার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পেরেছ। ক্রিমিনাল দেখতে চেয়েছিলে না ? আমিই ক্রাইম করে তোমাকে দেখিয়ে দেব ক্রিমিনাল কাকে বলে। আমি যখন কথা বলব তখন একদম বকবক করবে না।"

"জলে না ডাঙায় ?" ব্রাউন অত্যন্ত নিরীহ গলায় প্রশ্ন করল।

মেজর এর জবাব দিলেন না। পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাওয়ার দাপটে কিছুতেই চুরুটে আগুন লাগছিল না।

এখন ওরা স্টিমারঘাটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। সমুদ্রের রঙে অতি সামান্য নীল মিশেছে। আশেপাশে অবশ্য অনেক রঙিন পালতোলা নৌকো ভাসছে। ওপাশের আকাশ যেন জলেই ঢুকে গিয়েছে। স্টিমারঘাটা কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা কি যে গতিতে মোটরবোট ছুটছে তার কারণে ? হঠাৎ অর্জুন বলে উঠল, "দাঁড়-টানা নৌকোয় এলে হত।"

মেজর মুখ ফেরালেন, "তখন তো বলেছিলাম টু-সিটার নাও। তুমি রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে ভিড় বাড়ালে আর দাঁড়-টানা নৌকোয় কী করে উঠবে ?"

অর্জুন উত্তর দিকে তাকাল। দাঁড়-টানা নৌকোয় একঘণ্টা কাটালে মোটরবোটে কতক্ষণ লাগবে ? এ হিসেব তার জানা নেই। সূর্য মাথার ওপরে সাড়ে বারোটায় আসবে কিন্তু যখন সূর্যকে দেখাই যাবে না তখন আর সেটা বোঝার উপায় কী ! তা ছাড়া যে কোনও সমুদ্রের উত্তর দিকে চললেই যদি লকারের লেখাটা সত্যি হয়ে যেত তা হলে তো কথাই ছিল

না।

হঠাৎ ড্রাইভার বলল, "ওই যে দ্বীপ।"

সমুদ্রের ওপর যেন পটলের মতো ডাঙা-জঙ্গল আচমকা আঁকা হয়েছে। অর্জুন দেখল দ্বীপটার কাছেপিঠে কোনও নৌকো নেই। দ্বীপে কোনও মানুষ আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। এখন বালির চর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মোটরবোট একটা বড় পাথরের গায়ে লাগিয়ে ড্রাইভার বলল, "এখানে আপনাদের নামতে হবে। পাথরগুলোর ওপরে পা ফেলে দ্বীপে নেমে যান।" সে হাত বাড়াল টাকার জন্য। মেজর বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মার্শালি এখানে ল্যান্ডিং-এর কোনও ব্যবস্থা করেননি ?"

"করেছেন। তবে সেটা দ্বীপের ওপাশে। আমার স্টকে যা তেল আছে ওপাশে গেলে আর ফিরে যেতে পারব না।" টাকাটা গুনে নিয়ে ওদের পাথরের ওপর তুলে দিয়ে ড্রাইভার বোট নিয়ে ফিরে গেল। খুব সন্তর্পণে ভেজা পাথবের ওপর পা রেখে এরা এগোচ্ছিল। প্রথমে মেজর, মাঝখানে অর্জুন, শেষে ব্রাউন। পাথরগুলোর গায়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ায় জল ছিটকে উঠছে। হঠাৎ পেছন থেকে ব্রাউন প্রায় গোঁগোঁ করে চিৎকার করে উঠল। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল ব্রাউন হাত তুলে একশো ফুট দূরের সমুদ্র দেখাচ্ছে। সেখানে একটা হাঙরের বিশাল পাখনা তখন জলে ডুবে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মেজর চিৎকার করে উঠলেন, "শার্ক, শার্ক ! ওটা শার্ক।"

ব্রাউনের গলায় এবার শব্দ ফুটল. "ওই শব্দটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। শার্ক !"

ততক্ষণে জলের নীচে হারিয়ে গেছে জন্তুটা। সমুদ্রের চেহারা ওইখানে আবার নিরীহ। অর্জুন বলল, "বাপস্ ! কী বিশাল হাঙর। পাখনাটাই যদি অত বড় হয়— !"

মেজর গম্ভীর হলেন, "সিনেমা দ্যাখোনি ? হাঙরকে নিয়ে সিনেমা হয়েছিল। একটা ছোট লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়েছিল। নৌকোফৌকো তো ওর কাছে খেলনা।"

অর্জুন দেখল তাদের মোটরবোট এখন দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় হাঙরটা ওকে তাড়া করেনি। পাথর টপকে টপকে তীরে এসে মেজর বললেন, "ওই লোকটা তখন তোমার একটাই উপকার করেছিল। তোমাকে জলে হাত দিতে নিষেধ করেছিল। অবশ্য তারপর মেয়েদের মতো কানে-কানে কথা বলে আমার সিমপ্যাথি হারিয়েছে।"

ব্রাউন বলে উঠল, "হু কেয়ার্স ! তোমার সিমপ্যাথির জন্যে যেন আমি বসে আছি !"

মেজর অবাক হয়ে বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার তো। দয়া করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি অথচ কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। এ দেখছি সেই ছুঁচোর

মতন।”

“ছুঁচো ? কোন ছুঁচো ?” ব্রাউন চোখ ছোট করল।

“বুঝলে অর্জুন, একবার আমি বেইরুটে মাসখানেক ছিলাম বাড়ি ভাড়া করে। হঠাৎ একদিন রাস্তায় একটা এই টাইপের লোক এসে বলল, ‘আপনাকে দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। আমি আপনার সঙ্গে যাব। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ?’”

“আপনি যেখানে যাবেন।”

“আমি বাড়িতে ফিরছি।”

“চলুন। আমিও যাই। আমার নাম ফুরাদ।”

“তা বেশ, কিন্তু তুমি খামোকা আমার বাড়িতে যাবে কেন ? আমি তোমাকে চিনিই না।”

“তাতে কী ! চিনে নিতে অসুবিধে নেই।” ফুরাদ নির্বিকার হযে বলছিল।

“মনে হল লোকটা ঠাট্টা করছে। এ-দেশে বোধহয় এই ধরনের ঠাট্টার চল আছে। তাই আর কথা না বাডিয়ে বাড়িতে এলাম। দেখি ফুরদাও আসছে। একদম বাড়ির দরজাতে ও পৌঁছে গেল। খুব চেঁচামেচি করলাম। লোক জমে গেল, কিন্তু ফুবাদ কোনও কথা বলছে না। এদিকে পাবলিক আমাকে বলতে আবম্ভ করেছে, “আপনি আচ্ছা লোক তো, একটা মানুষ আপনার কোনও ক্ষতি না করে সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে, শুধু এই কারণে এমন খেপে গেলেন ?”

“একজন পুলিশ-অফিসার এসে জানতে চাইল আমাব সমস্যা। তাকে সব বললাম। সে ফুরাদকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই লোকটা যদি আপনাকে খারাপ কথা বলে থাকে, তা হলে এখনই ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাব।”

“বলতে বাধ্য হলাম সে খারাপ কিছু বলেনি।”

“অপমান করেছে ?”

“না।”

“তা হলে দয়া করে রাস্তায় ভিড় জমাবেন না। এটাও একটা অপরাধ।” সবাই চলে গেল, কিন্তু ফুরাদ রইল দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সময় সে ঢুকতে চাইলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু জানলা দিয়ে দেখলাম সে বসে আছে দরজার সামনে আর রাস্তা দিয়ে যে মানুষ যাচ্ছে তাকেই বলছে, “কী করব ভাই, এই বাড়ির ভাড়াটে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে। ব্যবহারেই তো মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়।”

“বোঝো অবস্থা। দশ-বারোবার একই কথা শুনতে-শুনতে মাথা গরম হয়ে গেল। শেষে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম, “ফুরাদ। কী চাও

তুমি ?"

"ভেতরে গিয়ে আরাম করতে।"

"রাগের মাথায় ওকে ভেতরে আসতে বলতেই যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে বলল, "আপনি যদি চা বানান তা হলে আমারটাও নেবেন।"

"তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারবে না অর্জুন। খুন না করলে ওর হাত থেকে যেন নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। ছুঁচোটাকে আমাকে বাধ্য হয়ে গিলতে হয়েছিল।"

মেজর থামতেই ব্রাউন বলল, "অনেকক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল, এবার বুঝতে পারলাম। তুমি ফুরাদকে খুন কবেছ!"

"তোমার মাথা! দ্বিতীয় দিন রাতে আমার জামাকাপড় ব্যাগ ভরে ফুরাদ যখন ঘুমোচ্ছে তখন বেইরুট থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আর ওই শহরে কখনও যাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু তখন কি জানতাম ইংল্যান্ডেও আর এক ফুরাদ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!"

অর্জুন বলল, "আপনার গল্পটা খুব সুন্দর। কিন্তু এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?"

অতএব বালির চর ভেঙে হাঁটা শুরু হল। বিচিত্ররঙা কাঁকড়াগুলো তাদের আওয়াজ পেয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। আর এই সময় সূর্যদেব দেখা দিলেন। ঠিক মাথার ওপরে নয়, তিনি এখন পশ্চিমে ঢলেছেন। চড়াই ভেঙে ওপরে উঠে এসে ওরা খানিকটা জঙ্গল এবং পাথুরে জায়গা দেখতে পেল। কোনও মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মেজর বললেন, "মার্শালটা কোথায়? আমাদের ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গেল তো? একবার প্রশান্ত মহাসাগরের খুনে দ্বীপে আমি সাতদিন আটকে ছিলাম।"

ব্রাউন হঠাৎ বলে উঠল, "নো মোর স্টোরিজ।"

মেজর থমকে দাঁড়ালেন। সম্ভবত আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে গল্প বলতে বাধা দেয়নি। হয়তো একটা বিস্ফোরণ ঘটত, তার আগেই জঙ্গল ফুঁড়ে একটি লোক বেরিয়ে এল। চেহারা দেখে মনে হয় পুলিশ কিংবা মিলিটারিতে কাজ করেছে কিছুদিন। লোকটা বেশ কঠোর মুখে ওদের দেখে বলল, "তোমরা কেন এখানে এসেছ? অনুমতি ছাড়া এখানে প্রবেশ নিষেধ।"

অর্জুন বলল, "অনুমতি কার কাছে নিতে হবে?"

লোকটা তখন মেজর আর ব্রাউনের চেহারা দেখছে। উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দু'জনে এক মেক আপ নিয়েছ কেন? এটা কি নাটক করার জায়গা? নাউ, গেট লস্ট, এই দ্বীপ থেকে এখনই চলে যাও।"

এবার মেজর গলা তুললেন, "চলে যাব? চলে যাওয়ার জন্যে এত

দূরে এসেছি। আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে অপমান করা হচ্ছে? তুমি কে হে?"

"আপনাকে এখানে আসার জন্যে নেমন্তন্ন করা হয়েছে?" লোকটি যেন অবাক।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার বললে বুঝতে পারো না কেন?"

"বেশ। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। এবং জেন্টলমেন, আপনারা দয়া করে এখানেই অপেক্ষা করুন। এই দ্বীপের ভেতর এলোমেলো ঘুরে বেড়াবেন না।" লোকটা ফিরে যাওযার জন্যে পা বাড়াল। মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন, তারপর চেঁচিয়ে বললেন, "আমাকে একা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?"

"নিরাপত্তার প্রয়োজনে।" লোকটা উত্তর দিল।

অতএব ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মেজর রওনা হলেন। ব্রাউন বলল, "এই জঙ্গলে না দাঁড়িয়ে চলো সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি। যেমন তোমার মেজর আর তেমন তাব বন্ধু।"

অর্জুনের এই ব্যাপাবটা ভাল লাগল না। মেজরকে ওরা এভাবে ছেড়ে না দিলেই পারত। সে বলল, "মিস্টার ব্রাউন, যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে আসছি।"

ব্রাউনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মেজর যে-পথে গিয়েছিল, সে সেই পথে পা বাড়াল। শুকনো পাতা আর মাথা পর্যন্ত বেড়ে ওঠা গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে সে এগোতে লাগল। পায়ে চলার পথ একটা আছে বটে কিন্তু সেই পথেই লোকটা মেজরকে নিয়ে গিয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। মিনিট-দশেক যাওযার পর লোকজনের গলা শুনতে পেল সে। পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল একটা মাঠের মতো জায়গায় অনেকগুলো ক্যাম্প খাটানো রয়েছে। কিছু লোক এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মেজরকে নজরে পড়ল না। কয়েকটা ছোট-ছোট হালকা নৌকো মাটিতে রাখা আছে।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে প্রচণ্ড আঘাত পেতেই জিনিসপত্র নিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে অর্জুন। উঠে বসার চেষ্টা করতেই কেউ তাকে পেড়ে ফেলল। অর্জুন দেখল শক্ত চেহারার একটা লোক তাকে মাটিতে চেপে ধরে চিৎকার করছে। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাম্প থেকে লোকজন ছুটে এল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অর্জুনকে ওরা নিয়ে এল ক্যাম্প চত্বরে। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত গলায় কথা বলছিল। ইতিমধ্যে তার জিনিসপত্র হাঁটকানো শুরু হয়েছে। পাশপোর্ট বের করে ওরা চেহারাটা মিলিয়ে নিল। এবং তখন সেই লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। অর্জুনকে দেখে খুব রেগে গিয়ে বলল, "আমি তোমাদের অপেক্ষা করতে

বলেছিলাম। কে তুমি ? কার হয়ে এখানে এসেছ ?" আর একটা লোক তার পাশপোর্ট এগিয়ে দিল, "হি ইজ ইন্ডিয়ান।"

"আই সি। ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।"

অর্জুন নিজেই উঠতে পারল। যদিও তার কাঁধে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু সেটাকে এই মুহূর্তে আমল দিল না। ওরা ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। মোটরবোটের ড্রাইভার তাদের সাবধান করে দিয়েছিল, এই দ্বীপে লোকজনকে নিয়ে আসার নিষেধ আছে। পাহারাদারির এই নমুনা সেই কথাটাকেই প্রমাণ করে। মিস্টার মার্শাল একজন অভিযাত্রী, বিজ্ঞানী। তিনি কেন এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন ? হয়তো মোটরবোটের ড্রাইভার মার্শালের নামটা গুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে তার আর একটা কৌতূহল তৈরি হল। এই লোকগুলো এমন দ্বীপে গোপনে কী কাজ করছে ?

তাঁবুর ভেতর ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেল অর্জুন। একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন মেজর। কিন্তু তাঁর মুখে প্লাস্টার আঁটা। হাত-পা বাঁধা নয় কিন্তু তিনি অসহায়ের মতো হাত নেড়ে বোঝালেন তাঁর কিছুই করার নেই। লোকটা বলল, "কোনও মানুষ যে এমন চেঁচাতে পারে আমার ধারণা ছিল না। তাই ওঁর মুখ বন্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু উনি যদি ওই চেয়ার ছেড়ে একবার ওঠেন তা হলে হাঙর দিয়ে খাওয়ানো হবে। মনে হচ্ছে তোমার মুখ বন্ধ করার কোনও প্রয়োজন হবে না। ওইখানে বসতে পারো।"

একটা কাঠের বাক্সর ওপরে বসিয়ে দিল ওরা অর্জুনকে। এইসময় মেজর কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু নাক দিয়েই শব্দ বের হল। ওঠার চেষ্টা করেই আবার বসে পড়লেন। লোকটা এবার অর্জুনের. সামনে এসে দাঁড়াল, "তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কী ?"

অর্জুন বলল, "ওঁর বন্ধুর নেমন্তন্নে উনি এসেছেন, সঙ্গে আমাকে এনেছেন।" মেজর কথাটা শুনে মাথা নাড়লেন। লোকটা জিজ্ঞেস করল, "বন্ধুর নাম কী ?"

"পুরো নাম জানি না। উপাধি হল মার্শাল।"

উত্তরটা শুনে লোকটা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারপর বলল, "তোমাদের কিছুক্ষণ এই তাঁবুতেই থাকতে হবে। বাইরে বেবোবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বে।"

ব্রাউন উসখুস করছিল। দ্বীপটা খুব বড় নয়। জন্তু-জানোয়ার আছে বলে মনে হচ্ছে না। মেজর এবং অর্জুনকে যেতে দেওয়ার পর তার খুব একা-একা বোধ হল। জঙ্গলের মধ্যে না দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চলে এল সে। এখান থেকে কোনও স্থলরেখা দেখা যায় না। সূর্য ওঠার পর

হাওয়ার তেজ বেড়েছে। ফলে ঢেউগুলো বেশ ফুলে উঠছে। কাল রাত থেকে তেমন খাওয়াদাওয়া হয়নি। ভেবেছিল ওই লোক দুটোকে জপিয়ে খাবার কেনাবে। কিন্তু মেজর এমন ঝামেলা শুরু করল যে, মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তার। ওরা কিছু না বললেও ব্রাউন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে শুধু বেড়াবার জন্য এখানে কেউ আসে না। যাদের পেছনে লোক লেগে গেছে তাদের নিশ্চয়ই কোনও গোপন ব্যাপার আছে। ছোটখাটো কিছু অপরাধ মার্শালি করেছে। কিন্তু বড় অপরাধ করতে সাহস হয় না এবং ইচ্ছাও করে না। কিন্তু ওর কেবলই মনে হচ্ছিল এই লোক দুটোর সঙ্গে লেগে থাকলে তার আখেরে লাভ হবে। যদি ফালতু কিছু টাকা ম্যানেজ করা যায়, তা হলে কিছুদিন নিশ্চিন্ত। অতএব এখন তার উচিত এদের সাহায্য করা। হাঁটতে-হাঁটতে একটা গাড়ির সামনে চলে এল ব্রাউন।

তার চোখ ছোট হয়ে এল। দু'ধারে জঙ্গল নিয়ে জল ঢুকে এসেছে অনেকটা ভেতরে। সেখানে অবশ্য ঢেউ ওঠাব কথাও নয় কিন্তু একটা চওড়া কাঠের পাটাতন ভাসছে। পাটাতনটা লোহার শেকলে বাঁধা। মাটি থেকে পা ফেললেই ওই পাটাতনে ওঠা যায়। জিনিসটাকে খাড়ির মধ্যে জঙ্গলের আড়ালে প্রায় লুকিয়েই রাখা হয়েছে। ব্রাউন বুঝতে পারল এই পাটাতন নিয়ে যেহেতু সমুদ্রে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয় তাই যারা এটাকে ব্যবহার করে তাবা অন্য কাজে লাগায়। কাজটা কী ওব মাথায় ঢুকছিল না।

এইসময় একটা মোটরবোটের আওয়াজ কানে এল ব্রাউনের। সে চটজলদি নিজেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল। শব্দটা বাড়তে-বাড়তে কাছে এসে গেল। এবার মোটরবোটটাকে দেখতে পেল সে। সমুদ্র থেকে খাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। ব্রাউনের খুব কৌতূহল হচ্ছিল এগিয়ে গিয়ে খাড়ির সামনে দাঁড়াতে। সে উসখুস করছিল। এমন সময় পিঠে একটা ভারী থাপ্পড় পড়তেই ঘুরে দেখল স্বাস্থ্যবান একটা লোক তার কাঁধটাকে যেন মুঠোর মধ্যে পুরে নিয়েছে। ব্রাউন আর্তনাদ করে উঠল, "এ কী হচ্ছে ? আমাকে তো এখানেই অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।"

"কে বলেছে ?" লোকটা নিষ্ঠুর গলায় জানতে চাইল।

"নাম জানি না। আমার সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে গিয়েছে।"

"চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো। আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখা হচ্ছিল। কথাগুলো যদি মিথ্যা হয় তা হলে খাড়িতে ডুবিয়ে রাখব।" লোকটার কথা শেষ না হওয়ামাত্র দু'জন লোক খুব দ্রুতপদে খাড়ি থেকে উঠে এল। তাদের একজনের বয়স নির্ঘাত ষাটের কাছাকাছি। অন্যজন যুবক এবং স্বাস্থ্যবান। ওরা বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। ব্রাউনের কাঁধ ধরে থাকা লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "এখানে তিন নম্বরটাকে পেয়েছি বস।"

শক্ত চেহারার প্রৌঢ় চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ব্রাউন দেখল, সঙ্গী যুবকটি

যেভাবে সতর্ক হল তাতে বোঝা যায় ওর রীতিমত প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে। হঠাৎ প্রৌঢ় চিৎকার করে উঠল। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এল। ব্রাউন কিছু বোঝার আগেই তাকে দুহাতে জড়িয়ে প্রায় নাচতে লাগল লোকটা, "ও আমার মাথামোটা', ও আমার ছাগলদাড়ি, শেষ পর্যন্ত এখানে আসার সময় হল তোমার ? উঃ, কী যে ভাল লাগছে। আমি কবে থেকে তোমাকে আশা করে আছি।"

আদরের বহর দেখে পেছনের লোকটা তাঁর কাঁধ ছেড়ে দিয়েছিল। ব্রাউন হতভম্ব। লোকটা করছে কী! উচ্ছ্বাস কমে এলে লোকটা ব্রাউনের হাত জড়িয়ে ধরল, "কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে ? মোটরবোটে ? আহা, আগে জানলে আমিই তোমার আসার ব্যবস্থা করতাম।"

ততক্ষণে মাথায় ভাবনাটা এসেছে। এই লোকটা তাকে মেজরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে না তো! সে কিছু বলার আগেই লোকটা তার হাত ধরে হাঁটতে লাগল। পেছন থেকে সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি বলে উঠল, "সার, ক্যাম্পে আরও দু'জন আছে।"

"আরও দু'জন ? মেজর, তোমার সঙ্গে আর কারা এসেছে ?"

এবার ব্রাউন মাথা নাড়ল, "আমি এতক্ষণ আপনাকে বলতে পারছিলাম না সার, আমি মেজর নই। তিনি ভেতরে গেছেন। মানে তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"অ্যাঁ!" লোকটা ব্রাউনের হাত ছেড়ে ছিটকে সরে গেল, "তা হলে তুমি কে ?"

"আমি ব্রাউন। মেজরের সঙ্গে এসেছি।"

মুখে হাত দিল লোকটা, "তাই তো। আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। মেজর হলে এতক্ষণ মেশিনগান চালাত। ওকে ধরে নিয়ে এসো। যদি জালিয়াতি হয় তা হলে ওর ব্যবস্থা তোমরা করবে।" কথা শেষ করে লোকটা দ্রুত পা চালাল। ব্রাউনের কনুই খপ করে ধরল সেই স্বাস্থ্যবান। প্রায় ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল তাকে।

দরজার দিকে তাকিয়ে মেজর বিকট শব্দ করে উঠলেন। যেহেতু মুখ বন্ধ, নাক দিয়ে ছাড়া আওয়াজ করা সম্ভব নয়, তাই সেটা খুব করুণ শোনাল। দরজা দিয়ে ছুটে এসে আচমকা থমকে দাঁড়াল মার্শাল। সন্দেহের চোখে মেজরকে দেখতে লাগল। মেজর তখন ছটফট করছেন। মার্শালের ইঙ্গিতে ওর সঙ্গে তাঁবুতে ঢোকা একটা লোক মেজরের মুখ থেকে প্লাস্টার সরিয়ে নেওয়ামাত্র চিৎকার শুরু হল, "বদমাশ, জলদস্যু, নচ্ছার, নেমন্তন্ন করে আমাকে এইভাবে অপমান করা ?"

সঙ্গে-সঙ্গে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল মার্শাল, "আর ভুল হয়নি। এ একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট মেজর।" বলে নিজেই ওঁর বাঁধন খুলে জড়িয়ে ধরলেন। মেজর তখনও চিৎকার করে যাচ্ছিলেন। তাঁর রাগ কমছিল

না। মার্শাল সেই অবস্থায় বললেন, "আমার জায়গায় থাকলে তুমিও এই কাণ্ড করতে। ঠাণ্ডা হয়ে বোসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন। চোখ বন্ধ করে আছে অর্জুন, ব্যথাটা তখনও মালুম দিচ্ছে।

মেজর চিৎকার করে বললেন, "তুমি, তুমি জানো ওই ছেলেটার হাল কী করেছে তোমার লোকজন ? মেরেই ফেলত বোধহয় ! মার্শাল, তুমি না বিজ্ঞানী ? রিসার্চ করছ ? ছি, ছি, ছি। কে ভেবেছিল তুমি কতগুলো গুণ্ডা নিয়ে এখানে রিসার্চ চালাচ্ছ ! না, না, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।"

মার্শাল দাড়িতে হাত বোলাল কয়েক সেকেন্ড। তারপর অর্জুনের কাছে এসে বলল, "সরি ব্রাদার। আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, যার কথা মেজর আমায় লিখেছিল। আমি সত্যি দুঃখিত। ব্যাপারটা মনে না রাখলেই খুশি হব।" অপরাধীর মতো ভঙ্গি ছিল কথাগুলো বলার সময়। হঠাৎ সচেতন হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে ওই ভদ্রলোক কে ? ওকে তো আমি মেজর বলেই মনে করেছিলাম।"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজরের গলা থেকে ব্যঙ্গ ছিটকে উঠল, "মনে করেছিলে ? আহা, আর তুমি নিজেকে আমাব বন্ধু বলে দাবি কোরো না। ওই বদমাশ আর আমি এক হয়ে গেলাম ?"

"বদমাশ ?" মার্শাল যেন হতভম্ব, "কী আশ্চর্য ? এই লোকটা তো ঠিক তোমার কার্বনকপি। ও কি তোমাদের সঙ্গে আসেনি ?"

মেজর কিছু বলার আগেই অর্জুন জবাবটা দিল, "মিস্টার ব্রাউন আমাদের সঙ্গে এসেছেন।"

"মিস্টার ব্রাউন তোমাদের বন্ধু ?"

মেজর মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বললেন, "নো, নেভার। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ব্রাউনকে তুমি পছন্দ করছ না !"

"একশোবার। যেমন এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যদি সবচেয়ে অসহ্য বলে কাউকে মনে হয়, সে হল তুমি ? উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না এমন অভ্যর্থনা।"

মার্শাল পকেট থেকে একটা দামি চুরুট বের করে সামনে ধরল, "টানো।"

"এটা কী ?"

"তুমি এককালে এই চুরুট খুন পছন্দ করতে। মেজর শান্ত হও। আমি ক্ষমা চাইছি। কী অবস্থায় পড়ে এমন ব্যবস্থা নিয়ে থাকতে হচ্ছে তা যদি জানতে, তা হলে আমার ওপর এত রাগ করতে না।" মার্শালের মুখে

আবার বিমর্ষ ছাপ এল।

"সেটা বলে ফেললেই হয়। দ্যাখো মার্শাল, যতদিন তুমি আমার সঙ্গে বা নিজে পৃথিবীর চারপাশে কোনও কিছু আবিষ্কারের নেশায় অভিযানে বের হতে ততদিন তুমি ছিলে আমার চেনা। এই বড়লোক হবার নেশায় মুক্তোর ব্যবসায় নেমে সর্বনাশ হয়েছে তোমার।" মেজর চুরুট ধরিয়ে একটা আরামের টান দিলেন।

মার্শাল একজন সহকারীকে চটপট কফি বানাতে হুকুম দিয়ে বললেন, "সব বলব তোমাদের। আমি খুব উত্তেজনায় রয়েছি। যে-কোনও মুহূর্তে আমার প্রাণসংশয় হতে পারে। এখানে যারা রয়েছে তারা আমার কর্মচারী। মাইনে পায়। এদের কাছ থেকে সবসময় সততা আশা করা যায় না। তোমরা এসে পড়লে যেশাসের দয়ায়। কিন্তু ওই লোকটা, যার নাম ব্রাউন, তাকে নিয়ে কী করবে? ওকে ফেরত পাঠিয়ে দেব?"

মেজর মুখ খোলার আগেই অর্জুন জবাব দিল, "উনি খুব খারাপ লোক নন। থাকুন না, অবশ্য যদি আপনার কিছু আপত্তি না থাকে।"

"তোমাদের সঙ্গে এসেছে। আমি ততক্ষণই আপত্তি করব না, যতক্ষণ সে আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে না।" এইসময় কেউ একজন ডাকতেই মার্শালসাহেব দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল।

এখানে সারাদিন খুব হাওয়া বইল। যাকে বলে সামুদ্রিক বাতাস, তাই। তাঁবু কাঁপিয়ে দিচ্ছিল বারংবার। অর্জুনদের জন্যে আর-একটি তাঁবু পাতা হয়েছে। সেটিতে রয়েছে অর্জুনের সঙ্গে ব্রাউন। মেজর আছেন তাঁর পুরনো বন্ধু মার্শালের তাঁবুতে। অভিমানের পালা চুকে যাওয়ার পর দুই বন্ধু এখন এক। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরেও অর্জুনের শরীরে অস্বস্তি ছিল। ব্রাউন কিন্তু পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি অবাক হল অর্জুন। মেজরের সঙ্গে অন্তত ষাট ভাগ মিল রয়েছে। কোটি-কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে সৃষ্টির সময় ঈশ্বরেরও তো ভুলচুক হতে পারে। কত আর নতুন ছাঁচ পাবেন তিনি। কখনও-কখনও একই মুখ পৃথিবীর দুই প্রান্তে ছেড়ে দেন। যে ছেলেটি জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ে, তার মতো দেখতে অবিকল একজন হয়তো রয়েছে কোনও এস্কিমোদের ইগলুতে। জীবনে তাঁদের দেখাদেখি হওয়ার কোনও সম্ভাবনার কথা ঈশ্বর চিন্তা করেননি। কিন্তু কারও যদি পায়ের তলায় সরষে লাগানো থাকে তো এই মেজর-ব্রাউনের মতো কাণ্ড হয়ে যেতে পারে।

তিনটে নাগাদ অর্জুন তাঁবু থেকে বের হল। সামনেটা ফাঁকা। সমুদ্রের গর্জন কানে আসছে। ওপাশে মেজরদের তাঁবুর পাশাপাশি আরও কয়েকটা। অর্জুন স্থির দাঁড়িয়ে চারপাশ লক্ষ করছিল। এখনও মার্শাল

বলেনি এমন কঠোর নিরাপত্তার কারণ কী! অতএব প্রহরী রয়েছে কাছেপিঠে। ওরা হয়তো অর্জুনকে স্বাধীনভাবে ঘুরতে দেবে না। কিন্তু কেন? অর্জুন বড়-বড় পা ফেলে মার্শালের তাঁবুতে ঢুকল। মার্শাল নেই। মেজরের নাক ডাকছে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে সে চটপট পেছন দিকে চলে এল। চারপাশেই জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা। তবু প্রহরী বলে কাউকেই নজরে পড়ছে না। সমুদ্রের দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ একটা শিস বাজল। তারপরেই একটা লোক যেন ম্যাজিকের মতো উদয় হল, "সার, সমুদ্রের দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

"কেন?" অর্জুনের চমক লাগল।

"মিস্টার মার্শাল আমাদের সেইরকম নির্দেশ দিয়েছেন।"

"ওদিকে গেলে কী হবে?"

"হয়তো আপনাদের নিরাপত্তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।"

"কিন্তু ভাই, আমরাও তো সমুদ্র ডিঙিয়ে এখানে পৌঁছেছি। কোনও বিপদ হয়নি।" অর্জুন ইচ্ছে করেই কথা চালাতে চাইল। কিন্তু লোকটা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, "এসব ব্যাপার নিয়ে আপনি বরং মিস্টার মার্শালের সঙ্গে আলোচনা করুন। আমাদের কর্তব্য করতে দিন।"

অতএব অর্জুনকে ফিরতে হল। মার্শালের তাঁবুতে ঢুকে সে মেজরকে জাগাল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেজর ছোট চোখে ওকে দেখলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আহা, তোমার জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে। একটু আরাম করে ঘুমোতেও পারো না।"

"এই দ্বীপে এখন আপনি আর মিস্টার ব্রাউন ঘুমোচ্ছেন। দু'জনের মিল খুব।"

"সে ঘুমোচ্ছে কেন?" মেজাজ চড়ে গেল মেজরের, "এত ঘুমোবার কী আছে। আচ্ছা অর্জুন, এই উটকো লোকটাকে খামোকা আমার সঙ্গে রাখছ কেন? ওকে দেখলেই আমার কেমন একটা অস্বস্তি হয়। তা ছাড়া মর্শালের এখানে পৌঁছে যাওয়ার পর আর আমাদের ওকে কোনও দরকার নেই। বউ যাকে ঢুকতে দেয় না বাড়িতে তাকে তুমি আদর করছ।"

"মিস্টার মার্শালের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর আমরা কি নিশ্চিন্ত?" অর্জুন নিচু গলায় প্রশ্ন করল। যদিও তার কোনও দরকার ছিল না। এই তল্লাটে বাংলা বোঝার মতো মানুষ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

মেজর বললেন, "কী বলছ তুমি? মার্শাল আমার কত দিনের বন্ধু। তার নিমন্ত্রণে আমি তোমায় নিয়ে এখানে এসেছি। এখানে আমাদের ভয় কী?"

"সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমাদের এই তাঁবু থেকে বেশি দূরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।"

"কে নিষেধ করেছে?" মেজর ততক্ষণে তাঁবুতে রাখা বালতির জলে

মুখ ধুয়ে নিচ্ছেন।

"মিস্টার মার্শালের নির্দেশে তাঁর কর্মচারীরা।"

তোয়ালেটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে মেজর গলা তুলে বললেন, "দেখি, কে আমাদের আটকায় ? চলো আমার সঙ্গে।"

প্রায় ঘোঁত-ঘোঁত করেই মেজর তাঁবু থেকে বের হলেন। বেশি দূর যেতে হল না। প্রহরী ওই একই গলায় মনে করিয়ে দিল ব্যাপারটা। মেজর শূন্যে হাত ছুঁড়লেন, "ডেকে নিয়ে এসো মার্শালকে। কোথায় সে ?"

"সার, উনি এখন সমুদ্রের তলায়।"

"আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। হয় তাকে এখনই চাই, নয় আমাদের যেতে দিতে হবে।"

"কিন্তু সার, আপনি তো একটু আগে একই কথা বলে সমুদ্রের ধারে গেলেন।"

"আমি ? একটু আগে ? তুমি একটি বোকা। একটু আগে আমি ঘুমোচ্ছিলাম।"

"সে কী ! মিনিট-দশেক আগে আপনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি আপত্তি করতেই ঠিক এইভাবে মার্শালসাহেবের নাম করে গালাগালি করলেন। বাধ্য হয়ে আমি আপনাকে ছেড়ে দিলাম। আপনি বলেছিলেন সমুদ্রের জল মুখে না দিলে আপনার গলায় ব্যথা হয়।" প্রহরীটি নিবেদন করল।

"সমুদ্রের জল মুখে... পাগল ! দেওয়া যায় নাকি ? ওই নুন-জল ? গুল মারার জায়গা পাওনি ? তোমার নাম কী হে ? মার্শালের কাছে তোমার নামে রিপোর্ট করব আমি।" গর্জে উঠলেন মেজর।

অর্জুন তাঁর হাত ধরল, "মাথা ঠাণ্ডা করে শুনুন।"

"মাথা আর ঠাণ্ডা রাখা যাচ্ছে না অর্জুন। আমাদের এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

"এখনই গিয়ে লাভ হবে না। মিস্টার ব্রাউন ফিরে আসুন আগে।"

"মিস্টার ব্রাউন ?"

"মনে হয় তিনিই সমুদ্রের জল দেখতে গিয়েছেন। লোকটা তাকে 'আপনি' বলে ভুল করছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন মেজর, "আমি তোমাকে বলেছিলাম, ওকে বিদায় করো। শুনলে না। এখন দেখছ কাণ্ড। সব জায়গায় আমার চেহারার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে।"

"সব জায়গায় নেননি। ব্ল্যাকপুলে ব্রাউন না থাকলে প্রতিপক্ষ আপনাকেই জিপে তুলে নিয়ে যেত। আপনার জন্যেও ওঁকে বিপদে পড়তে হয়েছে।"

"কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল সঙ্গে ঘুরতে!" মেজর গলা নামালেন, "ঠিক আছে, এখন তুমি আমাদের কী করতে বলো?"

"আপাতত চলুন, তাঁবুতে ফিরে যাই। মার্শালসাহেব এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা যাবে।" অর্জুন আর ঝামেলা বাড়াতে চাইল না।

মেজরকে তাঁর তাঁবুতে রেখে অর্জুন নিজেরটায় ফিরে এল। এত সতর্কতার কোনও কারণ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। মার্শালসাহেব কী বলে দেখে তবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হ্যাঁ, ওর আমন্ত্রণ রাখতেই মেজর আমেরিকা থেকে এখানে এসেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে লকারের সাঙ্কেতিক ব্যাপারটাও তো রয়ে গেছে। সেটাকে শেষ অবধি না জেনে চলে যাওয়া চলবে না। এইসময় দরজায় শব্দ হল।

এখন ঘন বিকেল। মিস্টার ব্রাউন চোরের মতো তাঁবুতে ঢুকছিল, কিন্তু ধাক্কা লেগেছে দরজায়।

"কোথায় গিয়েছিলেন?"

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল ব্রাউন। তারপর মুখ বের করে আশেপাশে দেখে নিল। শেষে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অর্জুনের পাশে বসল, "এখানে তো ভয়াবহ ব্যাপার।"

"কেন?"

"ওরা আমাকে সমুদ্রেব ধারে যেতে দিচ্ছিল না। মার্শালেব নাম করে চেঁচামেচি করতে অ্যালাউ কবল। কিন্তু সঙ্গে একটা লোক ছিল। তাকে মিথ্যে বললাম, গলায় ব্যথা, সমুদ্রেব জলে কুলকুচি করব, কিন্তু ডান দিকের সমুদ্রের ধারে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। বাঁ দিকে কিছুটা যাওয়ার পর সে বলল, সোজা এগিয়ে যেতে, সেখানে সমুদ্র পাব। যত ইচ্ছে কুলকুচি করে যেন এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসি। সে ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। মানে ওর বাইরের জায়গাটায় কোনও কিছু লুকোবার নেই। তা আমিও প্রথমে শিস দিতে-দিতে এগিয়ে চুপ মেরে গেলাম। যখন বুঝলাম কেউ আর অনুসরণ করছে না, তখন গাছের আড়ালে-আড়ালে সমুদ্রের ধারে চলে গেলাম। অনেক ভেবেচিন্তে একটা লম্বা গাছে উঠে বসলাম। মিনিট তিরিশেক পর হঠাৎ দেখি সমুদ্রের জল তোলপাড় করে একটা ইয়া বড় হাঙর মুখ তুলেই নেমে গেল। অত বড় হাঙর আমি জীবনে দেখিনি। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। গাছের ডালে বসে থেকেও ভাবলাম এখান থেকে মোটরবোটে আর কিছুতেই ফিরে যাব না। আসার সময় বোধহয় হাঙরটা ধারেকাছে ছিল না। এইসব ভাবছি, হঠাৎ আমার পাশের ডালে খট করে শব্দ হল। চমকে তাকিয়ে দেখি ডালটা ভেঙে গেছে। কেউ কিছু ছুঁড়ে ডালটাকে ভেঙেছে। অথচ কাছেপিঠে মানুষ নেই। আমি প্রায় লাফিয়েই নীচে নেমে পড়ে (ড়তে লাগলাম।" ব্রাউন একটানা বলে গেল।

"প্রহরীটা যেখানে ছিল সেখান থেকে ওই জায়গাটা কত দূরে ?"

"সিকি মাইল হবে।"

"সিকি মাইল আপনি দৌড়লেন ?"

"হ্যাঁ। প্রাণের দায়ে। কারণ ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি কেউ সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল।"

"প্রহরীকে কিছু বললেন ?"

"না। বললে কী থেকে কী হয়ে যায়! ব্যাটা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অবশ্য ওদিকে আমি কিছু দেখেছি কি না, তা আমি স্রেফ মিথ্যে বললাম।"

"আপনি নিশ্চয়ই তখন হাঁপাচ্ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। তার কারণও জিজ্ঞেস করেছিল। বললাম, হার্টের ট্রাবল আছে।"

"আমাকে পথ চিনে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন ?"

"হ্যাঁ।" বলেই দ্রুত মাথা নাড়ল ব্রাউন, "না।"

"মানে ?"

"বাবা, আমার একটাই প্রাণ। এটাকে খোয়াতে চাই না।"

"দেখুন মিস্টার ব্রাউন, আপনাকে এই দ্বীপে কেউ পছন্দ করছে না। আমরা মেজরের সঙ্গী হয়ে এসেছি, তিনি পর্যন্ত নন। এর ওপর যদি মার্শাল জানতে পারেন আপনি অত দূরে গিয়ে গুলি খেতে-খেতে বেঁচে গেছেন, তা হলে আর দেখতে হবে না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

"আমি তো করব না বলিনি। কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে···· !"

"ধরুন আপনাকে কেউ দেখতে পাবে না, রাতের অন্ধকারে যদি যাই ?"

"সেটা হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কী ঘটছে ? আমি বুঝতেই পারছি না।"

"সেটা আমিও বোঝার চেষ্টা করছি। আপাতত আপনি তাঁবুতেই থাকুন। রাত নামলে আপনার সঙ্গে দেখা করব। মেজর বলে আপনাকে দ্বিতীয়বার ভুল করলে সেটা খারাপও হতে পারে। আচ্ছা, আপনি এর আগে শার্ক দেখেছেন ?"

মাথা নাড়ল ব্রাউন, "প্রচুর।"

সন্ধের পর মার্শাল মেজর এবং অর্জুনকে বোঝাচ্ছিল, তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি যখন প্রথম এই দ্বীপে আসি, তখন আমার সঙ্গে জনাচারেক সহযোগী ছিল। জলের তলায় মুক্তো নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম আমরা। তীরের লোকজনও সেই খবর জানত

কিন্তু কেউ বিরক্ত করেনি। এরপর হঠাৎই আমাদের হুমকি দেওয়া হল উড়ো চিঠিতে, যেন অবিলম্বে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাই। প্রথমে ব্যাপারটাকে পাত্তা দিইনি। হঠাৎ একদিন সমুদ্র থেকে ফিরে এসে দেখি কেউ এসে আমাদের টেন্ট জ্বালিয়ে জিনিসপত্র ভেঙে রেখে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে পুলিশকে খবর দিলাম। তারা তাদের মতো তদন্ত করল। করে জেটির একজন গুণ্ডাকে ধরল। সে বলেছিল এই কাজ করার জন্যে তাকে টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিনিয়োগকারীকে সে চেনে না। জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর লোকটার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল। এরপর এক রাত্রে আমার এক সহকারীকে গুলি করা হল। গুলি ভেসে এসেছিল দ্বীপের বাম প্রান্ত থেকে। ছেলেটির হাতে গুলি লাগে। তখন আমি একটা এজেন্সির শরণাপন্ন হলাম। এখানে যে সমস্ত গার্ড দেখছ, তারা ওই এজেন্সির লোক। কয়েকবার এদের সঙ্গে গুণ্ডাদের লড়াই হয়েছে। তারা এগোতে পারেনি। এদের আমি যে হুকুম দিয়েছি তা আমাকেও মান্য করতে হবে, এজেন্সির সঙ্গে আমার চুক্তি সেইরকম। ওরা তোমাদের কীরকম পরিস্থিতিতে বাধা দিয়েছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। কিন্তু ব্রাউন লোকটাকে ওরা এসকর্ট দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিল আমার বিশেষ বন্ধু ভেবে ভুল করে। ওকে যেতে নিষেধ করো। নইলে ওর জীবন বিপদগ্রস্ত হতে পারে।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এই গুণ্ডাগুলো কারা?”

“ব্যাপারটা রহস্যময়। মনে হচ্ছে এই সমুদ্রে আমি কাজ করি ওরা চায় না। হয়তো ভেবেছে সমুদ্রের তলায় প্রচুর মুক্তো আছে। আমাদের তাড়ালেই সেগুলো পাবে।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “সমুদ্রে মুক্তো পাচ্ছ না?”

“আরে না। আমি সেই চেষ্টাও করিনি। এখানকার সমুদ্রের জলে মুক্তোর শার্পনেস বেড়ে যায়। আর্টিফিসিয়াল মুক্তোর চাষ পৃথিবীর সব দেশেই হয়। আর্টিফিসিয়াল মুক্তো আর অরিজিনাল মুক্তোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। মুক্তো নিয়ে যারা চাষ করেন, তাঁরা এসব জানেন। সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু এখনও অরিজিনাল মুক্তোর দামই বেশি। আমি ঝিনুকের বুকে মুক্তো জন্মাবার আগেই একটা রিঅ্যাকশন সৃষ্টি করতে চাইছি, যার ফলে মুক্তোর রং পালটে যেতে বাধ্য। রেড পার্ল-এর রং টকটকে লাল করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হতে যাচ্ছে। কিন্তু গুণ্ডাদের উপদ্রব যেই কমল, অমনি আর-এক ঝামেলা শুরু হয়েছে। এই সমুদ্রে কখনও কোনও শার্ক কেউ দ্যাখেনি। একটি অতিকায় শার্ককে প্রায়ই ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। আজ দুপুরেই সেইরকম খবর পেয়ে আমি সমুদ্রে নেমেছিলাম।”

অর্জুন মন দিয়ে শুনছিল। জিজ্ঞেস করল, “আপনি নিজের চোখে

দেখেছেন ?”

“হ্যাঁ। তার চেহারা এত বিশাল যে, ছোট লঞ্চকেও ডুবিয়ে দিতে পারে। আমার সহযোগীরা মানুষকে ভয় পায়নি কিন্তু ওই দানবটার ভয়ে চট করে কেউ জলে নামতে চাইছে না।”

“আপনি কীভাবে জলের নীচে কাজ করেন ?”

“আমার একটা ছোট্ট সাবমেরিন আছে। নীচে নেমে যাওয়ার পব ডুবুরির পোশাক পরে অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে কাজ শুরু করি।”

অর্জুন ভাবল মার্শালিকে ব্রাউনেব দেখা শার্কটার কথা বলবে কি না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখাই ঠিক করল। সে জিজ্ঞেস করল, “পুলিশকে জানাননি কেন ?”

“জানাতে পারতাম। তবে সে-ক্ষেত্রেও আর-এক ধরনের লোভ কাজ করছে ?”

“লোভ ?”

“হ্যাঁ। মেজর জানে আমি আসলে অভিযাত্রী। এতবড় একটা শক্তি আমাব কাছাকাছি ঘুরছে, যার অস্তিত্ব কয়েকশো বছর আগে ছিল, তাকে পুলিশ দিয়ে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে না। দানবটাকে যদি আমি জ্যান্ত ধরতে পারি তা হলে সবচেয়ে খুশি হব।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “সেই চেষ্টা করেছ ?”

“করেছি। কয়েকবার ঘুমপাড়ানি বুলেট ছুঁড়েছি। দানবটার চামড়া এত শক্ত যে, বুলেটে কোনও কাজই হয়নি। চোখে মাবতে পারলে হত। কিন্তু অত সুন্দর দানবের চোখ যদি নষ্ট করে দিই, তা হলে ওর কী থাকল। যা হোক, তোমরা কি আমার সঙ্গে জলের নীচে নামতে চাও ?”

“মেজর বুক ফুলিয়ে বললেন, “অবশ্যই।”

“মৃত্যুভয় আছে কিন্তু।” সতর্ক করল মার্শালি।

“ওটা আমাকে দেখিও না।” মেজর হাসলেন, “দানবটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।”

অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আজ রাত্রেই একবার ব্রাউনকে নিয়ে দ্বীপের ওদিকটায় যেতে হবে। গুণ্ডারা থাকলে শার্ক কেন আসবে ? ব্যাপারটা কি নেহাতই কাকতালীয় ?

প্রোফেসর হ্যাচ মূর্খ মানুষ নন। সাপ পোষেন। সেই সঙ্গে শক্তিমান মানুষজন। তিনি কেন এই সমুদ্রসৈকতে আসবেন ? শুধু অর্জুনদের অনুসরণ করে এলে নিশ্চয়ই তাদের পেছনে রেখে আগে এখানে আসতেন না। সেই হোটেল থেকে অর্জুনরা অন্য কোথাও চলে গেলে অধ্যাপক তার খোঁজ পেতেন না। উনি নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছেন, তাদের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে যা তাঁর খোঁজার পরিশ্রম লাঘব করে দিতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, একমাত্র ব্ল্যাকপুলের রাস্তা থেকে ব্রাউনকে মেজর

ভেবে তুলে নেওয়া ছাড়া তিনি কখনওই সরাসরি আক্রমণ করেননি।

কিন্তু এই সমুদ্রে কেন প্রোফেসর হ্যাচ আগ বাড়িয়ে এলেন? পাল-তোলা নৌকোর দৃশ্যটা মনে পড়তেই উত্তেজিত হল অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে অমল সোমের সতর্কবাণী স্মরণে এল, কোনও ঘটনার দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দিও না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মনে হল, মার্শালি এখানে মুক্তো নিয়ে গবেষণা করুক তা যারা চায় না, তাদের মধ্যে হ্যাচও আছেন। হয়তো এই সমুদ্রে তারা নিরিবিলিতে কোনও কাজ করতে চায়। অবশ্য এসবই সত্যি হবে যদি মার্শালি মিথ্যে না বলে। অর্জুন কোনও কূল পাচ্ছিল না।

রাত দশটা বাজলে দ্বীপে কোনও মনুষ্য-কণ্ঠ শোনা গেল না। শুধু হাওয়ার সঙ্গে গাছপাতার সংঘাতের শব্দ দ্বিগুণ হয়ে বাজছিল। রাতের খাওয়া শেষ করেই ব্রাউন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। লোকটাকে তখন কিছু বলেনি অর্জুন। চারপাশ আরও শব্দহীন হয়ে এলে সে ব্রাউনের ঘুম ভাঙাল। কম্বল সরিয়ে অবিকল মেজরের মতো মুখভঙ্গি করে ব্রাউন জিজ্ঞেস করল, "কী হল, অ্যাঁ?"

একই ধরনের মুখের গড়ন এবং দাড়ি মাঝে-মাঝে অর্জুনকেও বিভ্রান্ত করে। সে গম্ভীর গলায় বলল, "চেঁচাবেন না। উঠে পড়ুন। চুপচাপ।"

ব্রাউনের তবু হুঁশ ঠিক হচ্ছিল না। মাথা তুলতে-তুলতে বলতে লাগল, "এইসব ইয়ার্কির কোনও মানে হয়! সবে হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটু দু-চোখ বুঝেছি, আর অমনি....! না হয় আমি একটু গায়ে পড়েই দলে ঢুকছি, তা বলে মাঝরাত্তিরে ঘুমোতেও পারব না?"

কথা বলার ধরনে হাসি পাচ্ছিল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, "হাড়ভাঙা খাটুনি কখন খাটলেন?"

"বাঃ। তোমবা যখন মার্শালের তাঁবুতে আড্ডা মারছিলে আমাকে বাদ দিয়ে তখন?"

"কীরকম?"

"আমি ওদের বললাম, জগিং করব।"

"কাদের?"

"এই মার্শালের পাহারাদারদের। বললাম জগিং না করলে শরীর খারাপ হয়। তা ওরা বলল, আমি এই তাঁবু থেকে কিচেন পর্যন্ত জগিং করতে পারি। তাই মেনে নিলাম। একবার সেই ফাঁকে কিচেনে ঢুকে চিকেন স্যান্ডুইচ খাচ্ছি এমন সময় কুকটার নজরে পড়লাম। ও ব্যাটা আমাকে দেখে হতভম্ব। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা রেস্টুরেন্টে রান্না করত। রেস্টুরেন্টের মালিক খুন হবার পর তিনজনের সঙ্গে পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করে। তিন বছর ঘানি ঘুরিয়েছে ব্যাটা। সেই শ্রীমান আমাকে দেখে হাতে-পায়ে ধরেছে। বলেছে যত ইচ্ছে খাও, কিন্তু মার্শালকে বোলো না।

আমি এখন ভাল হতে চাই।"

"আপনি তো কিছু বলেননি ?"

"না। ভেবে দেখলাম, মানুষকে ভাল হবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই যেমন তোমরা দিচ্ছ।"

ব্রাউন নিজের বুকের ওপর একটা আঙুল রেখেই মাথা নাড়ল, "কিন্তু তাই বলে ঘুম ভাঙানো ভারী অন্যায়।"

"খাওয়াটা তা হলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম ?"

"না। কুক আমাকে নিয়ে গেল ওর তাঁবুতে। এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে গেলে প্রথম তাঁবু। গিয়ে বলল, "আসুন আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে গল্প করি। সেটা যে কী পরিশ্রমের !"

"কী গল্প করলেন ?"

"এই মার্শালি লোকটার সঙ্গে যারা আছে, তারা সবাই বড়লোক হতে চায়। ঝিনুকের এক্সপেরিমেন্ট সফল হলেই সব ক'টা ঝাঁপিয়ে পড়বে। খবরটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ?"

অর্জুন হাসি চাপল, "তা বটে। কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু বলল না ?"

"হ্যাঁ। ওকেও বন্দরে যেতে দেয় না। সমুদ্রে নামতে দেয় না দিনের বেলায়।"

"রাত্রে ?"

"দেয়। একবার। সব কাজ শেষ করে স্নান করতে দেয়।"

"সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে হয়ে গেছে।"

ব্রাউন কাঁধ ঝাঁকিয়ে নীরবে বলল, সে জানে না।

অর্জুন বলল, "উঠুন, বেরোব।"

"বেরোবে ? এত রাত্রে ?"

"আপনাকে আমি বলেছিলাম।"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখন কোথায় যাব আমরা ?"

"যেখানে দিনের বেলায় গিয়েছিলেন। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।"

"কিন্তু ওরা যে পাহারা দিচ্ছে !"

"দেখাই যাক না। পোশাক পরে নিন।"

অনিচ্ছুক ঘোড়া নিয়ে দৌড়নো যায় না। বেরোবার আগে প্রতিপদে এক-একটা ওজর দেখিয়েছিল ব্রাউন, অর্জুন শোনেনি। তাঁবু থেকে বেরিয়েছিল ওরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। বালির ওপর চুপচাপ বসে ছিল মিনিটখানেক। দিনের বেলায় দেখেছে পাহারাদারগুলো জায়গা ভাগ করে চক্রাকারে ঘোরে। সমুদ্রের গর্জন এখন তীব্রতর মনে হয়েছে। মনে হচ্ছে

বাঁ দিকেও সমুদ্র আছে। অর্জুন পাতলা অন্ধকারে কাউকে দেখছিল না। বাঁ দিকে সেই কুকের তাঁবুটা খুব ঝাপসা নজরে আসছে। এই সময় সে শিস শুনতে পেল। ওপাশ থেকে তৎক্ষণাৎ শিস ভেসে এল। এদিকের লোকটা এবারে গলা তুলে বলল, "আমি এসে গিয়েছি।"

ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, "ধন্যবাদ।" এবং তখনই দুটো লোককে মিলিত হতে দেখল অর্জুন। পাহারাদার বদল হচ্ছে ? ও পাশের লোকটা চলে গেল ডান দিকের তাঁবুর দিকে। অর্জুন চটপট ব্রাউনকে খোঁচা দিয়ে কুকের তাঁবুর দিকে চলে এল। ব্রাউনও এল একটু থপথপ করে। তাঁবুর দরজায় পৌঁছে সে ব্রাউনকে ফিসফিস করে বলল, "কুককে বলুন, আপনার সমুদ্রে স্নান করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পাহারাদার রাজি হবে না। তাই সে পাহারাদারকে কথা বলে কিছুক্ষণ যেন আটকে রাখে। রাজি না হলে মার্শালকে বলে দেবার ভয় দেখাবেন।"

"কিন্তু এখন আমি কিছুতেই সমুদ্রের জলে নামব না।" হাঁটুতে ভর করে বসে ব্রাউন মাথা নাড়ল।

"আপনাকে নামতে হবে না।" অর্জুন ওকে ঠেলল, "যান চটপট।"

তাঁবুটা ছোট। কুক একা থাকে কি না তাও জানা নেই। অর্জুন দেখল, ব্রাউন বালির ওপর প্রায় গড়িয়ে তাঁবুর তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সে বাইরে তাকাল। অন্ধকার এখন কিছুটা সহনীয়। কুকের চাপা গলা কানে এল, "আপনি ? কী আশ্চর্য ! এখানে কেন ?"

ব্রাউন খুব নিচুস্বরে বোঝাতে লাগল কেন এসেছে। তার শরীর জ্বলছে, একবার সমুদ্রে স্নান না করলে চলছে না। অথচ পাহারাদাররা জানলে অনুমতি পাওয়া যাবে না। কুককে একটু সাহায্য করতেই হবে, নইলে বন্ধু কিসের ! কুক বলল, মার্শাল জানতে পারলে তার চাকরি চলে যাবে। তা ছাড়া যে সমুদ্রে হাঙর আছে, সেখানে স্নান করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষ করে যখন বন্দুক নিয়ে কেউ পাহারা দিচ্ছে না। ব্রাউন জানাল, সেক্ষেত্রে মার্শাল এখনই জেনে যাবে তার কুকের পরিচয়। চাকরি তাতেও থাকবে না।

তাঁবুর ভেতর শব্দ হতে অর্জুন হামাগুড়ি দিয়ে সরে দাঁড়াল। কুককে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। পেছন-পেছন ব্রাউন। দরজায় পৌঁছেই নিল ডাউন হয়ে বসে পড়ল ব্রাউন। আর তখনই চিৎকার উঠল, "হু ইজ দেয়ার ?"

"দিস ইজ মি, ইওর কুক।"

"কুক ? হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দেয়ার ?"

"নাথিং। শুধু খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে।"

"ফানি ম্যান। হোয়াটস্ দি ট্রাবল উইথ ইউ ?" ওপাশের অন্ধকার ফুঁড়ে অস্ত্র হাতে একটি মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। অর্জুন

দেখল কুক নিজে একটা সিগারেট মুখে নিয়ে আর-একটা পাহারাদারকে দিল। অর্জুন আবার হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করল। আরও খানিকটা খোলা জায়গা দিয়ে ওদের যেতে হবে। গাছতলায় সে যখন পৌঁছল, তখন তার সামনে আর-একটি লোক। ঠিক অর্জুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। অর্জুন ডান হাতের ধার দিয়ে ওর ঘাড়ে কোপ মারল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা কাটা কলাগাছের মতো নেতিয়ে পড়ল। ওকে টেনে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অস্ত্রটা নিল সে। এটা রিভলভার, বন্দুক কিংবা রাইফেল নয়। এটার ব্যবহারও সে জানে না। অতএব একটা ভারী জিনিস বহন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ব্রাউন ইতিমধ্যে লোকটার কোমর-পকেট হাতড়ে একটা ছুরি বের করে অর্জুনকে দিল। ধন্যবাদ জানাতে গিয়েও পারল না সে; কারণ ব্রাউন আরও কিছু পকেটে ঢুকিয়েছে এবং সেগুলো পাউন্ড হওয়া অসম্ভব নয়।

মিনিট-তিনেক নির্বিঘ্নে চলে এল ওরা জঙ্গলে-জঙ্গলে। যে এজেন্সির ওপর মার্শাল ভরসা করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই অপদার্থ নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন একই কাজ মানুষকে অনেক সময় শিথিল করে। তা ছাড়া দুর্ভাগ্য নেহাতই প্রবল না হলে ওই লোকটি অর্জুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকত না। হয়তো অন্ধকারে নিজেদের তাঁবু থেকে বাইরের দিক দিয়েই আক্রমণ আসতে পারে বলে পাহারাদার আশঙ্কা করেছিল। আক্রমণটা ভেতর থেকেই আসবে তা সে বুঝতে পারেনি। সাধারণত এরকম আঘাতে ঘণ্টা-তিনেকের আগে চেতনা স্বচ্ছ হয় না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোন দিকে গিয়েছিলেন?"

ব্রাউন চারপাশে তাকাল। এর মধ্যে একবার আছাড় খেয়ে বেচারার কনুই ছড়েছে। সেখানে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "নাঃ। এদিকে তো আসিনি।"

"কোন দিকে গিয়েছিলেন?"

"সমুদ্রটা কাছে ছিল। মানে যে গাছে আমি উঠেছিলাম, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল।"

"আপনি বলেছিলেন বাঁ দিকে এসেছিলেন, এখন আমরা বাঁ দিক দিয়েই এলাম।"

"কিন্তু সমুদ্র না থাকলে আমি কী করব?"

অর্জুন আর কিছু বলল না। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে আসায় ভুল হয়েছে বলে মনে হল। মিনিট-দশেক এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে সে কোনও জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব টের পেল না। এবং এই সময় ওরা সমুদ্র দেখতে পেল। অন্ধকারে একমাত্র আওয়াজ ছাড়া সমুদ্রের চেহারা বড় শান্ত দেখায়। যেন কালচে-সবুজ জলরাশি দিগন্ত ছুঁয়ে গেছে। অর্জুন ব্রাউনের দিকে তাকাতেই সে মাথা নাড়ল, "না। এই সমুদ্র নয়। অবশ্য সব সমুদ্রই

আমার একরকম লাগে।"

"গাছটাকে খুঁজুন, কী গাছ ছিল?"

"দূর! আমি গাছের নাম বলতে পারতাম না বলে স্কুলে কম নম্বর পেতাম।"

অর্জুন হতাশ নিশ্বাস ফেলল। তারপর বালির আড়াল রেখে হাঁটতে লাগল সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। শীত করছে খুব। হাওয়া বইছে সপাটে। ব্রাউন জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"নরকে।"

"ও!"

মাথার পেছনে বালির পাহাড়ের আডাল, সামনে সমুদ্র। জিরোবার জন্যেই ওরা বসেছিল। অর্জুন দিক বোঝবার চেষ্টা করল। শেষমেশ মনে হল, তারা যেদিকে মুখ করে বসে আছে, সেদিকে সমুদ্রের উত্তব দিক। আর তখনই তার নজর পড়ল একটা নৌকো সমুদ্রের গভীর থেকে এগিয়ে আসছে। ব্রাউনকে সতর্ক করল। পেছন থেকে তাদের দেখা না গেলেও ওই নৌকোয় বসে তাদের লক্ষ করা অসম্ভব নয়। প্রায় বালির ওপর শুয়ে পড়ল ওরা। ব্রাউন ফিসফিস করে বলল, "সাহস খুব। এত রাত্রে দাঁড়টানা নৌকো চালাচ্ছে।"

অর্জুন কিছু বলল না। নৌকোটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুজন দাঁড় টানছে, একজন বসে। ঠিক ওদের সামনে দিয়ে আর একটু বাঁ দিকে এগিয়ে যেতেই যেন হুইসল বাজল। এবং তাবপরেই নৌকোটা একটা খাড়ির ভেতরে ঢুকে চোখের আড়াল হয়ে গেল। অর্জুন বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত। এরা অবশ্যই মার্শাল সাহেবের লোক নয়। দ্বীপের এই দিকটা কি অন্য কেউ দখল করেছে? মার্শালের লোকজন তো ইচ্ছে করলেই দিনদুপুরে এদের আবিষ্কার করতে পারে। সে ব্রাউনকে বলল, "আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। আমি আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ? আমার মাটিতে একা বসে থাকতে ভয় লাগবে।"

"তা হলে কাছেপিঠের কোনও গাছে উঠে বসুন।"

"সেটা একটা ভাল ব্যাপার। দাঁড়াও, আগে আমি গাছে উঠি, তারপর তুমি যেও।"

বালির পাহাড় ডিঙিয়ে পেছনে এসে খানিকটা হাঁটতেই একটা বড় গাছ পাওয়া গেল। ব্রাউন চটজলদি ওপরে উঠতে লাগল। পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়েই সে নেমে এল খানিকটা, "এই পেয়েছি। এই গাছটাতেই তখন আমি উঠেছিলাম।"

"বুলেট-ভাঙা ডালটা এখনও আছে।" ফিসফিস শব্দটাও যেন জোরে শোনাল।

অর্জুন নিশ্বাস বন্ধ করে চারপাশে নজর বোলাল। বিরোধীপক্ষের ঘাঁটি

কি খুব কাছে ! ওপর থেকে নেমে আসছিল ব্রাউন। অর্জুন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, "কী হল ?"

"যদি আবার গুলি আসে ?"

"একই গাছে দু'বার উঠবেন কেউ ভাববে না। তা ছাড়া রাত্রে ওখানেই আপনি সেফ।"

"বলছ ?" প্রশ্নটি করেই উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে ব্রাউন আবার ওপরে উঠে গেল। অর্জুন আবার বালির পাহাড় ভেঙে নেমে এল সমুদ্রের ধারে। তারপর আড়াল রেখে এগিয়ে গেল সামনে। মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর সে ফাঁড়িটাকে দেখতে পেল। ওর ভেতরেই নৌকো ঢুকেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। এভাবে এগিয়ে যেতেও আর সে সাহস পাচ্ছিল না। মাথা ওপর জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেখানে এসে দাঁড়ালে যে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। বালির পাহাড়ের আড়ালটা আর এখানে নেই। আর তখনই সে মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেল। কেউ কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। অর্জুন সেসবের কিছুই বুঝতে পারল না। এই সময় নৌকোটা বেরিয়ে এল। এবার দুটো লোক চালাচ্ছে আর দুজন বসে রয়েছে। মনে হল আগের লোকটি যেন কাউকে নিতে এসেছিল।

অর্জুন বালির ওপর শুয়ে পড়ে নৌকোটাকে দেখল। ওরা দ্রুত অন্ধকার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সময় শিস শুনতে পেল। শিসটা এগিয়ে আসছে। তারপরেই মূর্তিটাকে দেখতে পেল সে। কাঁধে লম্বা বন্দুক ঝুলিয়ে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রের ধারে। নৌকোটার চলে যাওয়া দেখছে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে হাত-পনেরো দূরে। যদি ওখান থেকে তাকে দেখতে পায় তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। অর্জুন চুপচাপ পড়ে রইল।

কোথাও কি কুকুর ডাকছে ? একটানা। এই দ্বীপে কুকুর আসবে কোত্থেকে ! সামনের লোকটা সমুদ্র দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসছে। এখন হাত-আটেক ব্যবধান। হঠাৎ ওপরে আর একটি স্বর বাজল, "মাইক, জ্যাক হঠাৎ খুব খেপে গেছে।"

"মাইট বি হি ইজ হাংরি।"

"নো। আমি একটু আগে ওকে খেতে দিয়েছি। ও কিছু গন্ধ পেয়েছে।"

"গন্ধ ? এই রাত্রে ওরা কখনও নিজেদের এলাকা থেকে বের হয় না। ঠিক আছে, মাইককে ছেড়ে দাও। দেখি ও কী খুঁজে পায়।"

"বাঃ চমৎকার। বিকেলে একবার ছেড়ে দিয়েছিলাম। ধরতে প্রাণ বের করে দিয়েছিল। তুমি বরং ওর চেন নিয়ে একটা সার্ভে করে এসো।"

"ডু ইট ইওরসেলফ্। সব-সময় মনে রাখবে, আমি তোমার সিনিয়ার।"

"ওকে। আমি আজ করছি। কিন্তু মনে রেখো এই শেষবার।" লোকটা সম্ভবত চলে গেল। কারণ তখনই মাইক নামের লোকটা ওপরের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়েছিল, "হেই, তুমি কি আমাকে শাসাচ্ছ? মনে রেখো, তোমার শাসানিকে আমি তোয়াক্কা করি না।" কিন্তু ওপব থেকে উত্তর এল না। কথা বলতে বলতে মাইক চলে এসেছিল। হাত-চারেকের মধ্যে। তার মুখ এখন উর্ধ্বমুখী। কিছুটা উত্তেজনার কারণে সে মুখ নামিয়েও বিড়বিড় করল।

অর্জুন কাঁটা হয়ে শুয়েছিল। এখন তার আর কিছুই করার নেই। মাইক তাকে দেখতে পাবেই। পেলেই যদি গুলি করে তা হলে হয়ে গেল। এবং তখনই মাইক অস্ফুটে কিছু বলে উঠে এক লাফে তার পাশে এসে দাঁড়াল। অর্জুন চাপা গলায় প্রশ্ন শুনল, "হু আর ইউ?"

অর্জুন উত্তর দিল না। সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। অমল সোম বলেছিলেন. সাপও ফণা তোলে কিন্তু নড়াচড়া না দেখা পর্যন্ত ছোবল মারে না। গুলি করার আগে মাইকেরও একটা প্রস্তুতি প্রয়োজন। এবং তখনই কোমরের নীচে একটা লাথি এসে পড়তেই গড়িয়ে গিয়ে স্থির হয়ে গেল অর্জুন। প্রাণপণে নিশ্বাস আটকে সে পড়ে রইল।

"ডেড?" মাইক বিড়বিড় করল। তারপর রাইফেল বালির ওপর রেখে অর্জুনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। ওর একটা হাত নাকের নীচে অনুভব করল অর্জুন। নিশ্বাস পড়ছে কি না পরীক্ষা করছে। এবং সুযোগটা হাতছাড়া করল না অর্জুন। দ্রুত পা গুটিয়ে মাইক সতর্ক হবার আগেই জোড়া লাথি কষাল ওর বুকে। সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে গেল মাইক। স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে পড়ে থাকা রাইফেল তুলে তার বাঁট দিয়ে লোকটার মাথায় আঘাত করল সে। মাইক চিৎকার করে বাধা দিতে গিয়েও পারল না। দ্বিতীয় আঘাতেই জ্ঞান হারাল।

আর সেই সময় কুকুরের চিৎকার প্রবল হল। কুকুরটা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। রাইফেল নিয়ে দৌড়তে লাগল অর্জুন। বালির পাহাড়টার কাছে এসে সে নিশ্বাস ফেলল। সাক্ষাৎ-মৃত্যুর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসার পর তার নিশ্বাস কিছুতেই সহজ হচ্ছিল না। কুকুরের আওয়াজটা কমে গিয়েছিল। অর্জুন চারপাশে তাকাল। ওরা নিশ্চয়ই মাইককে এখনই আবিষ্কার করবে। ওদের দলে ক'জন আছে বোঝা যাচ্ছে না। রাইফেলটায় গুলি আছে কি না চট করে যাচাই করে নিঃসন্দেহ হল। অন্তত মরে যাওয়ার আগে পালটা আক্রমণ করার একটা সুযোগ রইল। কুকুরের ডাক আবার কাছাকাছি চলে এসেছে।

হঠাৎ সমুদ্রের জলে আলোড়ন হল। এবং তারপরেই দম বন্ধ হয়ে গেল অর্জুনের। সমুদ্রের জল উত্তাল করে একটা বিশাল জন্তু মুখ তুলেছে। তার লেজের আঘাতে অনেকটা জল ছিটকে আকাশে উঠে গেল।

জন্তুটা আবার ডুবে গেল জলের তলায়। এই কি সেই দানব-হাঙরটা, যার কথা মার্শাল বলছিল ? সমুদ্রের মধ্যে ওর সামনে পড়লে এক মুহূর্ত লাগবে না নিষ্প্রাণ হতে। অর্জুনের মাথা অকেজো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই কুকুরের বীভৎস চিৎকার ছুটে এল তার দিকে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে বালির আড়ালে হাঁটু মুড়ে বসল। ওপাশে কুকুর আর এপাশে জলদানব, যার দেখা প্রথমে পাবে তাকে লক্ষ্য করেই গুলি চালাবে সে।

কুকুরটাকে সামলাতে পারছিল না পাহারাদার। মাঝে-মাঝেই শিস দিয়ে তাকে শান্ত হতে হুকুম করছে সে। কিন্তু তাকে প্রচণ্ড জোরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে জন্তুটা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে লোকটা ডাকতে লাগল, "মাইক ! মাইক ! কাম কুইক !"

অর্জুন এবার ওদের দেখতে পেল। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়েছে ওরা। ওর হাতে কুকুরের চেইন। জন্তুটা একবার জঙ্গলের দিকে আব একবার অর্জুন যেদিকে দাঁড়িয়ে সেদিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা কবছে। লোকটা আবার ডাকল, "মাইক !" সাড়া পেয়ে কুকুরটাকে টানতে-টানতে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল। এবং এইসময় সে মাইকের শরীর দেখতে পেল, "ওঃ গড !"

মাইককে দেখছিল কুকুরটা। তার গতিও একমুখী হওয়ায় প্রহরীর কোনও অসুবিধে হল না। মাইকের শরীরের পাশে পৌঁছে কুকুরটা একবাব শুঁকে নিয়ে দ্বিগুণ শব্দ করতে লাগল। জন্তুটার চেহারা বেশ ভীতিকর। যদি ছাড়া পায় তা হলে গুলি চালানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু প্রহরী কুকুরকে ছেড়ে দিল না এবং মাইকের শরীরের পাশ থেকে সরেও এল না। অর্জুন দ্রুত জঙ্গলে ঢুকে গেল। নির্দিষ্ট গাছটির নীচে পৌঁছতেই ওপর থেকে ব্রাউনের গলা ভেসে এল, "কুকুর ডাকছে কেন ?"

"চটপট নেমে আসুন।"

অর্জুন কথা শেষ করা মাত্র সরসর করে নীচে নেমে এল ব্রাউন। অর্জুনের মনে হল এই একটা জায়গায় মেজরের সঙ্গে ব্রাউনের পার্থক্য রয়েছে। মেজর শারীরিক দিক দিয়ে ব্রাউনের মতো এত ফিট নন। নীচে নেমেই ব্রাউন বলল, "তুমি কি সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলে ? শার্কটাকে দেখেছ ? ইটস্ এ মনস্টার। ওঃ।"

অর্জুন বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরে চলুন। আমাদের নিজস্ব প্রহরীরা কী অবস্থায় আছে কে জানে।" হাঁটতে-হাঁটতে ব্রাউন বলল, "ওরা আর যাই হোক আমাদের তো গুলি করবে না। একটু বকাঝকা করবে, বড়জোর কাল সকালে এই দ্বীপ থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে। তার বেশি কিছু তো করবে না।"

ক্যাম্পে ঢোকার আগে সেই প্রহরীটিকে তখনও অচৈতন্য দেখল ওরা। ব্রাউন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "মরে যাবে না তো ?" অর্জুন ওর

নাকের নীচে হাত রেখে নিশ্বাস পরীক্ষা করে বলল, "কোনও চান্স নেই।" কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরী ওদের পথ আটকে দাঁড়াল, "কে ?"

ব্রাউন জবাব দিল, "আমরা। মিস্টার মার্শালের গেস্ট।"

লোকটা আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে সামনে এল, "তোমরা ? তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ?"

"বেড়াতে। ঘুম আসছিল না, তাই।" ব্রাউন ভিজে বেড়ালের মতো জানাল।

"কিন্তু এখান থেকে বাইরে গেলে কী করে ?"

"পায়ে হেঁটে। দেখছই তো।"

"কী আশ্চর্য ! আমি তোমাদের যেতে দেখলাম না তো ! ওপাশে আর কেউ বাধা দেয়নি ?"

"না ! আমরা ভাবলাম আজ বোধহয় পাহারা নেই।"

"মাই গড ! কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ? জানো, আজ রাত্রে খুন হয়ে যেতে পারতে।"

"খুন তো হইনি। দেখতেই পাচ্ছ।"

প্রহরীটি আরও একটু এগিয়ে এল, "স্যাম তোমাদের বাধা দেয়নি ? ওপাশে ওর দেখা পাওনি ?"

"না ! তা ছাড়া আমরা চোর না ডাকাত যে, বাধা দেবে !"

"ব্যাটা নির্ঘাত ঘুমোচ্ছে। শোনো, একটা অনুরোধ করব। তোমরা যে ঘুরতে বেরিয়েছিলে, তা কারও কাছে গল্প কোরো না। তা হলে এজেন্সি আমাদের ছিঁড়ে খাবে। বুঝলে ?"

ওরা মাথা নেড়ে নিজেদের তাঁবুতে চলে এল। ফেরামাত্র ব্রাউন চলে গেল বিছানায়। আর সিগারেট ধরাল অর্জুন। সমস্ত ব্যাপারটা কীরকম রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কঠোর নিরাপত্তা নিয়ে মার্শালসাহেব দ্বীপের এ-প্রান্তে মুক্তো পরীক্ষা করছেন। আর রাত নামলেই দ্বীপের ওপাশে আগ্নেয়াস্ত্র আর কুকুর নিয়ে অন্য দল পাহারা দেয়। নৌকোয় চড়ে দাঁড় বেয়ে কারাই-বা মাঝরাত্রে সমুদ্রে যাচ্ছে ? এত বড় একটা হাঙর যে সমুদ্রে ঘোরাফেরা করে সেখানে নৌকো বাইতে ওরা কেন ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু ওপাশে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ প্রায়। হঠাৎ অর্জুনের মস্তিষ্কের কোনও কোষে যেন আলো জ্বলে উঠল। উত্তর দিকে এক ঘণ্টা দাঁড়টানা নৌকোয় গেলে মে মাসে সূর্যদেব যেখানে মাথার ওপরে আসেন ঠিক সাড়ে বারোটায়, মাটি আর আকাশ যেখানে সমান দূরে অবস্থান করে, সেখানে পৌঁছনোর জন্য নৌকোটা চেষ্টা করছে না তো ? কিন্তু মধ্যরাতে সূর্য পাবে কোথায় আর সময়টা তো মে মাস নয়। তা হলে ?

ব্রেকফাস্টের পর মার্শাল ওদের নিয়ে বের হলেন। ব্রাউনের স্বাওয়ার

বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। মার্শালের অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল সে, "জলের নীচে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। হোক না সাবমেরিন, তবু জলের নীচে তো বটে। অনেকের যেমন বেশি উঁচুতে উঠলে মাথা ঘোরে, তেমনই জল আমি সহ্য করতে পারি না।" মেজর খুশি হলেন ব্রাউন যাচ্ছে না বলে। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, "বাহাদুর বটে।"

তাঁবুতে ফেরার আগে ব্রাউন অর্জুনকে চাপা গলায় জানিয়ে দিয়ে গেল, "পৈতৃক প্রাণটা হারাতে চাই না ভাই। ওই বিশাল হাঙরটার মুখোমুখি হলেই তোমরা গিয়েছ। তোমার দেশে কাকে কী খবর দিতে হবে তা একটা কাগজে লিখে দিয়ে গেলে বুদ্ধিমানের কাজ করবে।"

অর্জুন হেসে বলেছিল, "হাঙরটা বোধহয় হিংস্র নয়। দাঁড়টানা নৌকোকে যখন কিছু বলেনি, তখন সাবমেরিনকে কেন বলবে।"

পাহাবাদারদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে এল ওরা। কাল যেদিকে গিয়েছিল অর্জুন, এটা তার ঠিক উলটো দিক। সাবমেরিন এখন জলের ওপর ভাসছে। ওরা ভেতরে ঢুকে গেলে সেটি দরজা বন্ধ করল। খুব ছোট হলেও বড় কাজের, তথ্যটা জানাল মার্শাল। ওরা যেখানে বসে ছিল তার তিন পাশে বুলেটপ্রুফ-জাতীয় কাচ। ধীরে-ধীরে যান নীচে নেমে যাচ্ছে। অর্জুনের এই অভিজ্ঞতা প্রথম। মেজর বললেন, "এটা আমাব তৃতীয়বার। একবার অতলান্তিকে ছিলাম দিন-তিনেক। ফ্যান্টাস্টিক।"

জলের নীচের জগৎটা কি জলের ওপরের জগতের চেয়ে বেশি রহস্যময়! এখন ওরা যে-স্তরে রয়েছে সেখানে সূর্যের আলোর প্রতিফলন পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে একটার পর একটা ঝাপসা দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ছে। ইঞ্চি থেকে এক-হাতি মাছেরা সঙ্গ ছাড়ছে না। খুব মজা লাগছিল অর্জুনের। সাবমেবিনটি চালাচ্ছিল যে লোকটি তাকে মার্শাল মাঝে-মাঝে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এবার ঘুরে বসে বললেন, "তোমরা কি জানো, কীভাবে ঝিনুকের বুকে মুক্তো জন্মায়!" মেজর বললেন, "কীভাবে আর, প্রকৃতি দিয়ে দেয়।"

মার্শাল মাথা নাড়লেন, "না। মুক্তো শরীরে আসে বাইরে থেকে। অবশ্য আসার সময় তা মুক্তো থাকে না। ঝিনুকের শরীর খুব নরম। সেটাকে বাঁচাতে কনচিওলিন নামক এক পদার্থ দিয়ে সে তার খোলটি তৈরি করে। ঝিনুক যখন খাবার খায়, তখন ওই খোলের ফাঁক দিয়ে যদি কোনও কাঁকর ঢুকে পড়ে তখন তার শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। সেই কাঁকর বা বালিকণাকে ঘিরে ফেলতে সে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তরল রস ঢালতে থাকে। অনেকটা আবরণ পড়ে গেলে তার ব্যথা কমে আসে। আর কার্বনেটের আবরণ জমে জমে বালিকণাটি একসময় মুক্তোয় পরিবর্ধিত হয়। শুধু বালিকণা নয়, যে-কোনও জিনিস ওই শরীরে ঢুকলেই এমন কাণ্ড ঘটতে পারে। পারস্য উপসাগর আর মান্নার উপসাগরে মুক্তো

বেশি পাওয়া যায়। ওখান থেকে আমি প্রচুর পিঙ্কটাডা'ভালগারিস ঝিনুক আনিয়েছি এখানে। এই প্রজাতির ঝিনুকে বেশি মুক্তো পাওয়া যায়। মেক্সিকোতেও এক ধরনের ঝিনুক পাওয়া গেছে, যার মুক্তোর রং উজ্জ্বল কালো।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সব ঝিনুকে মুক্তো হয় না কেন?"

মার্শালি বললেন, "মুক্তোওয়ালা ঝিনুকেব চেহাবা হল বাঁকাচোরা। নদী বা পুকুরে যেসব ঝিনুক পাওয়া যায় তা হল ইউনিও গোষ্ঠীব।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "লাল বঙের মুক্তো চাইছ কেন?"

"টকটকে লাল মুক্তো নেই বলে। মেক্সিকোতে কালো মুক্তো, অস্ট্রেলিয়ান মুক্তো রুপোলি, জাপানি মক্তো সাদাটে-সবজে, ভারতীয় মুক্তো হালকা গোলাপি। কিন্তু টকটকে লাল কোথাও নেই। কীভাবে করছি জানতে চেও না। তবে এখনই কয়েকটা বড়-বড খাঁচা দেখবে। বাঁ দিকে, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ? ওই খাঁচায় আমার ঝিনুকরা রযেছে। তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে ওদের শরীরে মুক্তো দেখার জন্যে।"

"তিন বছর? সে তো অনেক সময।" মেজর বলে উঠলেন।

"তার অনেকটাই তো পার করে দিলাম।" বলতে-বলতে চিৎকার করে উঠলেন মার্শালি। জলের ভেতর শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে খাঁচাগুলো। হয়তো বয়া জাতীয় কিছু দিয়ে তাদের ভাসিয়ে বাখা হয়েছে। কিন্তু বেশ-কয়েকটা খাঁচা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। তার ভেতরে একটিও ঝিনুক নেই। উত্তেজিত মার্শালের নির্দেশে চালক সাবমেরিনটি নিয়ে গেল খাঁচার পাশে। চটপট পাশের ঘরে চলে গেলেন মার্শালি। তারপরই সাবমেরিন দুলে উঠল। অর্জুন লক্ষ করল ডুবুরির পোশাক পরে মার্শালি সাঁতরে ভাঙা খাঁচাগুলোর কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। সাধের জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয় মার্শালের এখন সেই অবস্থা। নিশ্চযই সেই হাঙরটা আবার হানা দিয়েছে এখানে।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "হাঙরটা আবার এখনই আসতে পারে না?"

চালক মাথা নাড়ল, "পারে। মিস্টার মার্শালি ঝুঁকি নিচ্ছেন।" সে ধীরে-ধীরে যানটি নিয়ে এল খাঁচার পাশে। মার্শালি অদৃশ্য হয়ে গেলেন চোখের সামনে থেকে। এবং তার এক মিনিটের মধ্যেই সেই ডুবুরির পোশাকেই মুখোশ খুলে ঘরে ঢুকে চেঁচাতে লাগলেন, "উই মাস্ট কিল হিম। কাল রাত্রে এসে আবার নষ্ট করে গিয়েছে। আমার পেছনে লেগেছে জানোয়ারটা। একবার যদি সামনে পেতাম তা হলে দেখিয়ে দিতাম বাছাধনকে। উঃ, ভাবতে পারো আমার এতদিনের পরিশ্রমের অর্ধেকটা এইভাবে বানচাল করে দিল হাঙরটা!"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ভাঙা খাঁচায় একটাও ঝিনুক নেই?"

"তুমি তো বেজায় আহাম্মক! পাখির খাঁচা খোলা রাখলে সে তোমার

জন্যে সেখানে বসে ডিম পাড়বে ? জলের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে ঝিনুক, সে কি আর থাকে ? প্রতিটি ঝিনুককে কী সুন্দর অপারেশন করে মুক্তো তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিলাম। দিব্যি বেঁচে ছিল ওগুলো।"

মার্শালি কথা শেষ করতেই চালক চিৎকার করে উঠল, "হে বস্। লুক। হি ইজ দেয়ার।"

ওরা জলের মধ্যে দেখতে পেল হাঙরটাকে। এত বিশাল এবং বীভৎস হাঙর স্বপ্নেও দ্যাখেনি অর্জুন। হাঙরটা রয়েছে একশো ফুট ওপরে। তাই ঝাপসা লাগছে ওর শরীর। কিন্তু জল পরিষ্কার থাকায় আদলটা বোঝা যাচ্ছে। চুপচাপ সেটা যেন লক্ষ করছে এই যানটাকে। মার্শালিসাহেব সঙ্গে-সঙ্গে পাগল হয়ে গেলেন যেন। চালককে বললেন, "আমি যেভাবে বলব সেইভাবে চালাবে।" তারপর দৌড়ে ঢুকে গেলেন পাশের ঘরে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নির্দেশ এল, "কোনাকুনি ওর দিকে চলো।"

চালক বলল, "বস্। ইট উইল বি ডেঞ্জারাস।"

"যা বলছি তাই করো।"

"অতএব আমাদের যানটি কোনাকুনি চলল। হাঙরটির হাঁ-মুখ দেখা যাচ্ছে। চোখ জ্বলছে। বাঘ যেমন শিকারের ওপর লাফাবার আগে শরীর টানটান করে নেয়, এও কি তাই করছে ? হঠাৎ জলের ভেতর তীব্র কম্পন উঠল। হাঙরটা সামান্য নড়ল মাত্র। পর পর দু'বার। চালক বলল, "বস, গুলি করে ওকে খেপিয়ে দিচ্ছেন।"

এবার হাঙরটি এগোতে লাগল। সেই বীভৎস মুখগহ্বর মৃত্যুর আগেও ভুলতে পারবে না অর্জুন। মেজর চিৎকার করে ভিরমি খেয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গে যান ঘুরিয়ে তীব্র বেগে পেছন ফিরেছে চালক। মার্শালের আদেশের জন্য সে আর অপেক্ষা করেনি। কিছুটা পথ তাড়া করে এসেছিল হাঙরটা। তারপর পলায়নকারীর প্রতি নিতান্ত অবহেলাতেই সে থেমে গেল। যাওয়ার আগে জলে যেভাবে আলোড়ন তুলল তাতে জানিয়ে দিল শক্তির বিচারে একটা কুকুর হাতির সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল।

সাবমেরিন থেকে লঞ্চে উঠে তাঁবু পর্যন্ত মেজর কথা বলার শক্তি হারিয়েছিলেন। মার্শালি গুম হয়ে রইলেন। শুধু শেষ মুহূর্তে চালককে ডেকে বলেছিলেন, "থ্যাঙ্কস। কিন্তু এই ঘটনাটার কথা আর কেউ জানতে না পারে। মনে রেখো।"

তাঁবুতে ঢুকে মার্শালি কাঁচা ব্রান্ডি মেজরকে দিলেন গ্লাসে ঢেলে, নিজেও নিলেন। অর্জুনকেও অফার করেছিলেন তিনি, কিন্তু সে মাথা নেড়ে খাবে না বলল। এই সময় ব্রাউন এসে দাঁড়াল তাঁবুর দরজায়, "ও, সেলিব্রেট করা হচ্ছে ! আমি কি বাদ যাব ?"

মার্শালের মেজাজ খুব খারাপ থাকারই কথা, তিনি বোতলটা ছুঁড়ে দিলেন ব্রাউনের দিকে। দক্ষ গোলকিপারের মতো ব্রাউন সেটাকে ধরে

ফেলল। তারপর ছিপি খুলে খানিকটা ঢেলে দিল গলায়। অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল। এখনও মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়নি। মেজর কথা বলছেন না, ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তার ওপর মার্শালি তাঁকে আহাম্মক বলে গালাগাল দিলেন, একটা প্রতিবাদ করেননি মেজর। এটাও অস্বাভাবিক। হাঙরটার বিশাল চেহারা, বীভৎস হাঁ যেন অর্জুনের চোখের সামনে বারংবার ঘুরে আসছিল। ইচ্ছে করলে প্রাণীটি এতক্ষণে তাদের গিলে ফেলতে পারত।

মার্শালি ব্রান্ডি শেষ করে বললেন, "আমি আজই পোর্ট পুলিশের কাছে যাব। ওটাকে মারতেই হবে।"

"আপনি কি গুলি করেছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। দু'বার। যেন লোহাকে গুলি করছি। কী ভয়ঙ্কর, এর পর তো ওখানে গিয়ে কাজ করাই অসম্ভব হয়ে গেল। একটা খাঁচা এখনও আস্ত আছে, তাও নষ্ট করবে ব্যাটা।"

"কিন্তু পোর্ট পুলিশের দিকে যেতে হলে তো এদিকের সমুদ্র ডিঙোতে হবে।" আচমকা বলে উঠল ব্রাউন। তার হাতে এখনও ব্রান্ডির বোতল।

"ওপাশের সমুদ্রে কোনও ভয় নেই।" "আপনারা কি দানবটাকে দেখেছেন আজ?"

অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই খুব খুশি হল ব্রাউন, ভাগ্যিস যাইনি। তখনই আমাব মন কু গাইছিল। কিন্তু মিস্টার মার্শালি, এখানে আসার সময় ওই সমুদ্রেও আমরা হাঙরের পাখনা দেখেছি। ভয় নেই বলবেন না।"

কথাটাকে সমর্থন করল অর্জুন, "হ্যাঁ। একটা হাঙরকে জলে যেতে দেখেছি। তবে সেটা এইটে কি না জানি না।"

মার্শালিসাহেব চিন্তিত হলেন, "এখানে এখন একটাই হাঙর ঘুরছে। তবে ও এখনও পর্যন্ত কোনও নৌকো অথবা লঞ্চ আক্রমণ করেনি। আমাকে যেতেই হবে।"

মার্শালি বোধহয় তার আয়োজন করতেই বেরিয়ে গেলেন। মেজরের গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছে। ব্রাউন এগিয়ে এসে তাতে আবার খানিকটা ঢেলে দিল। অর্জুন আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেজর তাকে বাঁ হাত তুলে থামালেন, "আই নিড ইট। একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলাম। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর। ব্রাউন, তুমি যদি জন্তুটাকে দেখতে।"

"আমি দেখতে চাই না। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তোমরা দেখেছ। নইলে এই ব্রান্ডি কপালে জুটত না। কিন্তু আমি এখানে আর থাকতে চাই না। তোমরা কেউ বলতে পারো হাঙররা বালির ওপরে উঠে আসতে পারে কি না?"

ব্রাউনের কথা এর মধ্যেই সামান্য জড়িয়েছে। হঠাৎ মেজর বললেন, "সত্যি, আমাদের আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। ওই দানবটার

সঙ্গে লড়াই করার কোনও ক্ষমতাই আমাদের নেই। আর একটু ব্রান্ডি!"

ব্রাউনের দিকে গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরলেন মেজর। অর্জুন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

বালিতে একা অন্যমনস্ক অর্জুন হাঁটছিল। দেখল মার্শাল ফিরে আসছেন। মুখোমুখি হতেই মার্শাল বললেন, "গত রাত্রে কেউ আমাদের এক পাহারাদারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে। বেচারা এখনও কথা বলতে পারছে না। ওকে নিয়ে বন্দরে যাচ্ছি। একইসঙ্গে জলে আর ডাঙায় আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে দেখছি।" হনহনিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেলেন মার্শাল।

অর্থাৎ কেউ তাদের কাল রাত্রে বাইরে যাওয়ার কথা ফাঁস করেনি। কিন্তু অর্জুনের খুব খারাপ লাগছিল। কে এত জোরে মেরেছে? লোকটা এমন অসুস্থ হোক তা তো সে চায়নি। কিন্তু অবস্থা এমন যে, এ-ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। মার্শাল এটাকে ডাঙায় বাইরের আক্রমণ বলে ভাবছেন! হঠাৎ অর্জুনের মাথায় অন্য চিন্তা এল। এই দ্বীপের উলটো দিকে যারা দিনে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে কুকুর নিয়ে পাহারা দেয়, দাঁড়টানা নৌকোয় স্বচ্ছন্দে সমুদ্রে ঘোরাফেরা করে, তারা কী করে হাঙরের উৎপাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে? যেখানে দানবটা মার্শালের মুক্তোর খাঁচা তছনছ করছে সেখানে ওরা স্বচ্ছন্দে দাঁড় বাইছে? হাঙরটার সঙ্গে এমন সমঝোতা হল কী করে?

সে দৌড়ে মার্শালের তাঁবুতে ফিরে এল। মেজর তখন তুরীয় মার্গে বিচরণ করছেন। নেশা হয়েছে ব্রাউনেরও। পোশাক বদলে এসে মার্শাল বললেন, "আমার অভিযাত্রী-বন্ধুকে বলো সন্ধের মধ্যেই আমি ফিরে আসব।"

মেজর মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, "কী, আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে? বেশ, আই উইল নেভার গো ব্যাক। আমি হাঙরটাকে মারব। হাঙর দেখানো হচ্ছে আমাকে!"

মার্শাল কাঁধ ঝাঁকালেন। টেবিল থেকে একটা ব্যাগ তুলে নিলেন, "ব্রাউনকে নিয়ে তুমি তোমার তাঁবুতে ফিরে যাও। মেজর এখানেই থাকুক।"

"যাচ্ছি। কিন্তু মিস্টার মার্শাল, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।" অর্জুন অত্যন্ত নম্র গলায় বলল।

মার্শাল ঘুরে দাঁড়ালেন, "বলো।"

"তার আগে বলুন, যারা আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে শাসাত তারা এখন আর কিছু বলছে না?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"না। হঠাৎই তারা চুপ করে গিয়েছে। বোধ হয় জেনে গেছে হাঙরটার কথা। ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এক শত্রুর হাতে ছেড়ে

দিয়েছে আমাকে।"

"দ্বীপের উলটো দিকটায় যান না কেন আপনারা?"

"আমি শুধু এই দিকটায় কাজ করব বলে সরকারের অনুমতি নিয়েছি।"

"আপনি যদি আমাকে ওইদিকে যাওয়ার অনুমতি দেন তা হলে হয়তো আমি কোনও সূত্র খুঁজে পেতে পারি।" অর্জুন উৎসুক চোখে তাকাল।

"হাঙর যে উভচর জন্তু তা ওরা বলতে পারে, কারণ নেশা করেছে। তুমি বলছ কী করে? ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করো, আমি প্রহরীদের বলে দিচ্ছি।" হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন মার্শালি।

অর্জুন এখন অত্যন্ত উল্লসিত। তার মন বলছে দিনের আলোয় দ্বীপের উলটো দিকে সে কোনও সূত্র খুঁজে পাবেই।

বুনোগাছে লতা ঝুলছে। ঝোপঝাড় দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে। মাঝে-মাঝে খানিকটা জায়গায় বালির ঢিপি আর সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে এলোমেলো হাওয়া ছাড়া দ্বীপটার কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। অর্জুন সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। মার্শালিসাহেবের এলাকা সে ছাড়িয়ে এসে একটা ঝাপড়া গাছের তলায় এখন দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই সমুদ্র। শান্ত, চুপচাপ। অথচ এই জলের গভীরে সেই দানব-হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, দানবটা মার্শালি সাহেব ছাড়া আর কারও ক্ষতি করছে না। কেন? ওর সমস্ত রাগ কি কেবল ঝিনুক-চাষির বিরুদ্ধে? ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। হাঙরটাকে দেখলে বেশ খুনে বলেই মনে হয়। যারা নৌকোয় সমুদ্রে ঘোরে তাদের ছেড়ে দেবার পাত্র ও নয়। অথচ তাই ঘটছে। নাকি জলের ওপরে যারা থাকে তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না দানবটা? হাঙরের চরিত্র নিয়ে সে কখনও পড়াশুনো করেনি, অতএব মাথা ঘামিয়ে কোনও ফল হবে না।

গত রাত্রে তারা এই পথ দিয়েই এসেছিল। অর্জুন সতর্ক পায়ে এগোল। বালিতে জুতোর ছাপ পড়ছে। পথ চিনে ফিরতে অসুবিধে হবে না যদি হাওয়ায় দাগ না মুছে যায়। গতরাত্রে ব্রাউন যে গাছে আশ্রয় নিয়েছিল সেটাকে দেখতে পেল সে। ব্রাউনের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে এখানেই তাকে মারার জন্যে গুলি ছুঁড়েছিল কেউ। অর্জুন মাটিতে বসে পড়ল। চারপাশে সতর্ক চোখে তাকাল। কোনও সন্দেহজনক উপস্থিতি চোখে পড়ছে না। কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না তাও বুঝতে পারছে না। সে মাথা নিচু করে হেঁটে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মিনিট-তিনেক সেখানে অপেক্ষা করার পর বুঝতে পারল ধারেকাছে কেউ নেই। অতএব তাকে যেতে হবে সেই খাঁড়ির দিকে যেখানে গতরাত্রে গিয়েছিল।

ঝোপঝাড় আড়ালে রেখে এগোতে অর্জুনের সময় লাগল।

মাঝে-মাঝে যখন ন্যাড়া বালি আসছিল তখনই বিপত্তিতে পড়ছিল সে। অনেক সময় নিয়ে চারপাশ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে সে দ্রুত খোলা জায়গাটা পার হচ্ছিল। এখন সমুদ্রের গর্জন আরও বেড়েছে। হাওয়াতেও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। হঠাৎ অর্জুন স্থির হয়ে গেল। তার চোখ লোকটার পিঠে অটকে গেল। দ্বীপের দিকে পেছন ফিরে লোকটা সিগারেট খাচ্ছে একমনে। সে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। ওপাশে যেতে হলে ওই লোকটাকে না ডিঙিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এবং তারপরেই লোকটার কোলের ওপর রাখা মেশিনগানের মুখ চোখে পড়ল তার। ঝোপের মধ্যে মেশিনগান নিয়ে যে বসে থাকে, সে কখনও মিত্র হতে পারে না। পাহারাদারির কাজে যখন মেশিনগান লাগছে তখন প্রতিপক্ষ নিজেদের কাজটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। অর্জুন দেখল লোকটা সিগারেটে শেষ টান দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর মেশিনগান নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ শক্ত চেহারা। দেখলেই মনে হয় পুলিশ কিংবা মিলিটারিতে চাকরি করত নির্ঘাত। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে দেখল। অর্জুন বসে আছে ঠিক হাত-দশেক দূরে। তার সামনে ঝোপের আড়াল। নিচু হয়ে এগিয়ে না এলে দেখার সম্ভাবনা কম। এবং এখন মোটেই নড়াচড়া করা চলবে না। লোকটা মেশিনগানের স্ট্র্যাপ কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। এবং তখনই অর্জুন ঠিক পায়ের পাশে সরসর আওয়াজ শুনতে পেল। মুখ ঘুরিয়ে বালির দিকে তাকাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল। চোখ বিস্ফারিত এবং প্রতিটি নার্ভ আচমকা অবশ হয়ে গেল। পায়ের ঠিক এক হাত দূরে বালিতে গর্ত ছিল। সেই গর্ত থেকে সরসর করে কুৎসিত চেহারার সাপ বেরিয়ে আসছে। সাপটা অর্ধেক শরীর বের করে তাকে দেখতে পেয়ে একটু স্থির হল। অর্জুনের চোখ থেকে চোখ সরাল না কিছুক্ষণ। খুব ছিপছিপে আর সর্বাঙ্গে কালচে চাকা দাগের সাপটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে শরীরটাকে টেনে বের করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

অর্জুনের ধাতস্থ হতে সময় লাগল। এরকম সাপ সে কখনও দ্যাখেনি। চেহারা দেখে বিষধর কি না বোঝা মুশকিল। কিন্তু অর্ধেক বেরনো অবস্থায় সাপটা যদি ওকে কামড়াত তা হলে হয়তো ভয়েই মরে যেত। এই ঠাণ্ডাতেও শরীর ঘামে নেয়ে উঠেছিল। স্নায়ু অবশ হয়ে আসতে ঠাণ্ডা বাতাসে শীতভাবটা ফিরে এল দ্বিগুণ হয়ে। পরিত্যক্ত গর্তটা দেখল সে। ওর কোনও সঙ্গী যদি ভেতরে থাকে এবং এখন তার বেরনোর সময় হয়ে পড়ে তা হলে সে অর্জুনকে দয়া দেখাবেই এমন কোনও কথা নেই। সাপের গর্তের পাশ থেকে সরে যাওয়া দরকার। অর্জুন সামনের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেল। লোকটা অনেকটা এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসেছে। বসে মেশিনগানটিকে আকাশের দিকে উঁচিয়ে উড়ন্ত সি-গালকে

টিপ করছে। একঘেয়েমিতে ভুগলে মানুষ কত কী না করে! লোকটা টিপ করছে, কিন্তু গুলি ছুঁড়ছে না। অর্জুন অতি সন্তর্পণে ডান দিকে সরে যেতে লাগল। তারপরে আব-একটা ঝোপের আশ্রয় নিতেই সে সাপটাকে দেখতে পেল। শরীর বেঁকিয়ে সেটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। এবং একসময় খোলা জমিতে লোকটার সামনে গিয়ে পড়ে থমকে দাঁড়াল সাপটা। লোকটা তখনও আকাশে নজর করছে। ওকে সতর্ক করা দরকার। হাজার হোক, একটা মানুষ অজান্তে সাপের কামড়ে মারা যাবে এটা কাম্য নয়। এইরকম ভাবতে-না-ভাবতেই অর্জুন অভাবনীয় দৃশ্যটি দেখল। আচমকা লেজের ডগায় শরীরের ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল সাপটা। প্রায় এক মানুষ লম্বা হয়ে বিশাল ফণা ছড়িয়ে নিয়ে হিসহিস শব্দ করে দুলতে লাগল। সেই শব্দেই সম্ভবত লোকটা চোখ নামাল। এবং সাপটা যখন ছোবল মারার জন্যে মুখ নামাচ্ছে তখনই সে ট্রিগার টিপল। ফটাফট-ফটাফট গুলির আওয়াজে নির্জন দ্বীপটার নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল। আর সাপটা ছিটকে পড়ল একপাশে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল লোকটা। ওই মুখে এখনও রক্ত নেই। কিন্তু সাপটাকে দেখামাত্র যেভাবে সে ট্রিগার টিপেছে তাতে গুলি চালানোর ব্যাপারে খুব প্রফেশনাল বলে মনে হল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে সাপটাকে লাথি মারতেই সেটা চিত হয়ে গেল। মেশিনগানের নল দিয়ে সাপটাকে টেনে তুলে লোকটা ডান দিকে হাঁটতে লাগল। অর্জুন চটপট ওকে অনুসরণ করছে। যে ভঙ্গিতে বাঘ মারার পর শিকারি শিকারের সামনে দাঁড়িয়ে ফোটো তোলে প্রায় সেই ভঙ্গিতেই লোকটা সাপটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁটছিল। ফলে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না তা দেখার মতো হুঁশ তাব ছিল না। মিনিট-তিনেক হাঁটার পর লোকটাকে শিস দিতে শুনল। এবং তখনই ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, "কী হয়েছে? গুলি চালালে কেন?"

অর্জুন দেখল লোকটা নীচে নেমে যাচ্ছে। একেবারে শেষ আড়ালের আশ্রয় নিয়ে অর্জুন খাঁড়িটাকে দেখতে পেল। খাঁড়ির ভেতর নামতে-নামতে লোকটা জবাব দিল, "খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। দ্যাখো এটাকে।" মেশিনগান নেড়ে সে মরা সাপ ছুঁড়ে ফেলল। লাফিয়ে সরিয়ে নিল প্রশ্নকারী নিজেকে। তারপর সাপটাকে দেখে বলল, "ইউ আর লাকি, বাডি।"

"ওখানে নিশ্চয়ই ওর জোড়া আছে।"

"তা থাকুক, কিন্তু বস্ খুব রেগে গিয়েছে ফায়ারিং-এর জন্যে। শব্দ করতে নিষেধ করেছিল।"

"আই উইল ফেস হিম। নাউ, ইট'স ইওর টার্ন। আমার ডিউটি আওয়ার্স শেষ।" লোকটা এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়জনকে মেশিনগান দিল।

তারপর কোনও কথা না বলে খাঁড়ির ভেতর গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটি ঝুঁকে আর একবার সাপটাকে দেখল। মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তারপর হেলতে-দুলতে অর্জুনকে বাঁ দিকে রেখে মিলিয়ে গেল লোকটা জঙ্গলের ভেতরে। এখন কী করা যায়? খাঁড়ির মধ্যে ঢুকলে লুকোবার কোনও জায়গা থাকবে না। সাধ করে ধরা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। অর্জুন কাছাকাছি একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখে উঠে বসল তাতে। যতটা সম্ভব উঁচুতে উঠে দুই ডালের জোড়ে শরীর রেখে দুপাশে পা ঝুলিয়ে দিল। ওপাশের একটা ডালকে টেনে এমনভাবে নীচে নামিয়ে আনল যাতে মাটি থেকে মুখ তুলে কেউ তাকে দেখতে না পায়। এবার সামনের পাতাগুলো সুবিধেমতো সরিয়ে নিল সে। খাঁড়ির মুখ এবং জল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এইভাবে বসে সারাদিন থাকলেও কোনও অসুবিধে হবে না।

এখন দুপুর বারোটা। ব্রাউনের উপদেশমতো বেশ কয়েকটা চিজের টুকরো নিয়ে এসেছিল পকেটে করে। তারই একটা মুখে দিল। সমুদ্র এখন সামনে। সাপটা কি সমুদ্রে যাচ্ছিল? গর্ত থেকে বেরোবার সময় যদি ফণা তুলত, তা হলে তার এ-জীবনে জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া ঘুচে যেত। সাপগুলো কেমন লেজের ওপর দাঁড়ায়! একটু সচকিত হয়ে গাছটাকে দেখল। সাপ তো গাছেও ওঠে। দ্বিতীয়বার যে ভাগ্য তার ওপর সদয় হবে এমন আশা করা উচিত নয়।

পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ, অর্জুন দিক চিনতে পারল। তার সামনের সমুদ্রই উত্তর দিকের। ছোট-ছোট ঢেউ। এখান থেকে যদি কেউ দাঁড়টানা নৌকোয় সোজা যাওয়া শুরু করে তা হলে কি সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে মে মাসে সূর্য ঠিক মাথাব ওপরে আসে বেলা সাড়ে বারোটায়। মে মাসেব সময় পাওয়া গেলে আগুপিছু মাসগুলোর হিসেব বের করে নেওয়া অসুবিধের কিছু নেই। লকারে পাওয়া লেখাটার সূত্র যাই থাক না কেন সেটা যে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করতে হবে তার প্রমাণ তো এখনও পাওয়া যায়নি। অমল সোম থাকলে মাথা নাড়তেন, "সত্যসন্ধানী না হয়ে ফুটপাতে খাঁচায় পাখি নিয়ে গিয়ে বসো। পৃথিবীতে যেন আর সমুদ্র নেই, আর তাতে উত্তর দিক বলে কিছু নেই। তোমার যে জায়গাটা ইচ্ছে হল সেটাই সঠিক জায়গা? প্রমাণ নেবে না?"

মনে-মনে একটা প্রমাণ মাথা চাড়া দিচ্ছে। মার্শালসাহেব এসেছেন মুক্তো নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু এই গুণ্ডাবাহিনী এসেছে কী উদ্দেশ্যে! অথচ এক দ্বীপে থেকেও পরস্পর সরাসরি সংঘর্ষে যাচ্ছে না। যেভাবে এরা নিজেদের গোপন করে রাখছে, তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, এদের কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্য রয়েছে, যার গুরুত্ব কম নয়। সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে লোকগুলো খামোখা এখানে এসে লুকিয়ে থাকবে কেন? অর্জুন

যখন এইসব ভাবছিল, তখন খাঁড়ির ভেতর থেকে কয়েকজন লোক উত্তেজিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল। প্রথম লোকটাকে চিনতে পারল অর্জুন। ওকে সাপটা আর একটু হলেই ছোবল মারত। উত্তেজনা ওরই বেশি। দ্বিতীয়, তৃতীয় লোকটির সঙ্গেও অস্ত্র রয়েছে। চতুর্থ লোকটিকে দেখে চমকে উঠল সে। ব্ল্যাকপুলে প্রোফেসরের সঙ্গে যে শক্তিশালী লোকটিকে সে দেখেছিল, মোটেলে যাওয়ার আগে সুপার মার্কেট থেকে প্রোফেসরের সঙ্গে বের হতে যাকে দেখেছিল, সেই লোকটি গম্ভীরভাবে এদের অনুসরণ করছে। উত্তেজির প্রহরী খানিক হেঁটে হাত বাড়িয়ে সাপটাকে দেখাল। অর্জুন বুঝল গুলি ছোঁড়ার ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে। স্বাস্থ্যবান লোকটা দু'হাতে বুকে ভাঁজ করে সাপটাকে দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ে ওটার লেজ ধরে টেনে তুলে আবার খাঁড়ির ভেতরে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। বাকি দলটি এবার ওকে অনুসরণ করল। প্রহরীটিকে এখন বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

অর্জুনের মনে পড়ল প্রোফেসর হ্যাচের জিপে একটা ঝুড়ির মধ্যে সাপ ছিল। সাপ পোষার বাতিক আছে লোকটার। বালির গর্ত থেকে উঠে-আসা সাপ নিশ্চয়ই প্রোফেসরের পোষা নয়। প্রোফেসর তাঁর সঙ্গী নিয়ে এই দ্বীপে এসেছেন। এখন তো পরিষ্কার যে, হাইওয়ের ডিপার্টমেণ্টাল শপের সেকেন্ডহ্যান্ড কাউন্টারে পুরনো জুতো কেনার চেষ্টা থেকে পর পর ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে প্রোফেসরের উদ্দেশ্য কী! এত জায়গা থাকতে প্রোফেসর যখন এই দ্বীপকে বেছে নিয়েছেন, তখন লকারের কাগজের লেখাটাকে এখান থেকেই প্রয়োগ করা উচিত। অন্তত প্রোফেসর হ্যাচের উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। তারপরেই মনে হল প্রোফেসর কী করে জানবেন লকারের কাগজের সাঙ্কেতিক শব্দাবলীর কথা! জুতোর পকেটে কাগজ দেখে পোড়ো বাড়ির গাছের কোটর থেকে লকারের চাবি সংগ্রহ করে ব্যাঙ্ক থেকে লকার খুলিয়ে অর্জুনরা সাঙ্কেতিক তথ্য সংগ্রহ করেছে। এগুলোর কোনওটাই প্রোফেসর হ্যাচ পাননি, তা হলে তিনি এখানে কী করছেন। উদ্দেশ্য কি অন্য-কিছুর?

সারাটা দিন গাছের ওপর কাটল অর্জুনের। এর মধ্যে একবার মাত্র প্রহরী পালটেছে। বিকেল নাগাদ একটা দাঁড়টানা নৌকো ফিরে এল সমুদ্র থেকে। তাতে দু'জন দাঁড়ে রয়েছে, একজন মাঝখানে পায়ের ওপর পা তুলে বসে। সমুদ্র থেকে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে গেল সেটা। লোকটাকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না অর্জুনের। প্রোফেসর হ্যাচ। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। যদি কোনও উপায় থাকত তা হলে অর্জুন খাঁড়ির ভেতরে ঢুকত। কিন্তু সে সাহস পাচ্ছিল না। অমল সোম বলতেন, পরিণতি জেনেও দুঃসাহস দেখায় নির্বোধরা।

সন্ধে হওয়ার আগে গাছ থেকে নামবে না বলে ঠিক করেছিল অর্জুন।

দিনের আলোয় অযথা ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। আকাশে এখন মেঘ জমছে। বৃষ্টি নামলে নিউমোনিয়া হবেই। কী করা যায় ঠাওর করতে পারছিল না সে। হঠাৎ একটা অতি চিৎকারে সে প্রবলভাবে নাড়া খেল। শব্দটা আসছে খাঁড়ির ভেতর থেকে। কারও ওপর সাঙ্ঘাতিক অত্যাচার না করলে এই ধরনের আর্তনাদ করা সম্ভব নয়। বাইরের লোক তো কেউ ওখানে ঢোকেনি। অর্জুন আর্তনাদের মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। কয়েকবার হয়ে সেটা থেমে গেল। প্রোফেসর হ্যাচের ফেরার পর যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন তিনি কাউকে শাস্তি দিলেন। এই সময় প্রথম প্রহরী টলতে-টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। তার কপালের কিছুটা তখনও রক্তাক্ত। দাঁড়াতেও পারছে না সঠিকভাবে। আর ওর পেছনে সেই বলবান লোকটি।

ধমকের গলায় সে হুকুম করল, "যাও। ওকে চলে আসতে বলো। রাত দুটো পর্যন্ত তুমি আবার ডিউটি করবে। তোমার ভাগ্য ভাল যে, প্রোফেসর আজ অল্পের ওপর ছেড়ে দিলেন।"

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল, "কিন্তু আমি গুলি না করলে সাপটাই আমাকে যে খতম করত।"

"করলে করত। তুমি নিজেকে অন্যভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করোনি কেন? সাপ প্রোফেসরের প্রিয় জীব। সাপ মেরে তুমি তাঁর কাছ থেকে বাহবা পেতে পারো না। চোদ্দ পুরুষকে ধন্যবাদ দাও এখনও বেঁচে আছ বলে। গো। কুইক।" আহত প্রহরী হড়বড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে বলবান মানুষটি ফিরে গেল। আরও মিনিট-তিনেক পরে দ্বিতীয় প্রহরীটি খালি হাতে ফিরে এল। অর্জুন পাথরের মতো বসে ছিল গাছের ডালে। সাপকে মেরে ফেলার জন্যে প্রোফেসর হ্যাচ নিজের দলের লোককে এমন শাস্তি দিলেন? মানুষের প্রাণ ওঁর কাছে সাপের চেয়ে মূল্যহীন। এই মানুষ তো যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু কুকুরটা কোথায়? এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে অথচ কুকুরটার ডাক একবারও কানে আসেনি।

অর্জুন ধীরে-ধীরে গাছ থেকে নামল। এখন অন্ধকার নেমে আসছে। যেভাবে এসেছিল ঠিক সেইভাবে সে ফিরে যাচ্ছিল। সমুদ্রের ধারের ঝোপগুলোকে আড়াল করে সে হাঁটছিল। হঠাৎ খাঁড়ির মুখে একটা তীব্র আলোড়ন হল। যেন জলের তলায় বিরাট কিছু নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর সেটা জলের আড়ালে থেকেই সমুদ্রের জলে মিলিয়ে গেল। প্রায় মিনিট-তিনেক বাদে অর্জুন প্রহরীটিকে দেখতে পেল। আবছা অন্ধকারে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। মেশিনগান কোলের ওপর রাখা। লোকটাকে খুবই কাহিল দেখাচ্ছিল। নিঃশব্দে ওর পেছন ঘুরে জায়গাটা পেরিয়ে এল অর্জুন। সারাদিন গাছের ওপর বসে থাকার জন্য

এখন খুব কাহিল লাগছে। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।

মার্শালসাহেবের অনুরোধে গতকাল জল-পুলিশ এ-তল্লাট চষে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও হাঙর তো দূরের কথা, ভয়ঙ্কর কোনও জলজন্তুর সন্ধান পায়নি। মার্শালের তাই মন খারাপ। পুলিশ-সুপার তাকে অনুযোগ করে গেছেন এমন বেহিসাবী অভিযোগ করার জন্যে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথাটা পরিষ্কার হল অর্জুনের। চা খাওয়ার পর বিছানায় ফিরে এল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে পুরো ব্যাপারটা যখন ভাবতে চেষ্টা করছে, তখনই ব্রাউন এল, "কাল তো আমি ভাবলাম তোমার ডেড বডি খুঁজতে বের হতে হবে। আচ্ছা ব্যাপারটা কী বলো তো ? রহস্যটা খুব দানা বেঁধেছে অথচ কূল পাচ্ছি না। তুমি যাদের দেখতে গিয়েছিলে তারা কে ?"

"খুব নিষ্ঠুর লোক। সাপ মারলে মানুষকে শাস্তি দেয়।"

"সে কী ! এত সাপের বন্ধু ! তোমাকে মেজর একবার তাঁবুতে ডাকছেন।"

"কেন ?"

"আরে কাল সন্ধে হয়ে গেলেও তুমি ফিরছ না দেখে সব কথা ওদের বলতে বাধ্য হলাম। হাজার হোক তোমার জন্যেই কয়েকদিন ভালমন্দ খেতে পাচ্ছি। তোমার কোনও খারাপ হোক এ তো আমি চাইতে পারি না। ধর্মে সইবে না।" ব্রাউন বলল।

"মিস্টার মার্শালকেও আপনি পরশু রাতের কথা বলেছেন ?"

"কী করব ! আমি যখন মেজরকে বলছিলাম তখন মার্শাল সেখানে ছিল তো। তা ছাড়া ওরই তো আগে শোনা উচিত। আমরা তো ওরই অতিথি। লোকটার মন খুব খারাপ। পুলিশ হাঙরটাকে কোথাও খুঁজে পেল না। এমন ট্রেইন্ড হাঙর আছে বলে কখনও শুনিনি।"

ব্রাউনের কথা শেষ হওয়া মাত্র অর্জুন উঠে বসল। যে চিন্তাটা মাথায় পাক খাচ্ছিল অথচ স্পষ্ট হচ্ছিল না, ব্রাউন তা নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছে। ট্রেইন্ড হাঙর। যে লোক সাপ পুষতে পারে সে তো হাঙরকেও পোষ মানাতে পারে। কাল সন্ধেবেলায় জলের তলায় তোলপাড় করে খাঁড়ি থেকে হাঙরটা বেরিয়ে যায়নি তো। আর খাঁড়ির ভেতরে লুকিয়ে ছিল বলেই জলপুলিশ সমুদ্রে ওকে খুঁজে পায়নি। উত্তেজিত হয়ে অর্জুন হাত বাড়িয়ে দিল, "থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার ব্রাউন। আপনি অনেক করলেন !"

হতভম্ব ব্রাউন হাত স্পর্শ করল, "আমি আবার কী করলাম ?"

জবাব না দিয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। মেজর আর মার্শাল ওঁদের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। মেজর অর্জুনকে দেখে বললেন, "গতকাল তুমি খুব টায়ার্ড ছিলে বলে আর প্রসঙ্গ তুলিনি। কিন্তু অর্জুন, আমাকে না জানিয়ে তুমি অ্যাডভেঞ্চার করছ এটা ওই আরশোলার কাছ

থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে হল আমায় ?”

“অ্যাডভেঞ্চার নয়, বিপদ আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এখানে এসেছে। আপনাদের জানানোর আগে নিজে নিঃসন্দেহ হতে চাইছিলাম।” অর্জুন বলল।

“বিপদ ? এখানে আবার কিসের বিপদ ?” মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন।

“মিস্টার মার্শালি, এখানে আপনি কতদিন আছেন ?”

“বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল।”

“দ্বীপের ওপাশে যারা আছে তাদের সম্পর্কে আপনি নিরাসক্ত কেন ?”

“আমার কী প্রয়োজন ! আমি আমার কাজ করছি। ওরা সেই কাজে যতক্ষণ নাক না গলাচ্ছে, ততক্ষণ ওদের নিয়ে ভাবার কী আছে ?”

“আপনি প্রোফেসর হ্যাচ নামের কাউকে চেনেন ?”

মার্শালির কপালে একটু ভাঁজ ফুটল। তারপর মাথা নেড়ে হাসলেন, “না। অবশ্য পুরো নাম বললে সুবিধে হত। হ্যাচ নামে দু'জনকে চিনি। একজনের অভিযাত্রী হবার খুব শখ ছিল। সেটা অনেকদিন আগের কথা। আর-এক হ্যাচ বিমা কোম্পানির দালালি করে। কেন বলো তো ?”

“না। কিছু নয়। আমি প্রোফেসর হ্যাচ নামের কাউকে খুঁজছি যিনি সাপ ভালোবাসেন, আবার হাঙরও ভালোবাসেন বলে মনে হচ্ছে।” অর্জুন যেন নিজের মনে বলল।

মার্শালি কাঁধ নাচালেন।

মেজর বললেন, “মার্শালি এখান থেকে ফিরে যাবে ঠিক করেছে। ওর সমস্ত কাজ ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমরা আজই এখান থেকে ফিরব।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না। মার্শালিসাহেব যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি আরও দিন-তিনেক এখানে থাকতে চাই।”

অর্জুনের কথা শুনে মার্শালির চোখ ছোট হল, “তোমার উদ্দেশ্যটা কী ? কেন এখানে থাকতে চাইছ ?”

অর্জুন হাসল, “একজন সত্যসন্ধানী হিসেবে আমি সত্যের স্বরূপ দেখতে চাই।”

মার্শালি জিজ্ঞেস করলেন, “তার মানে ? এখানে অসত্য কোথায় ? আমার এতদিনের পরিশ্রম একটা হাঙর নষ্ট করে দিল। আমাকে বাধ্য করছে গবেষণা গুটিয়ে নিতে। জল-পুলিশকে জানিয়ে বেইজ্জত হলাম। এসব কি মিথ্যে ?”

“না। আমি আপনার ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি না।”

“তা হলে ?”

“রহস্য নিশ্চয়ই আছে। আর সেটা আগে থেকে প্রকাশ করতে বলবেন না দয়া করে।”

এইসময় পেছনে দাঁড়ানো ব্রাউন বলে উঠল, "রহস্যের গন্ধ না পেলে কে আসত এখানে ?"

"চোপ !" মেজর এবার বিরাট ধমক দিলেন, "তোমার জন্যেই ছেলেটা বিপদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। দ্বীপের ওপাশে হনুমানের মতো গাছের ওপর লেজ গুটিয়ে বসতে বলেছিল কে ? গুলিটা গাছে না বিধে মাথায় ঢুকলে খুনী হতাম আমি।"

"কী, আমাকে হনুমান বলা হচ্ছে ? মুখে যা আসছে তাই বলা ? আমি হনুমান হলে তুমিও তো তাই। যত্তসব বদমাশদের সঙ্গে সময় কাটাতে হচ্ছে আমাকে," ব্রাউন বলল।

অর্জুন মার্শালকে বলল, "তিনদিন থাকতে দিন আমাদের। তিনদিন বাদে না-হয় ফিরে যাবেন। এই দ্বীপের ও প্রান্তে প্রোফেসর হ্যাচ কেন ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন, সেই সত্যটি আমায় উদঘাটিত করতে হবে। একটা লোক দলবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়ির মধ্যে খামোখা থাকতে পারে না। তার ওপর লোকটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির।"

মেজর বললেন, "লেটস্ গো। চলো, আমরা দলবেঁধে গিয়ে লোকটাকে ওর ধান্দার কথা জিজ্ঞেস করি। মার্শালের মন ভেঙে গেছে। এখন আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না।"

মার্শাল মাথা নাড়লেন, "না। ওদিকে যাওয়া চলবে না। তোমাদের কথাটা বলিনি। কিছুদিন আগে সরকারি দফতর থেকে আমায় জানানো হয়েছিল, একজন অধ্যাপক দ্বীপের উলটো দিকে সমুদ্রের জল নিয়ে গবেষণা করবেন। তিনি সেটা নির্বিঘ্নে করতে চান। আমি বা আমার কেউ তার এলাকায় যেন প্রবেশ না করি, কারণ তিনি সেটা পছন্দ করছেন না। আর আমার গবেষণার কাজেও তিনি ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। এই অবস্থায় আমি ওদিকে যেতে পারি না।"

শেষ পর্যন্ত মার্শাল স্থির করলেন, অর্জুনের কথামতো আরও তিনদিন এখানে কাটিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এখন ঘড়িতে ন'টা পনেরো। সে মার্শালকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার একটা দাঁড়-টানা নৌকো আমি ধার নিতে পারি ?"

মার্শাল বললেন, "স্বচ্ছন্দে। কিন্তু হাঙরটার কথা ভুলে যেও না।"

দশটা নাগাদ অর্জুন রওনা হল। ব্রাউন দু'হাত নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল। তার জীবনের দাম আছে। যেখানে হাঙরটা হাঁ করে আছে সেখানে যেচে সে তার মুখের ভেতর ঢুকতে চায় না। আর ব্রাউনের বক্তব্যই যেন মেজরকে উদ্বুদ্ধ করল অর্জুনের সঙ্গী হতে। নৌকোটা মাঝারি। মেজর আর অর্জুন দু'পাশে বসে দাঁড় টানছিল। কাজটা অর্জুন এই প্রথম করছে না। জলপাইগুড়ির করলা নদীতেও সে এর আগে নৌকো বেয়েছে। দিনবাজারের পুলের নীচ থেকে কিড সাহেবের ঘাট

পর্যন্ত। কিন্তু এটা সমুদ্র এবং তলায় একটা দানব হাঙর রয়েছে। বুকের ভেতর শিরশিরে ভয় মুখ গুঁজেই ছিল। ঠোঁটে চুরুট চেপে দু'হাতে দাঁড় টানছিলেন মেজর। সেই অবস্থায় বললেন, "চেহারা একরকম হতেই পারে, কিন্তু অভ্যাস, সাহস ওই ছুঁচোটা পাবে কোত্থেকে ? নৌকো চালানো আমার কাছে কিছু নয়। একবার ব্ল্যাক সি'তে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা নৌকো বেয়েছি। কিন্তু এবার বলো তো হে, আমরা যাচ্ছি কোথায় ?"

"আপনি একদম ভুলে গিয়েছেন। উত্তর দিকে একঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড়-টানা নৌকোর। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর ! মে মাসে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে আসবে সাড়ে বারোটায়।"

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ওই প্রোফেসর হ্যাচটা কি আমাদের বোল্টন থেকে ফলো করে আসছিল ?"

"ব্ল্যাকপুলের পরে আর করেননি।"

"কিন্তু এটাই যে সেই সমুদ্র তা কী করে জানলে ?"

"নিশ্চিত নই। তবে লক্ষণ দেখে অনুমান হচ্ছে মাত্র।"

"আমরা কি উত্তর দিকে যাচ্ছি ?"

"হ্যাঁ। এবং এখনও কোনও হাঙর দেখিনি।"

"ইয়ে, মার্শালকে কি লকারের লেখাটার কথা বলব ? ও আমাদের হোস্ট।"

"দাঁড়ান। সময় হোক। নিশ্চয়ই বলা যাবে। আপনি ডান দিকে ঝুঁকে বসবেন না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আজকের আবহাওয়াটা কিন্তু চমৎকার," অর্জুন বলল।

মাঝখানে সরে এসে মেজর বললেন, "এখন কিন্তু মে মাস নয়।"

"তার জন্যে যোগ-বিয়োগের অঙ্কটা করতে হল। এবার বেশ বড়-বড় ঢেউ আসছে।"

"ঢেউয়ের বিরুদ্ধে শক্তি দেখাতে নেই। জাস্ট নৌকোটাকে সোজা রাখতে চেষ্টা করো।"

প্রতি মুহূর্তে অর্জুনের মনে হচ্ছিল, ডুবে যাবে। একদম না ভেবেচিন্তে আসা হয়েছে। নৌকোটা জলের ওপর উঠছে আবার ঢেউয়ের টানে নেমে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে শিরশিরে অনুভূতি। মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর মনে হল, সমুদ্র আবার শান্ত হল। কিন্তু ওই পাঁচ মিনিট যেন কাটতেই চাইছিল না।

ঘড়িতে যখন নৌকো বাওয়ার সময় এক ঘণ্টা পার হল, তখন অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য মাথার ওপরে মোটেই নেই। ওপাশের দ্বীপের গাছপালা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপাশে সমুদ্রের ওপরে যেন আকাশ খুব কাছাকাছি নেমে এসেছে। না। আরও যেতে হবে। এইবার মনে ভয় এল। হাঙরটা সামান্য ছুঁলেই দেখতে হবে না। হাঙরটা কি ওর

স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করবে ? জলের ওপরের কাউকেই তো আজ পর্যন্ত বিরক্ত করেনি। আর এমন হতে পারে, দানবটা এখন খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওকে ডিঙিয়ে যখন হ্যাচের নৌকো যাওয়া-আসা করে নির্বিঘ্নে, তখন নৌকোর ওপরে রাগ নেই বলেই ধরে নেওয়া যায়। হঠাৎ মেজর বললেন, "শাবাস বাঙালি !"

অবাক হয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তার মানে ?"

"এই বয়সের এক বাঙালি তরুণ ইংল্যান্ডের সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে, ভাবা যায় ?"

"আপনি তো বাঙালি, কত অ্যাডভেঞ্চার করেছেন জীবনে !"

"হ্যাঁ। কিন্তু জানো, দেশের মানুষ আজ পর্যন্ত কোনও স্বীকৃতি দিল না। বড় দুঃখ হয়।"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। বাবোটা বাজতে পনেরো। এখন দ্বীপটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। এত বড় সমুদ্রে আর কেউ নেই। সময় মিলিয়ে ও শেষ পর্যন্ত মেজরকে নৌকো থামাতে বলল। এখন মাথার ওপরে সূর্য। মাটি যতদূরে, ওপাশের আকাশ ঠিক ততদূরে। অবশ্য এতেই আনন্দিত হবার কিছু নেই। পৃথিবীর যে-কোনও সমুদ্রে গিয়ে এইরকম জায়গায় পৌঁছনো যায়। সে মেজরকে বলল, "আপনার তো সমুদ্রের অভিজ্ঞতা আছে। এই জায়গাটা দ্বিতীয়বার আসতে পারবেন ?"

"এই নৌকো বেয়ে ? কক্ষনো না।" মেজর ঘনঘন মাথা নাড়লেন।

"না, নৌকো বেয়ে নয়। ধরুন, লঞ্চেই এলাম। জায়গাটা চিনতে পারবেন তখন ?"

মেজর চারপাশে মুখ ফেরালেন। বিড়বিড় করে কী সব হিসেব করলেন। তারপর বললেন, "পারব। কোনও গোলমাল নেই।"

"তা হলে চলুন ফিরে যাই।"

"সে কী ! খুঁজবে না ?"

"ডুবুরির পোশাক আনিনি। আর সেটা করায় বেশ ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যেত।"

"তা হলে ফালতু আনলে কেন ?"

"জায়গাটাকে আবিষ্কার করতে। আবিষ্কার করে চিনে রাখতে। প্রোফেসর হ্যাচ শুধু এই জায়গাটাকে খুঁজে বের করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। এখানে আর বেশি সময় আমাদের থাকা উচিত হবে না। যদি কেউ দ্বীপ থেকে দূরবীনে আমাদের লক্ষ করে, তা হলে কিছু একটা আন্দাজ করতে পারবে।"

অর্জুনরা ফেরার সময় আবার ঢেউয়ের পাল্লায় পড়ল। দু'জনেই ভিজে একশা হয়ে গেল। কিন্তু সেই জলদানবটা তাদের নৌকো উলটে দিল না। ওরা স্বচ্ছন্দেই তীরে ফিরে আসতে পারল। ব্রাউন আর মার্শাল দাঁড়িয়ে

ছিলেন। ওরা নৌকো থেকে নামতেই মার্শাল জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের মতলব কী ছিল বলো তো? এত কষ্ট করে অত দূরে গেলে আর ফিরে এলে, যাওয়ার দরকারটা কী ছিল?"

ব্রাউন হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল, "কেমন শকুনভেজা ভিজেছে দ্যাখো।"

দাড়ি থেকে জল মুছছিলেন মেজর। থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভেজা? কাকভেজা বলে একটা কথা আছে জানতাম, শকুনভেজা জীবনে শুনিনি। দাঁড়াও, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।" মেজরের কথা শেষ হওয়া মাত্র ব্রাউন একেবারে পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করল। অর্জুন মেজরকে বাধা দিল, "ছেড়ে দিন তো। আপনার ওষুধের স্টকে এর কোনও প্রতিবিধান আছে?" নিজের হাতের চেটো দেখাল অর্জুন। সেখানে বড়-বড় ফোসকা মাথাচাড়া দিয়েছে সবে। মেজর হাসলেন, "আছে। একটু জ্বালাবে। নভিসদের হয়।"

"আপনার হাতে হয়নি?"

"দ্যাখো।" মেজর বীরত্বের ভঙ্গিতে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে চমকে উঠলেন, "সে কী!" তাঁর হাতেও ছোট-ছোট ফোসকা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেজর বললেন, "আসলে দাঁড়টাই খারাপ ছিল। তাঁবুতে চলো, ওষুধ লাগাই।"

মেজরকে অনুসরণ করার সময় অর্জুন এক চোখে মার্শালকে দেখল। কোনও মানুষের অমন সন্দেহজনক দৃষ্টি এর আগে সে কখনও দ্যাখেনি।

সারাটা দিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলেন মেজর আর পানীয় খেলেন। তাঁর গায়ে-হাতে নাকি বেদম ব্যথা। ব্যথার কারণেই ওই পানীয় দরকার। অনভ্যাসে অর্জুনেরও শরীরে ব্যথা হয়েছে। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর সে ওদিকের বালুতটেই ঘুরে বেড়াল। এখন প্রহরীরা আর তাকে বাধা দিচ্ছে না। কাজ বন্ধ করে ফিরে যাওয়ার হুকুম হওয়ায় তাদেরও কর্তব্য আর তেমন কঠোর নয়। ওপাশে, বন্দরের দিকে সমুদ্রে সারাদিন ছোট-ছোট নৌকো ভাসল। গরমের সময় ব্রিটিশরা নৌকো চড়তে খুব ভালবাসে। হাঙরটা জলের তলায় রয়েছে। জল-পুলিশ যাই বলুক, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করা যায় না। অথচ জলবিহার করছে যারা, তারা কোনও দুর্ঘটনায় পড়ছে না। হোক ওটা বন্দরসংলগ্ন সমুদ্র, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে তো হাঙরের সামনে কোনও বাধা ছিল না। এইটেই অর্জুনকে খুব ভাবাচ্ছিল। যে সাপকে পোষ মানাতে পারে সে কি হাঙরকেও পারে? পোষমানা হাঙরটা কি তাই খাঁড়ির মধ্যে থাকে? অর্জুনের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। এরকম ঘটনা কে কবে শুনেছে?

সন্ধের মুখে মার্শাল এলেন হন্তদন্ত হয়ে। অর্জুন তখন সমুদ্রের ধারে চুপচাপ বসে ছিল। এসে বললেন, "ভেবেছটা কী? অ্যাঁ?"

অর্জুন লোকটার পরিবর্তন দেখে একটু অবাক হল। মার্শাল বললেন, "এইমাত্র আমি আমার বন্ধুর কাছে শুনতে পেলাম, কেন তোমরা সকালে নৌকোয় বেরিয়েছিলে। মেজর আমার কাছে এসব চেপে গিয়েছিল। নেহাত চেপে ধরতেই সব বলে ফেলল। তোমরা আমার কাছে বেড়াতে আসোনি। তোমাদের মতলব ছিল অন্যরকম।"

মেজরের ওপর প্রচণ্ড রেগে গেল অর্জুন। পানীয় মানুষের সর্বনাশ করে এটাও আর-একটা প্রমাণ। ব্যাপারটা তিনি ব্রাউনকেও বলে বসতে পারেন। মার্শাল তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন, "বুঝতেই পারছ আমি খুব অপমানিত বোধ করছি। এই কারণেই তুমি আরও তিনদিন থেকে যেতে চাইছিলে? একা-একাই গুপ্তধন বের করতে পারবে? খুব সাহস তোমার, না?"

অর্জুন হাসবার চেষ্টা করল, "দেখুন, আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। মেজর আপনাকে যে কথাগুলো বলেছেন, তা নেশার ঘোরে বলেছেন। গুপ্তধনের একটা খবব আমরা পেয়েছি কিন্তু কোন সমুদ্রে সেই গুপ্তধন লুকনো রয়েছে, তা জানি না।"

"তুমি খুব চতুর। তুমি ইন্ডিয়ায় থাকো। যদি কিছু লুকোতে হয় সেটা ইন্ডিয়ায় না লুকিয়ে ইংল্যান্ডে লুকোতে আসবে। যিনি কাণ্ডটা করেছেন তিনি এই অঞ্চলের লোক। একসময় আমরা কত অভিযানে বেরিয়েছি। এই সমুদ্র ছাড়া অন্য কোথাও সে লুকোতে যাবে না।"

অর্জুনের মাথার ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেল যেন। সে হাসল, "ওঃ, খুব ভাল হল। আপনি যখন ওঁকে চিনতেন তখন খুব সুবিধে হবে যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি।"

একটু খুশি হলেন যেন মার্শাল, "চিনতাম মানে? ভাল করে চিনতাম। হ্যাঁ, আমিও শুনেছিলাম, সে কিছু দামি জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। রাখতেই পারে। আমি কৌতূহলী হইনি। তা কোথায় রেখেছে, কী রেখেছে, বলো তো?"

"মেজর আপনাকে বলেননি?"

"আরে কী একটা কথা কবিতার মতো বলছিল। যার কোনও মানেই হয় না। নেশার ঘোরে ও কবিতাটাই সম্ভবত গুলিয়ে ফেলেছে। চিরকালই একরকম। তবে তুমি যদি আমাকে বলতে তাহলে সাহায্য করতে পারতাম। এদিকের সমুদ্র তো আমার জানা।" মার্শাল হাসলেন।

অর্জুন দ্বিধায় পড়ল। এখন এই ভদ্রলোককে না জানিয়ে উপায় নেই। সূত্র অনুযায়ী সন্ধান করতে গেলে এঁকে জানিয়েই করতে হবে। অন্য কোন একটা ভান দেখিয়ে করা যেত যদি মেজর নেশার ঘোরে ফাঁস না করে দিতেন। অতএব সে জুতো-রহস্য থেকে শুরু করল। কীভাবে বোস্টনে আসার পথে হাইওয়ের ওপর ডিপার্টমেন্টাল দোকানে জুতোটাকে

পেয়েছিল। জুতোর লুকনো গর্ত থেকে কাগজ আবিষ্কার করেছিল। কাগজের সূত্র অনুসরণ করে একটি প্রায় পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি থেকে লকারের চাবি উদ্ধার করেছিল এবং সব শেষে লকার থেকে জ্যাকের নির্দেশসূচক কাগজ নিয়ে এখানে এসেছে তার বিশদ জানাল। শুধু কাগজের নির্দেশের কথাগুলো একটু গোলমাল করে দিল। সমুদ্র। উত্তর দিকে একঘণ্টা যাত্রা। যেখানে মাটি যতদূর আকাশ ততদূর। নভেম্বরে সূর্য মাথার ঠিক ওপরে আসে বেলা বারোটায়। ডুবুরি। সুড়ঙ্গটা তার তলায়।

মে মাসের বদলে নভেম্বর, সাড়ে বারোটার বদলে বারোটা। নোয়ার আমল থেকে না-নড়া জাহাজ বাঁধা পাথরটার কথা সে উল্লেখই করল না। অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে শুনছিলেন মার্শাল। অর্জুন শেষ করতে তার মুখের আলো নিভে এল, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না হে।"

"আমিও বুঝতে পারছি না। এখানে ডুবুরি আছে?"

"তা থাকবে না! বন্দরে গণ্ডায়-গণ্ডায় ডুবুরি আছে। কিন্তু তারা কী করবে?"

"সেটা একটা কথা।"

"তোমরা আজ সকালে নৌকো নিয়ে সমুদ্রের ওখানে গিয়ে কী করছিলে?"

"খুঁজছিলাম। জায়গাটা ঠিক কোথায় হবে...." অর্জুন কথা শেষ করতে পারল না। মার্শাল হেসে গড়িয়ে পড়লেন, "জলের ওপরে ভেসে তুমি নীচের ব্যাপার বুঝবে! আরে এই সমুদ্রের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি খুঁজে মরেছি আমি।" বলেই থেমে গেলেন।

"প্রতিটি ইঞ্চি মাটিতে আপনি কী খুঁজেছেন?" অর্জুন চটপট প্রশ্ন করল।

"মানে, যেখানে-সেখানে তো মুক্তোর চাষ হয় না। তার জন্যে ভাল জায়গা চাই, যেখানে ঝিনুকগুলো ভাল থাকবে। সেইজন্যেই জায়গা খুঁজতে হয়েছিল আমাকে। ঠিক আছে, মাথার মধ্যে নিয়ে নিলাম সূত্রটা। রাতভর ভেবে কাল সকালে তোমাকে বলব।" আচমকা আলোচনায় যবনিকা টেনে দিয়ে মার্শালসাহেব তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরিবর্তনটা লক্ষ করে অর্জুনের মনে হল, মানুষের মনের চেহারাটা বোঝার মতো যন্ত্র যদি আবিষ্কার করা যেত তা হলে পৃথিবীর অনেক সমস্যার যেমন সমাধান হত, তেমনি সেটা বাড়তও। আর তখনই ব্রাউন ঢুকল। সটান অর্জুনের কাছে এসে নিচু গলায় বলল, "তুমি একটা হাঁদারাম। মার্শালকে সব কথা বলে দিলে? এখন বুঝবে মজা। এমন কাজ কেউ কখনও করে? আর ওই হুমদো গোরিলাটার অত পানীয় খাওয়া কেন, যদি নেশার ঝোঁকে পেট থেকে কথা চালান করে দেয়?"

"আপনি কী ব্যাপারে কথা বলছেন ?" অর্জুন নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করল।

"আঃ। ওই গুপ্তধনের ব্যাপারটা!" ব্রাউন হাসল, "আমার এখন মনে হচ্ছে মার্শালের ওসব মুক্তো-ফুক্তো ফালতু ব্যাপার। গুপ্তধনের সন্ধানেই এই দ্বীপে বাসা বেঁধেছে। আর শুধু মার্শালিই নয়, ওই ওপাশে হ্যাচ না ফ্যাচ, কী নাম যেন বললে, সেও দলবল নিয়ে একই ধান্দায় এসেছে। উঃ, রহস্যের গন্ধ পেলে আমার পাকস্থলী পর্যন্ত চনমনে হয়ে ওঠে।"

"অতসব কথা আপনি জানলেন কী করে ?"

"তাঁবুর বাইরে থেকে তোমার আর মার্শালের কথা কান পেতে শুনে ফেললাম। তুমি বলতে পারো অন্যের কথা না বলে শোনা অন্যায়, কিন্তু না শুনলে তো তোমাকে সাবধান করতে পারতাম না। সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানো, ওই হাঁদারাম গোরিলাটা গুপ্তধন খুঁজতে এসে নাক ডাকাচ্ছে। কথাগুলো বলে ব্রাউন ফিসফিস করে বলল, "আমি বলছিলাম আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া ভাল।"

"কোথায় ?"

"গুপ্তধন খুঁজতে।"

"কীভাবে যাবেন! এখন তো মাথার ওপরে সূর্য নেই।"

অর্জুন আর কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। পুরো ব্যাপারটা যেন ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে মার্শালি জেনেছেন, এবার ব্রাউন জানল। এতগুলো লোভী লোককে সামলে গুপ্তধন খোঁজা সহজ কাজ নয়। সে অন্ধকারে পায়চারি করতে-করতে এগিয়ে যেতেই একটি শরীর দেখতে পেল। লোকটা বেশ হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মার্শালিকে চিনতে অসুবিধা হল না। অর্জুন সন্তর্পণে ওকে অনুসরণ করল। তারপরই দেখল, মার্শালি একা নন। ওঁর সঙ্গে একজন প্রহরীও রয়েছে। দুজনে একটা স্টিমবোটে উঠে ইঞ্জিন চালু করলেন। মুহূর্তেই বোটটা ঘুরে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলল। যে মার্শালি নিজেই বলেছেন, সমুদ্রে এখন রাত্রে চলাফেরা ঠিক নয়, সেই মার্শালি চললেন কোন্ উদ্দেশ্যে! অর্জুন পেছনে নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে দেখল, ব্রাউন এসে দাঁড়িয়েছে। ব্রাউন বলল, "আজ রাত্রে আর ঘুম হবে না দেখছি।"

"কেন ?"

"মার্শালি বন্দরে কেন যাচ্ছে বুঝতে পারছ না ? ডুবুরি আনতে।"

অর্জুন হেসে ফেলল। সে যে সূত্র দিয়েছে তাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও জায়গা বুঝতে পারবে না। অতএব ডুবুরি আনিয়ে মার্শালি কিছুই করতে পারবেন না। ঘণ্টা-তিনেক বাদে মার্শালি ফিরে এলেন। সঙ্গে একটা কাঠের বাক্স। তৃতীয় কোনও ব্যক্তি নেই।

মার্শালের চেহারা যেন আচমকা পালটে গিয়েছে। বেশ হাসিখুশি, সেই

চিন্তিত ভঙ্গিগুলোও আর নেই। মেজরের সঙ্গে তো বটেই, অর্জুনকে ডেকে-ডেকে খোশগল্প করছেন। তবে ব্রাউন সম্পর্কে উনি দূরত্ব রেখেই চলছেন। সম্ভবত, মেজর যেহেতু ব্রাউনকে পছন্দ করেন না, মার্শালিও মেনে নিচ্ছেন না। এমনকী, আগামীকাল যে অভিযান হবে তার আলোচনাও এমনভাবে হল যখন ব্রাউন ধারে-কাছে নেই। আলোচনা শেষ হলে প্রশ্ন উঠল ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কি না। মেজর মাথা নেড়েছিলেন, "সঙ্গী হয়ে গেলেই ও ভাগ চাইতে পারে। একটা পথের উটকো লোককে খামোখা ভাগ দিতে যাব কেন ?" মেজর এমনভাবে কথা বললেন যেন গুপ্তধন পেয়েই গেছেন। মার্শালি ইতিমধ্যে মেজরের কাছে বিশদ জেনেছেন। যদিও মেজর অর্জুনকে আলাদা বলেছেন ব্যাঙ্কের লকারে পাওয়া কাগজের লেখার সবটুকু তাঁর মনে নেই বলে তিনি মার্শালি অনেকবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও এগিয়ে যাওয়ার পথটা বলতে পারেননি পুরো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ব্রাউনকে বলা হবে তারা যাচ্ছে সেই হাঙরটাকে মারতে, যে মার্শালের মুক্তো নিয়ে গবেষণা বানচাল করে দিচ্ছে। এই ঝুঁকির কাজে যদি সে সঙ্গী হতে চায় তো আসতে পারে।

রাত্রে নিজের তাঁবুতে শুয়ে অর্জুন ব্রাউনের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল। ইতিমধ্যে সে বুঝে গিয়েছে লোকটা মোটেই ধূর্ত নয়, বোকা-চালাক বলা যেতে পারে। এবং বাউণ্ডুলে। কিন্তু মার্শালিকে সে বুঝতে পারছে না। মেজরের মুখে ওই গোপন খবরটা শোনার পর লোকটার হাবভাবই পালটে গেল ? মার্শালি বলেছেন যে, হাঙরটাকে জব্দ করতে এক কাঠের বাক্স অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন যার ফলে এগিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। তাই যদি হয়, মার্শালি এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন কেন ? তাঁর মুক্তো ধ্বংস করছে হাঙরটা অথচ তিনি অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রতিরোধ করেননি কেন ? একই দ্বীপের ওপাশে কিছু লোক মতলব নিয়ে সমুদ্রে ঘুরছে আর এপাশে মার্শালি মুক্তোর চাষ ছেড়ে নড়ছেন না। এ-দুটোর মধ্যে যোগসূত্র আছে কি ?

রাত তিনটের সময় ঘুম ভাঙল অর্জুনের। ব্রাউন এখন নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। সে জামাকাপড় পরে বাইরে বের হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মেজরদের তাঁবু ঘুমন্ত। এখনও সমুদ্রের ওপর অন্ধকার স্থির। মাথার ভেতরে টিপটিপে যন্ত্রণা হচ্ছে। অস্বস্তি বেড়ে গেলে এমন হয়। এই সময় একটি লোককে সমুদ্র থেকে উঠে আসতে দেখল। ওদিকটা উঁচু থাকার জন্য চট করে দেখা যায় না। লোকটা কাছে এলে সে মার্শালিকে চিনতে পারল। পেরে সরাসরি বলল, "আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"আরে তুমি ? ঘুম ভেঙে গেল! একটু আগে দেখে গেলাম ঘুমাচ্ছ!"

"আমাকে ঘুমন্ত দেখতে আসার কি কোনও কারণ ছিল ?"

"তোমাকে নয় হে! তাঁবুতে তো আর একজন আছে। আসলে আমি আমার সাবমেরিনে অভিযানের মালপত্র তুলে দিলাম। ব্রাউন সেটা দেখুক আমি চাইনি।"

অন্ধকারে লোকটার অভিব্যক্তি ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সাবমেরিন থেকে জলের তলায় হাঙরটার সঙ্গে কীভাবে লড়াই করবেন?"

"সেইটেই সমস্যা। আমারটা যাকে বলে ফাইটার সাবমেরিন নয়। ভেবেছি ওটাকে দেখলেই ওপরে উঠে আসব চটপট। তাড়া করে যেই ও জলের ওপরে মাথা তুলবে তখনই গ্রেনেড ছুঁড়ব। আমার সাবমেরিনের ছাদটা খুব দ্রুত খোলা যায়।"

"গুলি চালানো যাবে না ভেতর থেকে?"

"কী করে যাবে? বললাম না, ওটা ফাইটার নয়।"

"যদি হাঙরটা ওপরে না উঠে আসে?"

"হুঁ। সেটাই সমস্যা। যাক, সমস্যা নিয়ে আগেই মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। আচ্ছা, কোড ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিক কী ছিল বলো তো?" মার্শালি আচমকা প্রশ্ন করলেন।

"কেন?" অর্জুনের গলার স্বর পালটে গেল।

"না, মানে, শুনলাম জুতোর গর্ত থেকে কাগজটা বের করেছিলে তুমিই। যা কিছু পরের ঘটনা তা তোমার জন্যেই ঘটেছে। আর আমি তোমাদের এই দ্বীপে আশ্রয় শুধু দিচ্ছি না, অভিযানেও সাহায্য করছি। তা হলে দাঁড়াল, তুমি আর আমি মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছি। অতএব আমাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা ভাল।"

"কিছু মনে করবেন না, আমি তো আপনাকে ভাল করে জানি না।"

"অ।"

"তা ছাড়া শুধু মুক্তো নিয়ে আপনি এখানে গবেষণা করছেন এটাও অবিশ্বাস্য।"

"কেন?"

"এই সমুদ্রের জল ও ব্যাপারে আপনাকে খুব বেশি সাহায্য করবে না।"

হঠাৎ মার্শালের গলায় বরফ মিশল, "তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছ?"

"কাদের সঙ্গে?"

"এই দ্বীপের ওপাশে যারা ঘাঁটি গেঁড়ে বসে আছে!"

"না। কিন্তু আপনারা একই দ্বীপে এইরকম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আছেন কী করে? আপনারা দু'দলই কি সমুদ্রের তলায় কিছু খুঁজছেন?"

মার্শালি হাসলেন, "বয়সের তুলনায় তুমি দেখছি বেশি বুদ্ধি ধরো। তবে কথা হল কোনও কিছুরই বেশি ভাল নয়। মেজরকে কথা দিয়েছি যখন

তখন কাল অভিযানে যাব। তবে সেটা শুধু কালকের জন্যেই। তোমরা বিকেলেই ফিরে যেও।" মার্শাল কথাগুলো বলে চলে যাচ্ছিলেন, অর্জুন তাকে পিছু ডাকল, "মিস্টার মার্শাল, কাল নয়, আমরা আজই অভিযানে যাচ্ছি। ভোর হতে যখন বাকি নেই তখন আপনাদের মতো তো 'আজ' শুরু হয়ে গিয়েছে।"

মার্শাল কোনও জবাব না দিয়ে নিজেদের তাঁবুর দিকে চলে গেলেন।

অর্জুনের আর সন্দেহ রইল না। দ্বীপের ওপাশে প্রোফেসর আর এপাশে মার্শালসাহেব সমুদ্রের মধ্যে যা খুঁজছেন সেটার সূত্রই সে লকারে পেয়েছে। কিন্তু এই সমুদ্রই যে ওই অনুসন্ধানের জায়গা তা নিয়ে অর্জুনের ধন্দ ছিল। অন্তত এখন এদের খোঁজাখুজি দেখে সেটা কমে গেল। অত সাবধানে যিনি লকারে কাগজ রেখেছিলেন তিনি প্রোফেসর এবং মার্শালসাহেবের পরিচিত ছিলেন? ওর ওই কাণ্ডকারখানার খবর কি এঁরা দু'জনেই রাখতেন? ফলে লোকটির মৃত্যুর পরে এঁরা অনুসন্ধানে নেমে পড়েছেন? লোকটি অভিযাত্রী ছিল। মেজরের কথা মানলে মার্শালসাহেবও অভিযাত্রী। অতএব যোগসূত্র থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা বোকামি হবে। জলপাইগুড়িতে অমলদা এইরকম ভাবতে দেখলে কিছু বলতেন না কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছলে হাসতেন।

তাঁবুতে ঢুকে অর্জুন দেখল ব্রাউন তখনও ঘুমোচ্ছে। অনেক বড় চেহারার মানুষও ঘুমোলে ছেলেমানুষের ভঙ্গি করেন। হঠাৎ ওর মনে হল ব্রাউন কি প্রোফেসরের লোক? তাদের ওপর নজর রাখার জন্যে প্রোফেসর ওকে পাঠিয়েছেন? মিসেস ব্রাউনের হোটেলেই তো সে প্রোফেসরকে প্রথম দ্যাখে। তা হলে মেজর ভেবে ভুল করে ব্রাউনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার গল্প সাজানো? মাথার ভেতরে সব কিছু উলটো-পালটা হয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে ব্রাউনের বোঁচকাটায় হাত দিল। তাঁবুর ভেতর যে আলোটা জ্বলছে তার শক্তি খুবই কম। বোঁচকাটা পরীক্ষা করলে ব্রাউনের পরিচয় পাওয়া যাবে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সে হাত সরিয়ে নিল। ব্রাউন যদি প্রোফেসরের চর হয় তা হলে কিছুতেই কথায়-কথায় মেজরের সঙ্গে ঝামেলা করত না। মেজরের সঙ্গে ভাব জমাবার কোনও চেষ্টা তো নেইই, বরং একই চেহারার মানুষ তাকে শাসাচ্ছে এটা ব্রাউন সহ্য করতে পারে না। বিশেষ উদ্দেশ্য থাকলে সেটা পারত।

অর্জুন ব্রাউনকে ডাকল, "মিস্টার ব্রাউন!"

দ্বিতীয় ডাকেই চোখ খুলল ব্রাউন, "ও, তুমি! সকাল হয়ে গিয়েছে?"

"না। আপনার সঙ্গে কথা ছিল।"

"ভীষণ ঠাণ্ডা বাইরে, আমি যদি এভাবে শুয়ে-শুয়েই কথা বলি?"

"ঠিক আছে। শুনুন, আমরা সকাল আটটায় অভিযানে বের হচ্ছি।"

"ওই হাঙরটাকে মারতে? আমি ওর মধ্যে নেই। ডাঙায় যে-কোনও ব্যাপারে আমাকে পাবে, কিন্তু জলে? অসম্ভব।" ব্রাউন পিটপিট করে তাকাল কথাগুলো বলে।

"কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। যদিও বাকি দু'জন সেটা চাইছে না।"

"চাইছে না? গুড। ওরা দেখছি আমার প্রকৃত হিতৈষী।"

"আপনি ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনুন। আমার মনে হয়েছিল আপনি আমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখছেন। আপনি না গেলে আমি বিপদে পড়ব।"

"তা হলে যাওয়ার কী দরকার, যেও না। চুকে গেল।"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। লোকটাকে সব কথা খুলে বলা উচিত নয়। আবার না বললেও সাহায্য পাওয়া যাবে না, যেভাবে হাঙরভীতিতে রয়েছে। মেজর আছেন, কিন্তু আর একজন সঙ্গী চাই মার্শালের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে।

সে বলল, "মিস্টার ব্রাউন, আমরা হাঙর শিকারে যাচ্ছি না।"

"তা হলে? যাচ্ছ কোথায়? কাল মার্শাল একটা বাক্স এনেছে, জানো? তাতে কী আছে বলো তো? ওই হাঙরটাকে বধ করবার অস্ত্রশস্ত্র।"

"হতে পারে। কিন্তু আমরা যাচ্ছি অন্য উদ্দেশ্যে।"

এবার উঠে বসল ব্রাউন, "তাই বলো। আমি গোড়া থেকেই রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিলাম। কিন্তু ভাই, এই বালি আর জলে মালকড়ি আমদানির সম্ভাবনা যখন নেই, তখন আমিও নেই। কাল ফিরে যাওয়ার পর তো তোমরা হাওয়া হয়ে যাবে আর আমি আবার ভাসব। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এসব কথাই ভাবছিলাম।"

"ভাগ্য যদি ভাল হয় তা হলে আপনাকে আর ভাসতে হবে না।"

"মানে?" এক লাফে বিছানা থেকে নেমে এল ব্রাউন। এইসময় ঠাণ্ডার চিন্তাও তার মাথায় রইল না। অর্জুন হাসল, "আপনাকে এব বেশি কিছু বলব না।"

হঠাৎ অর্জুনের হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলল ব্রাউন, "ব্রাদার, আমার খুব কষ্ট। কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। আমার স্ত্রী তো নয়ই। জীবনে একবার অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলেছিলাম বলেই এই দুর্দশা। কাউকে দোষ দিই না আমি। কিন্তু আজ এখানে কাল ওখানে করে ভেসে বেড়াতে ভাল লাগে, বলো? প্রায়ই আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। সেদিন আর সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী'র কাছে ফিরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে থাকতে দিলে প্রমাণ করব আমি মানুষটা খারাপ নই। তা সে কথাই শুনতে চাইল না। তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ আর ভেসে বেড়াতে হবে

না !”

“না, আমি কথা দিচ্ছি না। তবে ভাগ্য ভাল হলে ওরকম আশা করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা, এই অভিযানে বিপদ আছে।”

“বিপদ ? আমাকে বিপদের ভয় দেখিও না ব্রাদার। যে উনুনের আগুনে পুড়ে মরছে তাকে গরম তেল আর কী করতে পারে। ঠিক হ্যায়, আমি আছি।”

সকাল আটটায় মেজর সমুদ্রের গায়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “উঃ, কী সুন্দর। কী মহান। তাকালেই বুক ভরে যায়।”

পেছন থেকে ব্রাউন ফোড়ন কাটল, “ফুলের বুকেই পোকা থাকে।”

মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন, “কী থাকে সেটা আমি বুঝব। তুমি বলার কে ? মাতব্বরি আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। এই পাজিটাকে সঙ্গে নেওয়ার যে কী দরকার ছিল তা জানি না।”

মার্শাল বললেন, “তোমার গোয়েন্দা-বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করো।”

অর্জুন কোনও জবাব না দিয়ে ব্রাউনকে ইশারা করল আর না মুখ খুলতে। সবাই এখন তৈরি। মার্শালের লোকজন ভাসমান সাবমেরিনটিকে শেষবার পরীক্ষা করে নেমে এল। মার্শাল বললেন, “বন্ধুগণ, এবার যাত্রা শুরু করা যাক।”

হঠাৎ মেজর হাত তুললেন, “মার্শাল, একটা কথা। জলের তলায় বিয়ার খাওয়া যাবে ?”

মার্শাল হাসলেন, “তোমার জন্যে কোনও না নেই।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।” মেজর যেভাবে পা ফেলে এলেন, তাতে মনে হল হিটলার প্যারিসে নামছেন। সাবমেরিনের ভেতরের আসনগুলো বেশ আরামদায়ক। এটি জলের নীচে যখন চলে তখন ওপরের ছাদ বন্ধ থাকে। জলের ওপরে উঠে এলে লম্বা নৌকো হয়ে যায়। দুটো বড় চোঙা আছে বাতাস ঢোকার জন্যে। এ ছাড়া অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে প্রয়োজনের জন্যে। মার্শাল বসলেন না স্টিয়ারিং-এ। যদিও চারজনের জন্যেই এর ওজন বরাদ্দ তবু তিনি একজন ড্রাইভার নিলেন কর্মচারীদের মধ্যে থেকে। চারজনের বেশি হয়ে গেছে বলে মেজর আপত্তি তুলেছিলেন। মার্শাল হেসে সেটা বাতিল করলেন, “জুনিয়র ডিটেকটিভের অনারে আমরা না হয় নিয়ম ভাঙলাম। অবশ্য মালপত্র ও মানুষের সম্মিলিত ওজন এর বহনক্ষমতার অনেক নীচেই রয়েছে।”

চালু হল ইঞ্জিন। এখন এটি আর সাবমেরিন নয়। সাতসকালেই মেজর বিয়ারের ক্যানে ঠোঁট দিলেন। আড়চোখে একবার ব্রাউনকে দেখলেন; তারপর বললেন, “সমুদ্রে বসে বিয়ার খেতে আমার চিরকালই ভাল লাগে। সবার মগজে তো এসব ঢুকবে না।”

ব্রাউন কথা বলে বসল, "বিয়ার পুরুষমানুষের পানীয় নয়।"

"কী ? এত বড় কথা ? আমি পুরুষ নই ?" গর্জন করে উঠলেন মেজর।

"আমি ওসব কিছুই বলিনি। বিয়ার নিয়ে কথা বলেছি।" ব্রাউনের মুখ নির্বিকার।

চটপট হাত তুললেন মার্শাল, "তা যাই বলো মেজর, তোমার যা শরীর, তাতে আমি বলি কি, বিয়ারের বদলে স্কচ খাওয়া উচিত। গতকাল তোমার জন্যে দুটো ভাল বোতল এনেছি। সাবপ্রাইজ দেব বলে বলিনি।"

রাগটা টুক করে গিলে ফেললেন মেজর, "তুমি হোস্ট, তোমার কথা আলাদা। বলছ যখন তখন খাব কিন্তু সেটা অন্য কারও উপদেশ শুনে নয়।"

মার্শাল চটপট একটা গ্লাস, এক জাগ বরফের টুকরো আর দু-দুটো স্কচের বোতল বের করে দিল। অর্জুনের ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। এইরকম সময় মেজরের এইসব খাওয়া উচিত হচ্ছে না। বিয়ার খেলে ওঁর কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু দু-দুটো স্কচ হাতের মুঠোয় পেলে কী হবে কে জানে!

মার্শাল বললেন, "এবার বলো কোন্‌দিকে যেতে হবে?"

প্রশ্নটা অর্জুনকেই করা। সে চারপাশের শান্ত সমুদ্রের দিকে তাকাল। মেজর বললেন আগ বাড়িয়ে, "জায়গাটা মেপে এসেছি। সোজা উত্তর দিকে চলো।"

মার্শাল ড্রাইভারকে সেই নির্দেশ দিলেন। অর্জুন একটু ধন্দে পড়ল। কাগজে লেখা ছিল দাঁড়-টানা নৌকোয় এক ঘণ্টার পথ। সেটা ঠিক কোন্‌ জায়গা থেকে নৌকো যাত্রা শুরু করেছিল তার ওপব নির্ভর করছে। যদিও গতকাল মেজর নিশ্চিত হয়েছিলেন জায়গাটা দেখে কিন্তু সেটাই সঠিক জায়গা কি না তা কে বলতে পারে।

ভাঙা-ভাঙা ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তরতর করে ভেসে যাচ্ছিল যানটা। ইঞ্জিনের মৃদু শব্দে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যাচ্ছিল সাগরপাখিরা। অর্জুন দেখল ব্রাউন একদৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ জিজ্ঞেস করতেই চোখ না সরিয়ে ব্রাউন জবাব দিল, "তোমবা কেউ হাঙরটার কথা মনে রাখছ না, এটা ঠিক ব্যাপার নয়। যদি এসে যায় তা হলে কী করব বুঝতে পারছি না।"

অর্জুন বলল, "এখন পর্যন্ত তো ওটা কোনও নৌকোকে জলের ওপর উঠে এসে আক্রমণ করেনি। ওটার খবর মার্শালসাহেব ছাড়া আর কেউ পায়নি এর আগে।"

ব্রাউন যেন স্বস্তি পেল একটু। কাঠ-কাঠ ভাবটা কমিয়ে বলল, "করেনি বলে যে করবে না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।" সে মুখ ফিরিয়ে

এবার মেজরকে দেখল, "ভর-সক্কালবেলায় পিপেটা মদ খাচ্ছে। অথচ বললেই হায়েনার মতো আওয়াজ তুলবে। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায় ?"

মার্শালের হাতে এখন দূরবীন। তিনি জলের ওপর দৃষ্টি বোলাচ্ছিলেন। ব্রাউনের প্রশ্নটা এড়াতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?"

"না। নাথিং। কিন্তু মেজর, তোমার সেই জায়গাটা থেকে আমরা কত দূরে আছি ?"

মেজরের তৃতীয় গ্লাস ততক্ষণে শেষ হবার মুখে। গাঢ় গলায় বললেন, "অর্জুন, বলে দাও।"

অর্জুন বলল, "জলের গায়ে তো দাগ দেওয়া যায় না, আমার কাছে তাই সব জায়গা একইরকম লাগছে। কাল ঠিক কোথায় এসেছিলাম তাও বুঝতে পারছি না।"

কথা শেষ করে সে দেখল মার্শালের মুখের পেশী বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে মার্শালের সাহায্য লাগবেই। লকারের কাগজের নির্দেশ একা অনুসরণ করা অসম্ভব। সে তাই কথাগুলো জুড়ল, "কাগজে লেখা আছে এক ঘণ্টা দাঁড় টেনে নৌকোয় উত্তর দিকে যেতে হবে। মে মাসে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে আসে সাড়ে বারোটায়।"

"মে মাস ? মে মাসের অঙ্ক এখন মিলবে কী করে ?"

এইসময় মেজর চিৎকার করে উঠলেন,"স্টপ, স্টপ। আঃ, ইঞ্জিন বন্ধ করো।"

মার্শালের ইঙ্গিতে ড্রাইভার যানটাকে অচল করল। বিড়বিড় করে কীসব অঙ্কের হিসেব করে গেলেন মেজর। তারপর বললেন, "জল নিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসো না হে। জলই আমার জীবন।" গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন, "আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু আরও ডান দিকে সরতে হবে।"

ডান দিকে মিনিট-দুয়েক যাওয়ার পর সবাই মেজরের দিকে তাকাল। তিনি তখন নতুন করে গ্লাসে স্কচ ঢালছেন। মার্শাল জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

মেজর নির্বিকার মুখে বললেন, "কী আর হবে ! শরীরটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছি একটু। এইসময় অর্জুন দেখতে পেল দূরে একটা মোটরবোট জল চিরে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছে। মার্শাল এবার অর্জুনের দিকে এগিয়ে এল, "সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। পকেট থেকে কাগজটা বের করে আমার হাতে দাও।" মার্শালের প্রসারিত হাত এখন অর্জুনের সামনে।

কোনও প্রতিবাদ না করে কাগজটা দিয়ে দিল অর্জুন। সেটা চোখের ওপরে ধরে হতভম্ব হয়ে গেল মার্শাল, "আরে, এ কী ভাষায় লেখা ?"

অর্জুন বলল, "বাংলা।"

"ওঃ।" ডান হাত দিয়ে কাগজ ধরে রাখা, বাঁ হাতে ঘুসি মারল মার্শালি, "তোমরা লকারে বাংলা লেখা কাগজ পেয়েছিলে ?"

"না। ওটা বাংলায় অনুবাদ করে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছি।"

"তা হলে দয়া করে এটাকে আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করে দাও।"

"সেটাই তো দিচ্ছিলাম, আপনি ব্যস্ত হলেন।" অর্জুন কাগজটা ফেরত দিল। এক পলক দেখে নিয়ে পড়ল, "সমুদ্র। উত্তর দিকে এক ঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড়-টানা নৌকোর। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর! মে মাসে সূর্য মাথার ঠিক ওপরে আসে সাড়ে বারোটায়।"

"দূর! এ থেকে কী করে বুঝলে জায়গাটা এই সমুদ্রেই ?"

"অনুমান।"

"কী থেকে অনুমান করছ ? একটা মাথামুণ্ডু ক্লু থাকতে হবে তো ?"

"উনি তো এই সমুদ্রের ধারেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন।"

"তা কাটিয়েছেন।" বলেই সামলে নিলেন মার্শালি, "কিন্তু কোন পয়েন্ট থেকে এক ঘণ্টা দাঁড়-টানা নৌকোয় যেতে হবে ?"

"তা লেখা নেই।"

বিরক্ত মার্শালি চোখ বন্ধ করলেন, "আর কী লেখা আছে ?"

অর্জুন পড়ল, "ডুবুরি। পাথরটা নড়েনি নোয়ার আমল থেকে। জাহাজ-বাঁধা পাথর।"

"ডুবুরি ? পাথর ?" মার্শালের চোখ খুলল।

মেজর বললেন, "নোয়ার আমলেও তো জাহাজ ছিল। সেই জাহাজই বাঁধা হত ওই পাথরে। সেই পাথর এখনও টিকে আছে। কী বড় পাথর বোঝো !"

এইসময় মেজর চিৎকার কবে উঠলেন, "ইউরেকা। পেয়েছি। এখানেই সমুদ্রের ওই দিকটায় ডুবোপাহাড় আছে। সেই কারণেই জাহাজ এড়িয়ে যায় ওই অঞ্চল। শুনেছি আগে সমুদ্রের জল এদিকে কম ছিল। জাহাজ থেমে যেত ওপাশেই।"

মার্শালিকে খুব খুশি মনে হচ্ছিল। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "পেটের জল ছাড়া বাইরের কিস্‌সু বোঝো না মেজর। লম্বা-লম্বা কথা। ডুবোপাহাড়টা এখান থেকে অন্তত আধ মাইল দূরে। আর উনি এতক্ষণ ডান দিক দেখছিলেন।"

মেজর কিছুই জবাব দিলেন না। সম্ভবত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশি মদ্যপান করে তিনি প্রতিবাদের শক্তি খুঁজে পেলেন না। শুধু এমন ভঙ্গিতে হাসলেন যেন কোনও অবোধ শিশুর কথা শুনছেন। ততক্ষণে মেজরের নির্দেশে যানের মুখ ঘুরেছে। সিকি মাইল অতিক্রম করার পর দেখা গেল মোটরবোটটা এদিকে ছুটে আসছে। মোটরবোটে পাইলট ছাড়াও দুজন লোক রয়েছে। প্রায় পাশাপাশি এসে সেটা দাঁড়িয়ে গেল। একটা লোক

চিৎকার করে বলল, "এখানে কী চাই তোমাদের ? বেশ তো ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে ।"

মার্শাল রাগী গলায় বললেন, "তোমরা জিজ্ঞেস করার কে হে ? জলপুলিশ নাকি ?"

"তাদের বাবা । শোনো, ভাল চাও তো এই এলাকা থেকে কেটে পড়ো ।"

মার্শাল বললেন, "কারণটা জানতে পারি ?"

"আমরা সরকারকে টাকা দিয়েছি এই এলাকায় মাছ ধরব বলে । কোনওরকম গোলমেলে লোক এখানে ঢুকুক আমরা চাই না । যাও, ভাগো জলদি ।" লোকটার শাসানি শেষ হওয়ামাত্র মেজর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জড়ানো গলায়,"অ্যাই ! আমাকে শাসানো হচ্ছে ? পাজি, বদমাশ, ছুঁচো । জল তোদের পৈতৃক সম্পত্তি ? আমাকে জল চেনাতে এসেছ !" আর তখনই ব্রাউন অর্জুনকে আঁকড়ে ধরল । লোক দুটো একইসঙ্গে ব্রাউন আর মেজরকে দেখছে । ব্রাউন ফিসফিস করে বলল, "যারা আমাকে জিপে তুলেছিল তাদের মধ্যে ওই লোক দুটো ছিল । দিব্যি করে বলছি ।"

লোক দুটোর একটা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে বোটের ওপর । গম্ভীর গলায় কে বলল, "তোমরা আমাদের উত্তেজিত করছ । ওই হোঁতকাটাকে গুলি করে ফেললে কিন্তু আমরা চুপ করে থাকব না । তোমরা কি যাবে ?"

মার্শাল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন বোট ঘোরাতে । ফিরে আসার মুখে মেজর সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিলেন । দুটো মাস্তানের হুমকিতে রণে ভঙ্গ দেবার পাত্র তিনি নন । তাঁকে হোঁতকা বলল অথচ কেউ প্রতিবাদ করল না । এইসব ।

মার্শাল কোনও কথা বললেন না । মেজর আসার পর অর্জুনকে বললেন, "মাতালদের নিয়ে জলের নীচে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় । এমনিতেই একজন চেনা হয়েছে । মেজরকে তীরে নামিয়ে দিচ্ছে ।"

এবার মেজর উঠে দাঁড়ালেন, "মানে ? আমি মাতাল ? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বোকামি ? জল চেনাচ্ছ ? দ্যাখো মার্শাল, তোমার মতলব আমার ভাল লাগছে না ।"

"এর মধ্যে মতলব আবার কোথায় দেখলে ?"

"আমি তীরে নামছি না ।" মাথা নাড়লেন মেজর, "সেই সেকেন্ডহ্যান্ড জুতো কেনা থেকে আমরা একটার পর একটা ঝামেলা সামলাচ্ছি আর উনি শেষবেলায় এসে মাতব্বরি করছেন । আর যাবেই-বা কী করে ? দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল তো ?"

মোটর বোট এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে । কিন্তু অর্জুন লক্ষ করেছিল, ওদের কাছে দূরবীন আছে । অর্থাৎ ওরা এখনও তাদের ওপর নজর রাখছে । প্রোফেসরের লোকজন আজ হঠাৎ জল পাহারা দিচ্ছে

কেন ? নাকি রোজই দেয়, তার চোখে পড়েনি ! ক্রমশ ওরা এমন একটা জায়গায় চলে এল যেখান থেকে আর মোটরবোট নজরে পড়ার কোনও সুযোগ নেই। মার্শাল সবাইকে সতর্ক হতে বললেন। ধীরে-ধীরে মাথার ওপর ছাদ উঠে এল। দুপাশ থেকে। দুটো চোঙা ওপরে উঠে গেল। ড্রাইভার আলো জ্বালিয়ে দিতেই অর্জুন বুঝল যানটা সাবমেরিন হয়ে জলের তলায় নেমে যাচ্ছে। মার্শাল দ্রুত নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভারকে। এবার সবাই কাচের ওপাশে জল দেখতে পেল। দৃষ্টি সইয়ে নেবার পর এক ঝাঁক মাছের সঙ্গে প্রথম মোলাকাত হল ওদের। সাবমেরিনটা খুব বড় নয়। নৌকো হিসেবে মাঝারি মনে হলেও এর ভেতরে দুটো ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে। জল কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিন ডুবোপাহাড়ের উদ্দেশ্যে। মার্শাল এবার বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বললেন, "আমার কাছে কয়েক সিলিন্ডার অক্সিজেন আছে। এখন পর্যন্ত আমরা ওপর থেকে অক্সিজেন পাচ্ছি। কিন্তু নিরাপত্তার কারণেই স্পটের কাছাকাছি পৌঁছে চোঙা দুটো নীচে নামিয়ে ফেলতে হবে। তোমাদের মধ্যে কে কে সাঁতার জানো ?"

মেজর হাত তুললেন। কিন্তু তাঁর অন্য হাতের গ্লাসটা খুব কেঁপে উঠল। মার্শাল তাঁকে লক্ষ না করে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে গোয়েন্দা, জলের তলায় কিছু খুঁজতে এসেছ সাঁতার না জেনে ! তাজ্জব ব্যাপার।"

জলপাইগুড়ি শহরে দু-দুটো নদী থাকলেও তিস্তায় সাঁতার শেখার কোনও সুযোগ নেই। শীতকালে জল থাকে না বললেই চলে, গ্রীষ্মকালে সেখানে নামার সাহস অল্পলোকের হয়। সাঁতার শেখে সবাই করলা নদীতে। তা কয়েক বছর স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জল নষ্ট হতে বসেছে। মাকে এড়িয়ে অর্জুন কিছুদিন হাত-পা ছুঁড়েছিল। জলের ওপর শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু করলায় সাঁতার কাটা আর ইংল্যান্ডের সমুদ্রে সাঁতরানো এক ব্যাপার কেন হবে ! সে হেসে মার্শালকে বলল, "আমি কোনও কাজ একদম না জেনে হাত দিই না।"

মার্শালের চোয়াল শক্ত হল। তিনি ঘুরে বসলেন সামনের দিকে। অজস্র জলজ লতায় শরীর বাঁচিয়ে সাবমেরিনটা ছুটে যাচ্ছে। সাবমেরিন থেকে একটা তীব্র আলো সামনের জলের দেওয়াল ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্শাল এবার গতি কমাতে বললেন। ধীরে ধীরে চোখের সামনে ডুবোপাহাডটা ভেসে উঠল। আলো নিভিয়ে সাবমেরিন একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। জলের ফুট দশেক নীচে মার্শাল সেটাকে স্থির করতে বললেন। প্রায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এবার মার্শাল অর্জুনের দিকে ঘুরে বসলেন, "এইটেই তোমার সেই ডুবোপাথর যা নোয়ার আমল থেকে নড়েনি। চালু গল্প হল, এখানেই

একসময় জাহাজ নোঙর করত। এবার কী করতে হবে বলে ফেলো।"

"আপনি এখানে এর আগে এসেছেন ?"

"একবারই। সাবমেরিন থেকেই দেখেছি।"

"পাথরটা কত বড ?"

"খুব বড় বলে মনে হয় না।"

"আমরা একবার পাক দিতে পারি ?"

"পারি। তবে মনে রেখো জলের ওপরে পাহারাদার রয়েছে।" মার্শালি কাঁধ নাচালেন, "তুমি একেবারে মুঠো খুলবে না তা হলে। বেশ। কিন্তু এই দুটো বোঝাকে সঙ্গে আনার কোনও দরকার ছিল না।"

সত্যি, মেজর এখন দেওয়ালে হেলান দিয়ে পড়ে রয়েছেন। এতদিন অর্জুন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আছে কিন্তু কখনও এমন বেহেড মাতাল হতে দেখেনি। সে হাত বাড়িয়ে মেজরের মুঠো থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিতে যেতেই মেজর চোখ বন্ধ করেই বলে উঠলেন, "উহু। আমি সব শুনতে পাচ্ছি। জবাব দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না বলেই চুপ করে বসে আছি। তবে যে যাই বলুক, আমি বাবা এখান থেকে নড়ছি না।"

সাবমেরিনটা তখন সন্তর্পণে পাহাড়ের দশ ফুট দূর ঘেঁষে চলতে আরম্ভ করেছে। পাহাড়টার গায়ে শ্যাওলা থিকথিক করছে। বোঝাই যাচ্ছে কেউ ওখানে কয়েক বছরের মধ্যে পা দেয়নি। সতর্ক চোখ রাখছিল অর্জুন। পাহাড়ের তলায় একটা সুড়ঙ্গ থাকার কথা।

"সাবমেরিনটাকে আর একটু নীচে নামাবেন ?"

"কেন ? মরার ইচ্ছে হয়েছে ?" মার্শালি চিৎকার করলেন, "আরও নীচে নামলে কোথাও যদি ঠোক্কর খায় তো দেখতে হবে না। এটার দাম কত জানো ?"

অর্জুন জানে না। জলপাইগুড়ির ছেলের সাবমেরিনের দাম জানার কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে জানাল, "একটা সুড়ঙ্গের খোঁজ করতে হবে যেটা পাহাড়ের তলায় রয়েছে।"

"সুড়ঙ্গ ? মাই গড !" মার্শালি একটু ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে নিচু গলায় কিছু বললে, সে মাথা ফিরিয়ে অর্জুনকে দেখল। তারপর সাবমেরিনটা ধীরে-ধীরে নীচে নামতে লাগল। এখন পর্যন্ত নিশ্বাসের কোনও কষ্ট হচ্ছে না। সম্ভবত সিলিন্ডার সাবমেরিনের ভেতরে অক্সিজেন জোগাচ্ছে। ক্রমশ বাইরের পৃথিবীটা ঝাপসা হয়ে গেল। সূর্যের আলো এতটা জল ভেদ করে নীচে নামতে পারছে না। ফলে আবার সাবমেরিনের আলো জ্বলে উঠল। প্রচুর মাছ ছুটোছুটি করছে। তাদের অনেকের চেহারা অর্জুন এ-জীবনে দেখেনি। অক্টোপাসের মতো শুঁড়অলা একটা ছোট্ট প্রাণীকে প্রায় দৌড়ে পালাতে দেখল সে পাহাড়ের খাঁজে। এর মধ্যে প্রায় তিন ভাগ পাক দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত যা-কিছু হচ্ছে তার সবটাই

অনুমাননির্ভর। এই ডুবোপাহাড়টা কাগজে লেখা নোয়ার পাথর নাও হতে পারে। এই সমুদ্রটাও ভুল জায়গা প্রমাণ হতে বেশি দেরি নেই। কিন্তু অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল তারা ঠিক পথেই এগোচ্ছে। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়। জলের গভীরতা ধরলে চল্লিশ ফুটের বেশি নয়। অথচ জলের মধ্যে এটাকেই কী বিশাল লাগছে। হঠাৎ মার্শালসাহেব চিৎকার করে উঠলেন। যান থেমে গেল। অর্জুনও সুড়ঙ্গটাকে দেখতে পেল। যদিও সুড়ঙ্গ না বলে গর্ত বলাই ভাল। গর্তের মুখটাতে আর একটি পাথর আছে, কিন্তু সেটা মুখটাকে ঢেকে দেয়নি। মার্শাল জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে? এইটেই তো?"

অর্জুন উত্তেজিত হয়ে বলল, "লেখা আছে একজনই ঢুকতে পারবে। মুখটাও তো সেইরকম।"

মার্শাল বললেন, "চলো, বাকিটা দেখি। যদি আর-একটা দেখতে পাই।"

বাকি পাহাড়টা চট করেই ফুরিয়ে গেল। মার্শাল জিজ্ঞেস করলেন, "সুড়ঙ্গের পর কাগজে কী লেখা আছে?"

"সেটা সুড়ঙ্গের ভেতর গিয়েই বলব।"

মার্শাল হাসলেন, "কিন্তু ব্রাদার, এবার যে আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে!"

এবার ব্রাউন চিৎকার করে উঠল, "মানে? এত কষ্ট করে খুঁজে পাওয়ার পর ফিরে যাব মানে? ইয়ার্কি পেয়েছ? একবার ফিরে গেলে তুমি আর আমাদের এখানে নিয়ে আসবে? সুড়ঙ্গটা জেনে নিয়ে আমাদের কাটিয়ে দেবার মতলব?"

মেজর চোখ বন্ধ করেই বললেন, "এই প্রথম লোকটাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হল।"

মার্শাল কাঁধ নাচালেন, "ওয়েল, জেন্টলমেন, তোমরা আমাকে অপমান করছ। এইরকম অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে কাজ করা ঠিক হবে কি না আমাকে ভাবতে হবে। উই আর গোয়িং ব্যাক।"

ঠিক সেই সময় ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল। চিৎকার ছিটকে উঠল ব্রাউনের মুখ থেকেও। সেই বিশাল হাঙরটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাওয়ার পথ আটকে। মার্শাল চাপা গলায় বললেন, "জামা প্যান্ট খুলে নাও।" তারপর দ্রুত হাতে অক্সিজেন মাস্কগুলো একটা বাক্স থেকে বের করে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিলেন। একমাত্র মেজর ছাড়া সবাই সেই নির্দেশ পালন করল হাঙরটার দিকে নজর রেখে। হাঙরটা একটুও নড়ছে না। অর্জুন তৈরি হতে-হতে ডাকল, "মেজর, মেজর!"

মেজর চোখ বন্ধ করে বললেন, "জ্বালিও না। আমি একটা কবিতা মনে করার চেষ্টা করছি। আবার আসিব ফিরে ধানসিড়ি···ধানসিড়ি···আঃ

কী যেন লাইনটা ?”

মার্শালি তৈরি হয়ে নিলেন সবার আগে। তারপর ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। অর্জুন তাঁকে অনুসরণ করল। বাক্স খুলে বন্দুক বের করছেন তখন মার্শালি। বন্দুকগুলো বিশেষভাবে তৈরি। অর্জুনের দিকে একটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, “এই গ্রেনেডের ব্যাগ কোমরে বেঁধে নাও। দশটা করে গ্রেনেড আছে এক-একটা ব্যাগে। বন্দুকের ঢাকনা খুলে এখানে গ্রেনেড বসিয়ে দেবে। তারপর ট্রিগার টিপলেই ওটা ছুটে যাবে। লক্ষ্যবস্তুর গায়ে আঘাত না লাগা পর্যন্ত বিস্ফোরণ হবে না।”

প্রচলিত চেহারার বন্দুক বা রাইফেলের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। অর্জুন একটার বদলে দুটো ব্যাগ নিল। সে শার্ট খুলেছিল, কিন্তু প্যান্ট খোলেনি। ফলে কোমরের বেল্টে ব্যাগ দুটোকে বেঁধে নিতে অসুবিধে হল না। ব্যাগের মুখে ইলাস্টিক দেওয়া। হাত ঢুকিয়ে একটা গ্রেনেড বের করে বন্দুকের খোপে পুরে নিল। ততক্ষণে মার্শালিসাহেব পেছনের দরজা টেনে দিয়ে অক্সিজেন-মাস্ক পরে নিয়ে সামনের দরজা খুলতে চেষ্টা করছেন। অক্সিজেন-মাস্ক মুখে বেঁধে নিতে বেশ কসরত করতে হল অর্জুনকে। মার্শালির দেখাদেখি সিলিন্ডারটা চালু করতে স্বস্তি এল। একজিট হোল দিয়ে মার্শালি যখন বাইরে বেরোচ্ছেন তখন জল আছড়ে পড়ল ঘরে। কোনও কিছু চিন্তা না করে অর্জুন মার্শালিকে অনুসরণ করল। যা জল ঢোকার ঢুকে গেছে ততক্ষণে কিন্তু মার্শালি বাইরে থেকে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলেন। জলের মধ্যে অক্সিজেন-সিলিন্ডার পিঠে ঝুলিয়ে অদ্ভুত রোমাঞ্চ হচ্ছিল অর্জুনের। তারা রয়েছে সাবমেরিনটার পেছনের দিকে। আর হাঙরটাকে শেষবার দেখেছিল সামনের দিকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে। মার্শালি সন্তর্পণে সাবমেরিনের দেওয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

জলের মধ্যে ভেসে থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না অর্জুনের। যতটা ঠাণ্ডা লাগার কথা, ততটা লাগছে না। যদিও হাঙরটার জন্যে উত্তেজিত হওয়ায় ঠাণ্ডা বোধটাই ওর কাজ করছিল না। অর্জুন সাবমেরিনের আওতা থেকে সরে চলে এল পাহাড়ের গায়ে। একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে আসতেই সে হাঙরটাকে দেখতে পেল। লেজ নেড়ে সেটা পেছনে সরে যাচ্ছে। আর তখনই বিস্ফোরণটা ঘটল। মার্শালি তাঁর বন্দুকের ট্রিগার টিপছেন। প্রচণ্ড ঢেউ উঠল, জলের ভেতর একটা ঝাঁকুনি বয়ে গেল আর হাঙরটার লেজের কাছে ঘোলাটে কিছু তৈরি হল মাত্র। কিন্তু অর্জুন অবাক হয়ে দেখল কিছুই হল না হাঙরটার। অর্থাৎ মার্শালির ছোঁড়া গ্রেনেড হাঙরের চামড়া ভেদ করতে পারল না। এই প্রথম হাত-পা ঠাণ্ডা লাগল অর্জুনের। সে দেখল সাবমেরিনটাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে ড্রাইভার। সম্ভবত যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে সে জেনে

নিয়েছে। মার্শালকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। আর সাবমেরিন ঘোরানো মাত্র হাঙরটা পাক খেয়ে ছুটে আসতে লাগল বিশাল হাঁ করে। অর্জুন পাথরের আড়াল থেকে ট্রিগার টিপল সেই হাঁ লক্ষ করে। গ্রেনেডটা ছুটে যাওয়ার সময় এমন ঝাঁকুনি হল যেন কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হল তার। আবার সেই একই আলোড়ন, শব্দতরঙ্গ শুষে নেওয়া জলে একই কাঁপুনি। শুধু হাঙরের মুখটা বন্ধ হল এবং প্রায় অর্জুনের দশ হাত দূরে এসে ওটা গতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাবমেরিনটা ততক্ষণে সরে গিয়েছে অনেকটা। একট বিশাল হাঙরকে এত কাছ থেকে অর্জুন স্বপ্নেও দ্যাখেনি। পাথরটার আড়ালে নিজেকে যতটা সম্ভব ঢেকে রেখেছে সে। হাঙরটা নিশ্চযই তার অস্তিত্ব বুঝতে পারেনি। কিন্তু প্রথম গ্রেনেডটা না হয় লেজে লেগেছিল, তারটা তো সরাসরি মুখের ভেতরে আঘাত করেছে বলে মনে হচ্ছে। কোথাও আঘাত না করলে জলে অনুরণন ছড়াত না। অথচ হাঙরটা রয়েছে স্থির। যেন বুঝতে চেষ্টা করছে তার আক্রমণকারী কোথায় লুকিয়ে আছে। অর্জুন কাঁপা হাতে দ্বিতীয় গ্রেনেডটা বন্দুকে ভরল। তারপর মাস্কের আড়াল থেকে হাঙরটাকে লক্ষ করে চমকে উঠল। কোনও হাঙরের পেটের কাছে জোড়ের দাগ থাকে নাকি। অপারেশনের পর সেলাইয়ের দাগ যেমন মানুষের শরীরে থেকে যায় তেমনি নীচ থেকে ওপরে একটা দাগ উঠে গেছে। সে ওই দাগটাকে লক্ষ করে গ্রেনেড ছুঁড়তেই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। তীব্র আঘাতে দাগের জাযগাটা ফাঁক হয়ে গেল। যদিও সেটাকে জুড়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে হাঙরটা। তারপরেই হাঙরের মুখ থেকে একটা নীল ধারা ছিটকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবখানে। সেই নীলে মাছ বা কোনও জলজ প্রাণী ধরা পড়তেই মরে তলিয়ে যেতে লাগল। নীল ঢেউটা স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে আসতে লাগল পাহাড়ের দিকে। অনর্গল নীল ছড়াচ্ছে হাঙরটা। ওই নীল মানে বিষ। প্রায় মেঘের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে সবখানে। একটা মেঘ ধেয়ে আসছে অর্জুনের দিকেও। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে হবে। অর্জুন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করতেই সম্ভবত হাঙরটা তাকে দেখতে পেল। এইসময় আর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সম্ভবত কোনও আড়াল থেকে মার্শাল গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। সেটি এসে লেগেছে হাঙরটার চোখে। অর্জুন দ্রুত নীল ঢেউ এড়িয়ে একটা পাথরের আড়ালে পৌঁছে মুখ ফিরিযে বন্দুকে গ্রেনেড ভরতে-ভরতে হতভম্ব হয়ে গেল। হাঙরটার পেটে জোড় লাগেনি। আর ওটা দুটো স্টিলের পাত ছাড়া কিছু নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পারা মাত্র অর্জুন হাঙর মনে হওয়া যানটির খোলা পেট লক্ষ করে বন্দুকের ট্রিগার টিপল। ধাতব পাতে তৈরি পেট আরও নড়বড়ে হয়ে গেল। প্রায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বোঝা যাচ্ছিল না ওটা হাঙর

নয়, ডুবোজাহাজ বা ডুবোনৌকো, তাকে হাঙরের আদল দেওয়া হয়েছে। বস্তুটি ধীরে-ধীরে জলের বুকে নেমে যাচ্ছে এখন। সেই নীল বিষ ছড়ানোও বন্ধ হয়েছে। মাটির ওপরে কেউ যদি বিষের ধোঁয়া ছুঁড়ে দেয়, তা হলে পালাবার পথ থাকে না। চোখেও দেখা যায় না সব সময়। কিন্তু জল নিজেই ওর অগ্রগতিকে কিছুটা প্রতিরোধ করে, না পারলেও চেহারাটা ধরিয়ে দেয় আর এই কারণেই অর্জুন নিরাপদে চলে আসতে পেরেছিল।

কিন্তু এবার কী করণীয়? ওই বিরাট হাঙর-মার্কা ডুবোজাহাজটির পেটে নিশ্চয়ই মানুষ আছে। এবং সব-কিছু যদি মিলে যায় তা হলে প্রোফেসর হ্যাচ এবং তাঁর বাহিনীর থাকার কথা। কিন্তু কেউ বেরিয়ে আসছে না যন্ত্রটা থেকে। অথচ ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, ওটি অকেজো হয়ে গিয়েছে। কোনও নড়নচড়ন নেই। অর্জুন মার্শালসাহেবকে খোঁজার চেষ্টা করল। ভদ্রলোককে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

জলের তলায় অক্সিজেন মাস্ক এবং পিঠে সিলিন্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম। অস্বস্তিটা আক্রমণের ভয়েই দূর হয়ে গিয়েছিল। এখন খেয়াল হল সিলিন্ডারে কতটা অক্সিজেন আছে তাই তার জানা নেই। ফট করে যদি শেষ হয়ে যায়, তা হলেই চিত্তির। সমুদ্রের মতো নীচ থেকে ওপরে ওঠার আগেই দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে হবে। কিন্তু অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল, হাঙর-মার্কা যন্ত্রটার কাছে যেতে। কোথায় যেন পড়েছিল বিখ্যাত ইংরেজি ছবি 'জ'স'-এর জন্যে অনেক লক্ষ ডলার খরচ করে একটা হাঙর বানানো হয়েছিল— বলত কম্পিউটার। সে এমন অভিনয় করেছিল যে, পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষ তাকে আসল না নকল বুঝতে পারেনি। প্রোফেসর হ্যাচ কি সেইরকম একটা এই সমুদ্রের জলে ছেড়ে রেখেছেন?

ঠিক এইসময় বিপরীত দিক থেকে একজনকে সাঁতরে আসতে দেখল অর্জুন। ভারী শরীর, মুখ তো দেখার উপায় নেই। লোকটা বোধ হয় হাঙর-মার্কা যন্ত্রটাকে আগে লক্ষ করেনি। সেটাকে দেখামাত্র পড়ি কি মরি করে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল। মার্শালসাহেব নন এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত। যন্ত্রটার ওপাশ থেকে কি কেউ বেরিয়েছে? তাই যদি হয় তা হলে যন্ত্রটাকে ভয় পাবে কেন? অর্জুন ধীরে-ধীরে এগোল। পাথরের ফাঁক দিয়ে সে লোকটার পেছনে পৌঁছে যেতেই ব্রাউনকে বুঝতে পারল। ব্রাউন সামান্য ফাঁক দিয়ে যন্ত্রটাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। অর্জুন কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারল এটা বোকামি। গ্যাসের মুখোশ পরে জলের ভেতর কথা বলা যায় না। স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে পেছন ফিরে কোমর থেকে ছোট ছুরি বের করে উঁচিয়ে ধরল ব্রাউন। এক ঝটকায় কিছুটা পিছিয়ে গেল অর্জুন। ব্রাউন কি তাকে চিনতে পারছে না? ওর তো জলের নীচে নামার কথা ছিল না। ব্রাউন নড়ছে না। তার ছুরি

সতর্কভাবে উঁচিয়ে রয়েছে। অর্জুন চটপট শ্যাওলা লেগে-থাকা পাথরের গায়ে নিজের নাম ইংরেজিতে লিখল আঙুল দিয়ে। সেটাকে লক্ষ করে ছুরি খাপে ঢুকিয়ে ছুটে এল ব্রাউন। হাত জড়িয়ে ধরার সময় অর্জুন সতর্ক হল। আবেগে যদি গ্যাস-মুখোশ খুলে দেয় তা হলে আর দেখতে হবে না। ব্রাউন কি কিছু বলার চেষ্টা করছে? অর্জুন ওর হাত ধরে টানল। ব্রাউন ইঙ্গিতে যন্ত্রটাকে দেখাতেই অর্জুন নিজের বন্দুকটা তুলে ধরে বোঝাল যে ও-ই কাণ্ডটা করেছে। ব্রাউন তার পিঠ চাপড়াল।

না, আর সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। যন্ত্রটা ওরকম নিশ্চল হয়ে আছে হয়তো বিশেষ মতলব নিয়ে। কাছে যাওয়ামাত্র আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। তার চেয়ে ওটা যখন চুপচাপ আছে তখন যে কাজের জন্যে এখানে নামা তাই করা দরকার। অর্জুন ব্রাউনকে ইশারা করল অনুসরণ করতে। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল পাহাড়ের গা ঘেঁষে।

এবং এই সময় তারা মার্শালিকে দেখতে পেল। মার্শালি উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। বোঝাল সে পাহাড়ের ওপাশটা দেখে এসেছে। এবং তারপরেই সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। মার্শালের হাতের বন্দুকটা ব্রাউনের দিকে তাক করা। অর্জুন দ্রুত মাঝখানে চলে এসে বন্দুক নাড়তে লাগল। মার্শালি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ব্রাউনের পরিচয়। সে এখানে ওর উপস্থিতি মোটেই পছন্দ করেনি। শেষ পর্যন্ত ঘাড় শক্ত করে মেনে নিল, নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ অর্জুনের মাথায় অন্য মতলব এল। সে মার্শালিকে দাঁড়াতে বলে ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল সেই পাথরটার কাছে যেখান থেকে যন্ত্রটাকে দেখা যায়। ইশারায় ব্রাউনকে সেখানেই লুকিয়ে যন্ত্রটার ওপর নজর রাখতে বলল সে। ব্রাউনের মোটেই ইচ্ছে ছিল না একা থাকার কিন্তু মার্শালের বন্দুক উঁচিয়ে তোলা দেখার পর আর সে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছিল না।

অর্জুন ফিরে এসে মার্শালিকে দেখতে পেল না। সে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে শুরু করল। নিশ্বাসের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ একঝাঁক ছোট মাছকে সামনে দিয়ে যেতে দেখল সে। মাছগুলো যেন তাকে লক্ষ করেই ডান দিকে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের ভেতর ঢুকে গেল। অর্জুন আরও একটু এগোতেই নিচু হতে বাধ্য হল। পাগলা কুকুর তাড়া করলে যেভাবে মানুষ ছোটে সেইভাবে মাছগুলো ছুটে বেরিয়ে এসে ছত্রাকার হয়ে যে-যার মতো চলে গেল। এবং যেখানে তারা ঢুকেছিল এবং বেরিয়ে এসেছিল সেখান দিয়ে খুব জোর একটি মানুষ যাওয়া-আসা করতে পারে। কাগজের লাইন দুটো মনে পড়ল। সুড়ঙ্গটা তার তলায়, ঢুকবে একটা মানুষ। অর্জুন উত্তেজিত হল। তা হলে কি এই পথটার কথাই কাগজে লেখা রয়েছে! মাছগুলো যদি ওদিকে না যেত তা হলে সে হয়তো লক্ষই করত না। অর্জুন সুড়ঙ্গের মুখটায় চলে আসতেই কাঁচা দাগ দেখতে পেল। বছরের

পর বছর সেখানে জলজ উদ্ভিদ অথবা শ্যাওলা জমা হচ্ছিল, সেখানে যেন কারও হাত-পায়ের স্পর্শ পড়েছে। নইলে শ্যাওলাগুলো অমন ঘষটে গেল কী করে ? চিন্তিত হল সে। খুব সাবধানে সুড়ঙ্গের ভেতর শরীরটা গলিয়ে দিল অর্জুন। সুড়ঙ্গটা সোজা নয় যে, সামনের কিছু দেখতে পাবে। বন্দুকটাকে উঁচিয়ে রাখল হাঁটার সময়। দু' পা দূরের বাঁকের আড়ালে কী রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মার্শালের দেওয়া এই বন্দুকের যা ক্ষমতা তাতে এখানে এই বন্ধ জায়গায় ট্রিগার টিপলে পাহাড়টার কিছু অংশ মাথার ওপর খসে পড়তে পারে। তবু আক্রমণকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। অন্তত কুড়ি পা এ-বাঁক ও-বাঁক করে হলঘরের মতো একটা জায়গায় পৌঁছতেই অর্জুন মার্শালকে দেখতে পেল। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে মার্শাল এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। তার বন্দুকটি শক্ত হাতে ধরা। জলের শব্দে চকিতে পেছনে ঘুরল মার্শাল। তারপর বন্দুক নামাল। নামিয়ে ইশারা করল ; এর পর কী ? এরপরে কী করতে হবে তা অর্জুনেরও জানা নেই। কাগজে কিছু লেখা ছিল না। যিনি লিখেছেন, তিনি সুড়ঙ্গ পথটা বাতলে দিয়ে আগন্তুকের বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন হয়তো। অর্জুন ইশারায় জানাল সে কিছু জানে না।

ভেতরটা অনেক বেশি পরিষ্কার। খোলা সমুদ্রের কাদা-পলি যেহেতু এখানে আসতে পারে না তাই একটা ঝকঝকে ভাব চারধারে। কিন্তু এইরকম বদ্ধ জায়গায় তো গভীর অন্ধকার হবার কথা। অর্জুন ওপরের দিকে তাকালো। কেমন সাদাটে দেখাচ্ছে। ওপর থেকে কি আলো আসার কোনও পথ আছে ? ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে ডুবোপাহাড়ের পেটের ভেতরে। অতএব আলো আসবে কী করে ? অর্জুন ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করল। আর তখনই মনে হল মাছগুলোর পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি। ওরা নিশ্চয়ই মার্শালকে দেখে ভয় পেয়েছিল।

অনেকটা ওপরে উঠে আসার পর অর্জুন থমকে দাঁড়াল পাহাড়ের খাঁজে পা রেখে। যেখান থেকে আলোটা আসছিল সেই জায়গায় যেন কিছুর আড়াল পড়েছে। একটা বিপদের গন্ধ পেল সে। আলোটা কি কৃত্রিম ? তাদের আগেই কি কেউ এই গুহাটাকে খুঁজে বের করে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করছিল ? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল অর্জুন। সে নিজের শরীরটাকে পাহাড়ের খাঁজের ভেতর মিশিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার নেমে এল চারধারে। এক হাতের মধ্যে জলের ভেতর কী আছে দেখা যাচ্ছে না। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ যেন কানে আসছে এখন। নীচে মার্শাল এখন কী করছে ঈশ্বর জানেন। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল কেউ যদি এই গুহার মুখে নীল বিষ-গ্যাস ঢুকিয়ে দেয় তা হলে ?

সে এবার বোকামিটা বুঝতে পারল। যদি শরীরের চামড়ার ক্ষতি করে

তা হলে আলাদা কথা কিন্তু অক্সিজেন-মাস্ক যতক্ষণ নাকে আছে ততক্ষণ তো ওটা নিশ্বাস বন্ধ করতে পারবে না। তা ছাড়া জলের ভেতর একমাত্র সামুদ্রিক প্রাণী ছাড়া ওই বিষে দমবন্ধ হয়ে মরার আশঙ্কা কারও নেই। তা হলে যন্ত্রটা থেকে তখন নীল বিষ-গ্যাস ছাড়ল কেন?

প্রায় মিনিট-তিনেক এইভাবে কেটে যাওয়ার পর প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল চারধারে। অর্জুনের পায়ের তলার পাহাড় কেঁপে উঠল। পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিল সে। ওপরের ছাদের কাছে কোনও কিছু এমন আঘাত করেছে যে, টুকরো পাথর আর বালি খসে পড়তে লাগল। অর্জুন অনুমান করল মার্শাল তাঁর বন্দুকের ট্রিগার টিপেছেন। অন্ধকারকে ভয় পেয়ে না তাকে লক্ষ করে সেটাই বুঝতে পারছে না সে। যাই হোক না কেন, এখনই বেরিয়ে আসার চিন্তাটা ত্যাগ করা উচিত। তা ছাড়া বেরিয়ে কোথায় যাবে সে? এই কালো অন্ধকারে গুহার সেই মুখটাই খুঁজে পাবে না যেখান দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। অর্জুনের মনে পড়ল ঠিক অক্সিজেন সিলিন্ডারটার কথা। আর কতক্ষণ সে নিশ্বাস নিতে পারবে জানা নেই। যদি আচমকা অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় তা হলে চিরকালের জন্যে ওই পাহাড়ের পেটে পড়ে থাকতে হবে। নিজের হঠকারিতার জন্যে কাউকে দায়ী করার কোনও মানে হয় না। আব এই সময় হঠাৎই একটা আলো নীচ থেকে ওপরে উঠে এল। কেউ টর্চ জ্বাললে এভাবেই আলো পড়ে। আলোটা একাধিক হল। ওটা পড়ছে ওপরের ছাদে। যেন কিছু লক্ষ করার চেষ্টা করছে। অর্জুন মাথা উঁচু করে তাকাল। ছাদের পাথরের অনেকটা চাঙড় নেই। এবং সেখানে কিছু ছেঁড়া রবারের তার ঝুলছে। তার মানে এখানে আগেই মানুষ এসেছে। মার্শালের কাছে টর্চ ছিল না। নীচ থেকে যারা টর্চ জ্বালছে তারা অবশ্যই অন্য লোক। মার্শালের কী হল? অর্জুন নীচ থেকে একটা আলোকে ওপরে উঠে আসতে দেখল। ক্রমশ আলোটা এগিয়ে এসে তাকে ছাড়িয়ে ছাদের দিকে চলে গেল। অর্জুন বুঝল লোকটা মেরামতির চেষ্টা করছে। অর্থাৎ তারগুলো এরা ছেঁড়েনি। যে আলোড়ন হয়েছিল, ছাদের যে চাঙড় খসে পড়েছিল, তা নিশ্চয়ই মার্শালের বন্দুক ছোঁড়ার কারণেই ঘটেছিল। এখানে ঢোকার পর ওপর থেকে যে আলো সে ছড়াতে দেখেছে তা নিশ্চয়ই কৃত্রিম আলো এবং এখন যারা সারাচ্ছে তাদেরই তৈরি করা। অর্জুন দেখল নীচ থেকে এখন একটি আলো ওপরে উঠে আসছে। তাদের অনেক আগেই এই সুড়ঙ্গ এবং পাহাড়ের পেটের গর্ত আবিষ্কৃত হয়েছে আর যারা সেটা করেছে তারা বেশ তৈরি হয়েই এসেছে। প্রোফেসর হ্যাচ। এই হাঙর-মার্কা যন্ত্রটিও নিশ্চয়ই প্রোফেসরের তৈরি। শত্রুপক্ষ অনেক বেশি চতুর এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারে পারদর্শী।

অর্জুন দেখল, ওপরে যে লোকটা মেরামত করছিল, সে নেমে

আসছে। তীব্র আলো যা ওর টর্চ থেকে বের হচ্ছিল অর্জুনের শরীরের প্রান্ত ছুঁয়ে নীচে নেমে গেল। এবার নীচে দুটো টর্চের আলো। সম্ভবত লোকটা তারগুলো জুড়তে পারেনি অথবা আলোর যন্ত্রটা এমন বিকল হয়ে গিয়েছে যে, ওখানে পৌঁছে সারানো অসম্ভব। অর্জুন মুখ নামিয়ে ওদের দেখছিল। শরীর বোঝা যাচ্ছে না টর্চের আলোর ঔজ্জ্বল্যে। এবং ওদের একজনের আলো যখন ঘুরে মার্শালের শায়িত শরীরের ওপর পড়ল তখন সে কেঁপে উঠল। মার্শালের শরীর নিশ্চল। একটা হাত এসে ওব গ্যাস-মুখোশ খুলে নিল একটানে। এবার কিছুটা ঘোলাটে হলেই মার্শালের মুখটা দেখতে পেল সে। মার্শাল মৃত। লোক দুটো আলো নিয়ে সরে সরে যেতে লাগল। গুহাটায় আবার অন্ধকার নেমে আসছে। অর্জুন বুঝতে পারছিল ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন এইখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে সাবধানে নীচে নামতে লাগল। যারা বেরিয়ে যাচ্ছে তারা কোনও ফাঁদ পেতেছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। ওরা কি দুজনকেই এখানে ঢুকতে দেখেছিল? তা দেখে থাকলে ওরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। তা ছাড়া একটি মৃতদেহের সঙ্গে জলের ভেতরে কাটানো অর্জুনের শরীরে কাঁটা দিল। নীচে নেমে এসে ও একমুহূর্ত দাঁড়াল। এখন চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা। অর্থাৎ হয় ওরা সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে নয় ওর জন্যে ওত পেতে রয়েছে। অর্জুনের হঠাৎ নিশ্বাস নিতে অসুবিধে শুরু হল। তবে কি অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছে। সে সুড়ঙ্গের মুখটা আন্দাজ করে এগিয়ে চলল দ্রুত। যেন অনন্তকাল চলা, সুড়ঙ্গটা শেষ হচ্ছেই না। অর্জুনের বুকে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। যেন একটা লোহার বল চেপে বসেছে সেখানে। তার চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে আসছিল। কোনও মতে বাইরে এসে শেষ শক্তি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইল। সিলিন্ডারের অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান হারাবার আগে অর্জুনের চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেল।

ধীরে-ধীরে একটা ঘোরেব মধ্যে দুলতে দুলতে অর্জুনের মনে হল সে জলের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। এবং তখনই শরীর গুলিয়ে উঠল। পেটের নাড়িভুঁড়ি পাকিয়ে উঠে মুখ থেকে একরাশ জলীয় পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে এল। অর্জুন চোখ মেলল।

ঝাপসা-ঝাপসা মুখগুলো তাকে দেখছে। এসব কাদের মুখ! হঠাৎ মুখে মাথায় গরম একটা ভাপ লাগল। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। খুব আরাম হচ্ছে, এই ভাপ পেয়ে। দ্রুত শরীরে শক্তি ফিরে আসছে। কেউ একজন জোর করে তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে কিছু গলিয়ে দিল। জিভ গলা বেয়ে সেটা শরীরে নামছে। ওষুধ? শরীরটাকে গরম করতে-করতে নামছে তরল পদার্থটা। অর্জুন বুকভরে নিশ্বাস নিল। বুকে এখনও টনটনে

ব্যথা। অর্জুন আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কতটা সময় কেটে গেছে অর্জুনের খেয়াল নেই। যখন চেতনা এল তখনই তার শরীর কুঁকড়ে উঠল। যেন মাথার পাশে একটা রাগী সাপ ফোঁস-ফোঁস শব্দ তুলে যাচ্ছে। ঝট করে সে উঠে বসতেই ঝুড়িটাকে দেখতে পেল। শব্দটা আসছে ওই ঝুড়ি থেকেই। সে মুখ তুলে তাঁবু দেখতে পেল। এখন কি বাইরে রাত নেমেছে? নইলে তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বলছে কী করে? সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই বসে পড়তে বাধ্য হল। তার পায়ে একটা লোহার চেন বাঁধা। চেনটার অন্য প্রান্ত একটা বড় বাক্সের সঙ্গে জোড়া। সে কোথায় এখন? শেষ যে ছবিটা মনে আসছে তা হল জলের ভেতরে তার বুকে অসম্ভব যন্ত্রণা এবং সমুদ্রের ওপরের আকাশটা কিছুতেই দৃশ্যমান হচ্ছিল না। আর যাই হোক, সে মার্শালসাহেবের ক্যাম্পে নেই এখন। তখনই তার চোখের সামনে মার্শালের মৃতদেহ ভেসে উঠল। লোকটা কি অসহায় হয়ে পড়েছিল গুহার ভেতরে। কিন্তু তার তো মারা যাওয়াই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ছিল। কেউ নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করেছে। কে? সেই লোক দুটো? যারা মার্শালকে মেরেছে? এই সময় সাপটা এমন জোরে ঝুড়ির ঢাকনায় ছোবল মারল যে, সেটা কেঁপে উঠল। আর আপনাআপনি একটা ভয়ার্ত চিৎকার ছিটকে বের হল অর্জুনের গলা থেকে। শরীর গুলিয়ে উঠল, তার কি জ্বর হয়েছে?

এই সময় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। লম্বা রোগা, মাথায় বারান্দাটুপি, মুখে পাইপ একটা লোক এসে দাঁড়াল তাঁবুর দরজায়, "সো ইউ আর অলরাইট?"

লোকটা হাসল, "আমাকে ধন্যবাদ দাও তোমাকে জল থেকে তুলে আনার জন্যে। ইংল্যান্ডের সামুদ্রিক প্রাণীগুলো একটা এশীয়কে খাওয়ার স্বাদ থেকে অবশ্য বঞ্চিত হল তার কারণে।"

অর্জুন লোকটাকে চিনতে পারল, তবু জিজ্ঞেস করল সে, "আপনি কে?"

"তোমার উদ্ধারকর্তা। তুমি কি একটু কৃতজ্ঞ বোধ করছ?"

"নিশ্চয়ই।"

"বাঃ, খুব ভাল। কাগজটায় কী লেখা ছিল তা এবার মনে করে বলো।"

"কোন কাগজ?"

লোকটা, অর্জুন বুঝে নিয়েছে, ইনিই প্রোফেসর হ্যাচ, গম্ভীর মুখে সাপের ঝুড়ির সামনে এগিয়ে গেলেন। দুবার মৃদু শিস দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সাপটা তার ফোঁসফোঁসানি বন্ধ করল। ঝুড়িতে হাত রেখে প্রোফেসর অর্জুনের দিকে না তাকিয়ে বললেন, "দেখা গেল এই রাগী সাপটাও

কীরকম বাধ্য। অবাধ্যতা আমি সহ্য করতে পারি না। এ সাপ কেবলমাত্র আমার প্রতিই অনুগত। একে ঝুড়ি থেকে বের করে তোমার কোলের ওপর ফেলে দিলে কীরকম বোধ করবে ? এত বড় একটা সমুদ্রে তোমার শরীর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে কি মনে হয় না তোমার ?"

"আমাকে মেরে ফেলার জন্যে নিশ্চয়ই আপনি উদ্ধার করেননি ?"

"ভুল। তোমাকে উদ্ধার করেছি প্রয়োজনে, সেটা না মিটলে তোমাকে আর কী দরকার ? যখন তোমার জ্ঞানহীন শরীরটাকে এখানে আনা হচ্ছিল, তখন আমার একজন কর্মচারী তোমায দেখে ঠিক এই সাপটার মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বেচারাকে তুমি এমন নাজেহাল করেছিলে যে, আমার কাছে প্রচণ্ড শাস্তি পেয়েছিল। সে বদলা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তুমি অজ্ঞান ছিলে তাই আমি তাকে নিবৃত্ত করেছিলুম। কাগজে কী লেখা ছিল ?"

প্রোফেসর হ্যাচ এবার অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"আপনি যখন ওই সুড়ঙ্গ এবং গুহাব মধ্যে যেতে পেরেছেন তখন মনে হচ্ছে কিছুই আপনার অজানা নেই। তা হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?"

"তোমার মনে হওয়ার সঙ্গে বাস্তবের মিল নাও থাকতে পারে খোকা। গত দু' বছর ধরে আমি আমার সর্বস্ব ব্যয করে যাচ্ছি ওটি অনুসন্ধানের জন্যে। কারণ আমি মনে করি ওই সম্পদের অংশ আমার আছে। মার্শালি মূর্খটা কী মনে কবত নিজেকে, তা সেই জানত। সবকাবের কাছ থেকে অনুমতি নিযে এখানে বসল মুক্তো চাষ করতে। জীবনে যে একটা মুক্তো হাতে নিয়ে দেখেনি সে করবে মুক্তো চাষ। আর এই সমুদ্রের জলে মুক্তোর চাষ হয় ? এত জায়গা থাকতে ও এখানটা বেছে নেওয়াতে আমার সুবিধে হল। ওর কাছে খবর ছিল সম্পদটা এখানকার সমুদ্রেই লুকানো আছে। মুক্তো চাযের নাম করে ও সাবমেরিনে চেপে অন্ধের মতো সমুদ্র হাতড়াত। চিরদিনই মাথা মোটা ছিল ওর। কিন্তু আমার সুবিধে করে দিল।"

"কী করে ?"

"প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার স্বভাবে পড়ে না খোকা।"

"আপনি ওই সাপটাকে পুষেছেন কেন ?"

"বড্ড বেয়াড়া তো তুমি !" প্রোফেসর হাসলেন। একটা হাত ঝুড়ির ওপর রেখে নিজের মনেই বললেন, "সাপ আমার বড় প্রিয়। নিরীহ, চুপচাপ সাপ নয়, রাগীগুলো। ওদের ফোঁসফোঁসানি না শুনতে পেলে আমার নার্ভ উত্তেজিত হয় না।"

"মার্শালকে মারলেন কেন ?"

"প্রশ্ন কোরো না। জুতোর গর্তে তুমি কাগজ পেয়েছিলে। সেই কাগজ

দেখে লকারের চাবি। ব্যাঙ্ক খুব অন্যায় করেছে তোমাদের লকারের ভেতরের কাগজটা দেখিয়ে। সেই ম্যানেজারটাকে সাসপেন্ড করিয়েছি, কারণ লোকটা আমাকে কাগজ দেখাতে চায়নি। অথচ সেই কাগজ দেখার অধিকার আমারই সবচেয়ে বেশি। কারণ যে ওই সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি কাজ করেছিলাম।" প্রোফেসর এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। আচমকা ঝুড়িতে আঘাত করামাত্র ভেতরের সাপটা তীব্র শব্দ তুলল।

"কাগজে কী লেখা ছিল?"

"আপনি গুহাটাকে ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?" অর্জুন ইচ্ছে করে সময় নিচ্ছিল।

"তন্নতন্ন করে। কোথাও বাক্সটা পাইনি।"

"কিসের বাক্স?"

"কাঠের বাক্সের ওপরে টিনের পাত মোড়া। জলে পচে যেতে অনেক সময় লাগবে। হিরেগুলো আছে তার মধ্যে।"

"কোথাকার হিরে?" অর্জুন বুঝতে পারছিল জ্বর আসছে শরীর কাঁপিয়ে।

"ওঃ, তুমি আমাকে প্রশ্ন করেই যাচ্ছ।" প্রোফেসর এগিয়ে এলেন দ্রুত পায়ে। পকেট থেকে একটা সরু কাঁটাওয়ালা গ্লাভস্ বের করলেন। অর্জুন দেখল গ্লাভসটার আঙুলের ওপরে বড় জোর সিকি ইঞ্চি ধারালো কাঁটা। সেটা পরে নিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কাগজে কী লেখা ছিল?"

অর্জুন মাথাটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কী করে জানলেন যে, কাগজে যা লেখা ছিল তা আমিই জানি।"

"মার্শালের ক্যাম্পের সব খবর আমার কাছে আসত।"

অর্জুনের মনে হল এখন এই পরিস্থিতিতে কাগজে যা লেখা ছিল তার কোনও গুরুত্ব নেই। প্রোফেসর তো নিজেই সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন। সে লাইনগুলো পর পর বলে গেল। সুড়ঙ্গটা তার তলায়, ঢুকবে একটা মানুষ, অর্জুন এখানেই থামতে প্রোফেসর উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

"আর কিছু লেখা ছিল না।" অর্জুন মাথা নাড়ল। এখন আর কথা বলতে শরীর চাইছিল না।

"তুমি মিথ্যে কথা বলছ।" হঠাৎ প্রোফেসরের হাত অর্জুনের মুখের ওপর নেমে এল। তিনি আঘাত করলেন না, শুধু হাতের উলটো পিঠটা চেপে ধরলেন। অর্জুন মুখ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলে বললেন, "কোনও লাভ হবে না। এখন আদর করছি, মুখ সরাতে চেষ্টা করলে আঘাত করব। কাগজে আর কী লেখা ছিল?"

"বিশ্বাস করুন আর কিছু ছিল না।" অর্জুন ফ্যাকাসে গলায় বলল।

"কাগজটা যে ভদ্রমহিলা কপি করে এনেছিলেন তিনি ঠিকঠাক কাজটা করেছিলেন?"

"মনে হয়। যদিও জিজ্ঞেস করিনি।"

"তা হলে গুহার ভেতরে গিয়ে কী খুঁজছিলে?"

"চেষ্টা করছিলাম যদি কিছু খুঁজে বের করা যায়।" অর্জুন নিজের শক্তি ফিরে পেতে চাইছিল।

প্রোফেসর আর দাঁড়ালেন না। ঝড়ের মতো তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর অর্জুনের মনে হল প্রোফেসরের কাছে তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল। নিজের স্বার্থেই লোকটা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, জল থেকে উদ্ধার করেছিল। এখন তাকে মেরে ফেলতে একটুও অসুবিধে নেই। প্রচণ্ড হতাশা ওকে ঘিরে ধরল। অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক না হয়ে জলে নামা খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল। মার্শালও তো তার সঙ্গেই জলের ভিতর ছিল। উত্তেজনায় তারও কি সময় হিসাব করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল?

কিন্তু এভাবে অসহায়ের মতো মরা চলবে না। হঠাৎ ওর মেজর আর ব্রাউনের কথা মনে পড়ল? ওরা কি তাকে খোঁজার চেষ্টা করছে না?

অর্জুন সাপের ঝুড়িটার দিকে তাকাল। ঝুড়িটা তার নাগালের মধ্যে। কিন্তু ওটা দিয়ে সে কী করতে পারে? ঢাকনা খুলে দিলে সাপটা নিশ্চয়ই তাকে কামড়াবে। সে চারপাশে তাকাল। তারপর ঝুঁকে একটা বড় কাঠের টুকরো তুলে নিল। কানের কাছে অনবরত ফোঁসফোঁসানি—শুধু মৃত্যুচিন্তা ডেকে আনে। সাপটাকে ছেড়ে দিলে যদি কামড়াতে আসে তা হলে এই কাঠ দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করবে কিন্তু ওই রাগী শব্দ শুনতে আর রাজি নয়। অর্জুন চার ফুট লম্বা কাঠের ফালিটা দিয়ে ধীরে-ধীরে ঝুড়ির আংটাটা খুলে ফেলল। সাপটার গর্জন আরও বেড়েছে। এক ঝটকায় ঝুড়িটার ডালা খুলে ফেলে সেটাকে বিপরীত দিকে ঠেলে দিল সে যতটা পারে। প্রায় স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে নামল সাপটা। মাটিতে পড়েই একেবারে লেজের ওপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ফণা মেলে দুলতে লাগল। সাপটা যদি ওখান থেকেই ছোবল মারে তা হলে অর্জুনের শরীর পেয়ে যাবে। কাঠটাকে শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরে রইল অর্জুন। যত দ্রুত গতিতেই সাপটা ছোবল মারুক সে ওকে আঘাত করবেই। আর এই সময় তাঁবুর বাইরে একটা গলা শোনা গেল, "ও কে বস্। ইটস মাই প্লেজার।"

শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র অর্জুন দেখল সাপটা ফণা নামিয়ে নিচ্ছে। দ্রুত শরীরটা নীচে নামিয়ে ডান দিকে চলে গেল। একটা বড় কাঠের বাক্সের ওপাশে গিয়ে সেটা আশ্রয় নিল। আর তখনই লোকটা ঢুকল। অর্জুন ওকে চিনতে পারল। সমুদ্রের ধারে একেই সে বেইজ্জত করেছিল। তাঁবুর

দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটা হলদে দাঁত বের করে বলল, "এবার তোমাকে পেয়েছি বাছাধন। বস্ বলেছে তোমাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। নাউ ডিসাইড ইওরসেল্ফ, তুমি কীভাবে মরতে চাও।"

অর্জুন লোকটাকে দেখল। কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বেল্টের সঙ্গে একগোছা চাবি রিঙে ঝুলছে। ওই চাবিগুলোর একটাতে কি তার পায়ের তালা খুলবে? সে হাসতে চেষ্টা করল, "এ বিষয়ে কথা বলা দরকার। তোমার হাতে সময় আছে?"

লোকটা অবাক হল, "বাঃ, তোমার নার্ভ আছে দেখছি। সে তাঁবুর ভেতর ঢুকে একটা বাক্স টেনে নিয়ে দু' পা ফাঁক করে বসল, "কী কথা বলবে?"

"আমাকে ছেড়ে দেওযা যায়?"

"এক লক্ষ পাউন্ড দিলেও না।" লোকটা হাসল।

অর্জুন দেখল লোকটা সেই বাক্সটা টানেনি যেটার পেছনে সাপটা লুকিয়েছে। আর হত্যা করার সুযোগ পেয়েও এমন আনন্দিত যে, পাশেই সাপহীন ঝুড়িটা যে পড়ে আছে তা লক্ষই করছে না। লোকটা বলল, "গুলি কবব না, তাতে যন্ত্রণা পাবে না। তোমার হাতের একটা নার্ভ কেটে দেব। রক্ত বের হবে আর তুমি একটু একটু করে মারা যাবে। তোমার হাতে ওটা কী? কাঠের টুকরো? কী করবে ওটা দিয়ে? আত্মরক্ষা? হা হা হা।"

অর্জুনের খুব রাগ হয়ে গেল। সে কাঠের টুকরোটাকে সেই বাক্সটার দিকে ছুঁড়ে দিল যেটাব কাছে সাপটা আশ্রয় নিয়েছে। লোকটা বলল, "বাস্! ওই বাক্সটাব ওপর এত রাগ কেন তোমার?" বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল।

দু'পা পিছিয়ে বাক্সটার পাশে ঝুঁকে কাঠটা কুড়িয়ে নিতে গিযেই আঁতকে উঠল। অর্জুন দেখল লোকটার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। প্রচণ্ড ভয়ে সে ছিটকে আসতে চেষ্টা করল অর্জুনের দিকে। কিন্তু তার আগেই রাগী সাপটা ছোবল মেরেছে তাকে, পর পর দু'বার। লোকটা মুখ হাঁ করল। কিন্তু চিৎকার করার সুযোগ পেল না। সাপটা তখন দ্রুতবেগে ছুটে গেল তাঁবুর দরজার দিকে। অর্জুন দেখল লোকটা তার এক ফুট দূরে পড়ে আছে নিঃসাড়ে। এটা কী সাপ? ওর বিষ এত দ্রুত কাজ করল? বিস্ফারিত চোখে অর্জুন দেখল প্রথম ছোবল পড়েছে লোকটার কানের নীচে। এতক্ষণ যে তর্জনগর্জন করেছিল সে এখন নিঃসাড়।

মিনিট-দুয়েকের মধ্যে অর্জুন তাঁবুর দরজায় চলে এল। শরীরে এখনও রক্ত-চলাচল স্বাভাবিক নয়। একটু ঘোর লাগছে হাঁটার সময়। কিন্তু লোকটার কোমর থেকে খুলে নেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র তাকে নবীন শক্তি জোগাচ্ছে। এটা সেই খাঁড়ি। দু'পাশে বুনো ঝোপঝাড়। তাঁবুগুলো

এমনভাবে সেই সব ঝোপকে আশ্রয় করে পাতা হয়েছে যাতে বাইরে থেকে চট করে বোঝা যাবে না। অর্জুন সাপটার জন্যে চোখ বোলাল। সাধারণত ছোবল মারার পর ওরা কিছুটা নিস্তেজ হয়। কিন্তু ওই ঝোপঝাড়ে আশ্রয় পেতে ওর অসুবিধে হবে না।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই অর্জুন ওদের দেখল। প্রোফেসর হ্যাচ চারজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। তাদের মধ্যে সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি রয়েছে যাকে প্রোফেসরের সঙ্গে সুপার মার্কেটে দেখতে পেয়েছিল। ওদের কাছে ধরা না দিয়ে এপাশ দিয়ে যাওয়া যাবে না। অর্জুন বিপরীত দিকে তাকাল। সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে। এখন যদি লুকিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে মার্শালের ক্যাম্পে পৌঁছনো যায়, সেই চেষ্টাই করা উচিত। পাঁচজন লোকের সঙ্গে তার একার পক্ষে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অর্জুন পিছু হটতে লাগল আর এইসময় কুকুরের চিৎকার শুরু হয়ে গেল। সেই কুকুর যাদের চেনে বেঁধে প্রহরীরা পাহারায় বেরোয়। অর্জুন পড়ি কি মরি করে দৌড়ল। পেছনেও পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে তবে সেটা খুব হালকা। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল একটা রাগী চেহারার কুকুর দূরত্ব কমাচ্ছে। যেভাবে ছুটন্ত ইঁদুরের পেছনে লাফাবার সময় বেড়ালের মুখে ফুটে ওঠে জেদ ঠিক সেইভাবে ও এগিয়ে আসছে। এখন সামনে জল, পেছনে জঙ্গল আর রাগী কুকুর। যে গতিতে দৌড়েছিল প্রায় সেই গতিতেই অর্জুন জলের ভেতরে নেমে গেল। বুক পর্যন্ত যাওয়ার পর তার খেয়াল হল সে বেশিক্ষণ সাঁতরাতে পারবে না। এটা দ্বীপের সেইদিক, যেখানে বড় বড় পাথর থাকায় মোটরবোট পর্যন্ত তীরে ভিড়তে পারে না। অর্জুন একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে যাওয়া মাত্র মানুষের গলা শুনতে পেল। কুকুরের আচরণ অনুসরণ করে প্রোফেসরের লোকজন পৌঁছে গিয়েছে। অর্জুনের শরীরের নিম্নাংশ জলের তলায়। কনকনে ঢেউ এসে পড়ছে সেখানে। দুই হাতে পাথর আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। পায়ের ওজন যার ওপরে সেখানেও শ্যাওলা। কুকুরের ডাক মাঝে-মাঝে এপাশ-ওপাশে ছুটে যাচ্ছে। মুখ বের করে দেখার সাহস অর্জুনের হচ্ছিল না। মিনিট দু-তিন পরে হঠাৎ পেছনে সমুদ্রের ওপরে ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল সে। আর সেটা শোনামাত্র কুকুরগুলোকে শান্ত করতে অনেক শিস বাজতে লাগল। অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে অনন্ত জলরাশির ওপর একটা ছোট্ট লঞ্চকে এগিয়ে আসতে দেখল। ওটা আসছে দ্বীপেই। কিন্তু এই তীরে নয়। ক্রমশ ডানদিক দিয়ে ঘুরে গেল লঞ্চটা। আর ওপাশের তীরের হই-হট্টগোল এখন একদম থেমে গেল।

দশ মিনিট পরে, যখন কোমর থেকে পা পর্যন্ত প্রায় অসাড় তখন অর্জুন পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। টলতে টলতে জল ভেঙে শুকনো ডাঙায় পা দিয়ে সে অসহায় চোখে চারপাশে তাকাল। কেউ

কোথাও আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওই লঞ্চটা দেখে কি প্রোফেসর হ্যাচের লোকজন নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে? লঞ্চটা কার? অর্জুন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

উত্তেজনায় এবং দীর্ঘসময় অনাহারে অর্জুনের পেটে ব্যথা শুরু হল। সে বালির ওপর বসে রইল কিছুক্ষণ। ব্যথা সামান্য কমতে ও যে-পথ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই পথে এগোল। ভেজা জামা-প্যান্ট আরও শীত তৈরি করছে হাওয়ার সঙ্গে মিশে। হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটাকে জল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল সে। সেটিকে নিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে এগোচ্ছিল।

হ্যাচের তাঁবুগুলো নেই। বোঝা যায় এখানে কেউ বা কারা তাঁবু গেড়ে কিছুদিন ছিল। কিন্তু মালপত্রসমেত সব-কিছু উধাও। খাড়ির পাশের জঙ্গলটাকে ভাল করে দেখল সে। এবং তখনই কিছু ব্যবহার-করা মালপত্র সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেল। একটা আপেল জুসের টিন অটুট রয়ে গেছে সেখানে। ফেলে দেওয়ার সময় ওরা আর যাচাই করেনি প্রত্যেকটা। শুধু লোকচক্ষুর আড়ালে ফেলতে হবে বলেই জঙ্গলে ফেলা। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অর্জুন টিনের মুখটা খুলতে পারল। অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সে ক্যানটাকে যখন খালি করল তখন পেট অনেকটা ভর্তি।

প্রোফেসর হ্যাচ সদলে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কোথায়? মানুষটার যে চেহারা সে দেখেছে, তাতে গুপ্তধন উদ্ধার না করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পাত্র বলে মোটেই মনে হয় না। অর্জুন সমুদ্রের তীর ধরে এগোল। খানিকটা যেতেই সে সেই পথটা চিনতে পারল যেটা দিয়ে মার্শালের ক্যাম্প থেকে প্রথম দিন ব্রাউনের সঙ্গে এসেছিল। অর্জুন দৌড়তে চাইল। মিনিট-দুয়েকের মধ্যে সে লঞ্চটাকে দেখতে পেল। মার্শালসাহেবের ক্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্রমশ ওদের স্পষ্ট দেখতে পেল সে। মেজর একজন ইউনিফর্ম পরা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্রাউন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন ক্যাম্প তুলে লঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে জিনিসপত্র। অর্জুনের মাথা টলছিল, দৃষ্টি মাঝে মাঝে অস্বচ্ছ হয়ে আসছে। খানিকটা ঘুরে জঙ্গল পেরিয়ে অর্জুন ডাকল, "মিস্টার ব্রাউন!"

প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে তাকাল ব্রাউন। তারপর বুকফাটানো চিৎকার করে ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অর্জুনকে, "ও বেঁচে আছে, ও বেঁচে আছে, ও ভগবান!"

মেজর তাঁর ভারী শরীর নিয়ে ছুটে এলেন, "আহ্, কী আশ্চর্য, চেপেই ছেলেটাকে মেরে ফেলবে যে। ছেড়ে দাও, চব্বিশ ঘণ্টা কোথায় ছিল সেটা জানা দরকার।"

কিন্তু ব্রাউন তাকে ছাড়তেই মেজর তাকে জড়িয়ে ধরলেন। অত বড়

মানুষটার চোখে এখন জল, গলায় কান্না, "ও অর্জুন, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।"

"এখন তো আমি ঠিক আছি।"

"না, মোটেই ঠিক নেই। তোমার শরীরে প্রচণ্ড টেম্পারেচার। জামা-প্যান্ট ভিজে কেন!"

অর্জুন এতক্ষণে অস্বস্তিটাকে টের পেল। চোখ-মুখ গরম হয়ে গিয়েছে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে খুব। মেজর ওকে ধরে ধরে লঞ্চে নিয়ে গেলেন, "মার্শাল তো ফিরল না, কী হয়েছে জানো?"

অর্জুন ফিসফিসিয়ে বলল, "তিনি আর ফিরবেন না।"

মেজর একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন, "ওঃ। আমরা ওঁর তাঁবু, মালপত্র বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

অর্জুনকে একটা ডেকচেয়ারে শুইয়ে দেওয়া হল। সেইসময় ইউনিফর্ম-পরা লোকটি উঠে এলেন ব্রাউনের সঙ্গে। ব্রাউন তাকে বোধ হয় অর্জুন সম্পর্কে বোঝাচ্ছিল। লোকটি প্রথমেই ভেজা পোশাকটা পালটাতে বললেন। শুকনো পোশাকে কম্বল মুড়ি দেবার পর অর্জুনের আরাম হল।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি কথা বলার মতো ইচ্ছে আছে?"

অর্জুন হাসতে চেষ্টা করল, "বলুন।"

"ডুবো পাহাড়ের নীচে কী ঘটেছিল?"

"সেটা অনেক বড় গল্প।"

"ও, মিস্টার মার্শাল কোথায়?"

"ডুবো পাহাড়ের নীচের গুহায় ওর মৃতদেহ পড়ে আছে।"

"হত্যাকারী কারা?"

"প্রোফেসর হ্যাচ আর তাঁর সঙ্গীরা।"

"গুপ্তধন কি ওরা পেয়েছে?"

"না। তবে নিশ্চয়ই আবার চেষ্টা করবে।"

"ঠিক আছে। এখন বিশ্রাম নিন। পরে অনেক কথা বলতে হবে।" অফিসার উঠে গেলেন। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। জ্বরটা যেন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। মেজর তার পাশে বসে রয়েছেন, ব্রাউন পায়ের কাছে। সে চোখ খুলল আবার। ব্রাউন বলল, "কী ভয়ানক লাল হয়েছে চোখ, ওষুধ যা আছে সঙ্গে... !"

মেজর বললেন, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা হাসপাতালে পৌঁছে যাব। ডাক্তারের কাজ ডাক্তাররাই করবে।"

অর্জুন বলল, "গুপ্তধনটা ডুবো পাহাড়ের নীচেই পড়ে রইল কিন্তু!"

মেজর বললেন, "হুম।"

"সেকেন্ডহ্যান্ড জুতোর গর্তে কাগজটা আমরাই খুঁজে পেয়েছিলাম।" অর্জুন বিড়বিড় করল।

মেজর বললেন, "ভুলে যাও ওসব কথা। ধরা যাক গুপ্তধন পেলাম আমরা। ব্রিটেনের ধনসম্পত্তি ব্রিটিশ সরকার আমাদের নিয়ে যেতে দিত ? কক্ষনো না। ওরাই আমাদের দেশ থেকে সব মণিমুক্তো নিয়ে এসেছে, নিজেরটা কেন হাতছাড়া করবে। মিছিমিছি পরিশ্রম হত। বুঝলে ? ভুলে যাও।"

কথাগুলো অর্জুনের কানে ভাল করে ঢুকছিল না। সে বলল, "ওগুলো পেলে গরিব মানুষের খুব উপকার হত। আমি জানি প্রোফেসর আবার চেষ্টা করবে কিন্তু কখনও খুঁজে পাবে না।"

"কী করে বুঝলে ?" মেজর জানতে চাইলেন।

"ওরা অনেক দিন ধরে ডুবো পাহাড়টাকে খুঁজছে। যিনি ওটাকে লুকিয়ে রেখেছেন তিনি শেষটা বলে যাননি। মনে হয় প্রোফেসর ওঁকে খুন করেছিলেন না জানতে পেরে। আর আপনার বন্ধু মার্শালও ওটার খোঁজে এখানে ছিলেন। মুক্তো চাষ ভাঁওতা।"

মেজর মাথা নাড়লেন. "কারেক্ট। এই সন্দেহটা আমিও করেছিলাম।"

অর্জুন হাঁ করে নিশ্বাস নিল. "কিন্তু আমি হেরে গেলাম।"

এই প্রথম কথা বলল ব্রাউন, "মোটেই না। গুপ্তধন যত দামী হোক তোমার প্রাণের চেয়ে মূল্যবান নয়। আমরা সেটাকে ফিরে পেয়েছি। কী বলো মেজর ?"

মেজর হঠাৎ উঠে ব্রাউনের হাত আঁকড়ে ধরলেন, "ক্ষমা করো।"

ব্রাউন খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"

"তুমি একটা সত্যিকারের মানুষ সেটা ওই কথায় প্রমাণ করলে, তাই।" মেজর গদ্‌গদ গলায় বললেন।

বন্দর এগিয়ে আসছে। লঞ্চ সিটি বাজাল। অফিসার এগিয়ে এলেন, "আমি অ্যাম্বুলেন্সে কথা বলেছি। অ্যাম্বুলেন্স আসছে।"

মেজর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তীব্রগতিতে একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসছে বন্দরের দিকে। অর্জুনের বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, অফিসার।"